যোগাযোগ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

B808

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী, ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কা

প্রকাশ আষাঢ় ১৩৩৬
পুনর্মুদ্রণ শ্রাবণ ১৩৪০, শ্রাবণ ১৩৫০
কার্তিক ১৩৫৩

মুদ্রাকর শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বাগ
ব্রাহ্মমিশন প্রেস, ২১১ কর্নওআলিস স্ট্রীট, কলিকাতা

যোগাযোগ

আজ ৭ই আষাঢ়। অবিনাশ ঘোষালের জন্মদিন। বয়স তার হল বত্রিশ। ভোর থেকে আসছে অভিনন্দনের টেলিগ্রাম, আর ফুলের তোড়া।

গল্পটার এইখানে আরম্ভ। কিন্তু আরম্ভের পূর্বেও আরম্ভ আছে। সন্ধ্যাবেলায় দীপ জ্বালার আগে সকালবেলায় সলতে পাকানো।

এই কাহিনীর পৌরাণিক যুগ সন্ধান করলে দেখা যায় ঘোষালরা এক সময়ে ছিল সুন্দরবনের দিকে, তার পরে হুগলি জেলায় নুরনগরে। সেটা বাহির থেকে পর্টুগীজদের তাড়ায়, না ভিতর থেকে সমাজের ঠেলায় ঠিক জানা নেই। মরিয়া হয়ে যারা পুরানো ঘর ছাড়তে পারে, তেজের সঙ্গে নূতন ঘর বাঁধবার শক্তিও তাদের। তাই ঘোষালদের ঐতিহাসিক যুগের শুরুতেই দেখি, প্রচুর ওদের জমিজমা, গোরু-বাছুর, জনমজুর, পালপার্বণ, আদায়বিদায়। আজও তাদের সাবেক গ্রাম শেয়াকুলিতে অন্তত বিঘে দশেক আয়তনের ঘোষাল-দিঘি পানা-অবগুণ্ঠনের ভিতর থেকে পঙ্ককণ্ঠে অতীত গৌরবের সাক্ষ্য দিচ্ছে। আজ সে-দিঘিতে শুধু নামটাই ওদের, জলটা চাটুজ্যে জমিদারের। কী করে একদিন ওদের পৈতৃক মহিমা জলাঞ্জলি দিতে হয়েছিল সেটা জানা দরকার।

এদের ইতিহাসের মধ্যম পরিচ্ছেদে দেখা যায়, খিটিমিটি বেধেছে চাটুজ্যে জমিদারের সঙ্গে। এবার বিষয় নিয়ে নয়, দেবতার পূজো নিয়ে। ঘোষালরা স্পর্ধা করে চাটুজ্যেদের চেয়ে দু-হাত উঁচু প্রতিমা গড়িয়েছিল। চাটুজ্যেরা তার জবাব দিলে। রাতারাতি বিসর্জনের রাস্তার মাঝে মাঝে এমন মাপে তোরণ বসালে যাতে করে ঘোষালদের প্রতিমার মাথা যায় ঠেকে। উঁচু-প্রতিমার দল তোরণ ভাঙতে বেরোয়, নিচু-প্রতিমার দল তাদের মাথা ভাঙতে ছোটে। ফলে, দেবী সে-বার বাঁধা বরাদ্দর চেয়ে

অনেক বেশি রক্ত আদায় করেছিলেন। খুন-জখম থেকে মামলা উঠল। সে-মামলা থামল ঘোষালদের সর্বনাশের কিনারায় এসে।

আগুন নিবল, কাঠও বাকি রইল না, সবই হল ছাই। চাটুজ্যেদেরও বাস্তুলক্ষ্মীর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। দায়ে পড়ে সন্ধি হতে পারে, কিন্তু তাতে শান্তি হয় না। যে-ব্যক্তি খাড়া আছে, আর যে-ব্যক্তি কাত হয়ে পড়েছে দুই পক্ষেরই ভিতরটা তখনও গর্‌গর্‌ করছে। চাটুজ্যেরা ঘোষালদের উপর শেষ-কোপটা দিলে সমাজের খাঁড়ায়। রটিয়ে দিলে এককালে ওরা ছিল ভঙ্গজ ব্রাহ্মণ, এখানে এসে সেটা চাপা দিয়েছে, কেঁচো সেজেছে কেউটে। যারা খোঁটা দিলে, টাকার জোরে তাদের গলার জোর। তাই স্মৃতিরত্নপাড়াতেও তাদের এই অপকীর্তনের অনুস্বার-বিসর্গওআলা ঢাকি জুটল। কলঙ্কভঞ্জনের উপযুক্ত প্রমাণ বা দক্ষিণা ঘোষালদের শক্তিতে তখন ছিল না, অগত্যা চণ্ডীমণ্ডপবিহারী সমাজের উৎপাতে এরা দ্বিতীয়বার ছাড়ল ভিটে। রজবপুরে অতি সামান্যভাবে বাসা বাঁধলে।

যারা মারে তারা ভোলে, যারা মার খায় তারা সহজে ভুলতে পারে না। লাঠি তাদের হাত থেকে খসে পড়ে ব'লেই লাঠি তারা মনে-মনে খেলতে থাকে। বহু দীর্ঘকাল হাতটা অসাড় থাকাতেই মানসিক লাঠিটা ওদের বংশ বেয়ে চলে আসছে। মাঝে মাঝে চাটুজ্যেদের কেমন করে ওরা জব্দ করেছিল সত্য মিথ্যে মিশিয়ে সে-সব গল্প ওদের ঘরে এখনও অনেক জমা হয়ে আছে। খোড়ো চালের ঘরে আষাঢ়-সন্ধ্যাবেলায় ছেলেরা সেগুলো হাঁ করে শোনে। চাটুজ্যেদের বিখ্যাত দাগু সর্দার রাত্রে যখন ঘুমোচ্ছিল তখন বিশপঁচিশ জন লাঠিয়াল তাকে ধরে এনে ঘোষালদের কাছারিতে কেমন করে বেমালুম বিলুপ্ত করে দিলে সে-গল্প আজ এক-শ বছর ধরে ঘোষালদের ঘরে চলে আসছে। পুলিস যখন থানাতল্লাসি

করতে এল নায়েব ভুবন বিশ্বাস অনায়াসে বললে, হাঁ, সে কাছারিতে এসেছিল তার নিজের কাজে, হাতে পেয়ে বেটাকে কিছু অপমানও করেছি, শুনলেম নাকি সেই ক্ষোভে বিবাগি হয়ে চলে গেছে। হাকিমের সন্দেহ গেল না। ভুবন বললে, হুজুর এই বছরের মধ্যে যদি তার ঠিকানা বের করে দিতে না পারি তবে আমার নাম ভুবন বিশ্বাস নয়। কোথা থেকে দাগুর মাপের এক গুণ্ডা খুঁজে বার করলে— একেবারে তাকে পাঠালে ঢাকায়। সে করলে ঘটি চুরি, পুলিসে নাম দিলে দাশরথি মণ্ডল। হল এক মাসের জেল। যে-তারিখে ছাড়া পেয়েছে ভুবন সেইদিন ম্যাজেস্টেরিতে খবর দিলে দাগু সর্দার ঢাকার জেলখানায়। তদন্তে বেরোল দাগু জেলখানায় ছিল বটে, তার গায়ের দোলাইখানা জেলের বাইরের মাঠে ফেলে চলে গেছে। প্রমাণ হল সে-দোলাই সর্দারেরই। তার পর সে কোথায় গেল সে-খবর দেওয়ার দায় ভুবনের নয়।

এই গল্পগুলো দেউলে-হওয়া বর্তমানের সাবেক কালের চেক। গৌরবের দিন গেছে; তাই গৌরবের পুরাতত্ত্বটা সম্পূর্ণ ফাঁকা বলে এত বেশি আওয়াজ করে।

যা হোক, যেমন তেল ফুরোয়, যেমন দীপ নেবে, তেমনি এক সময়ে রাতও পোহায়। ঘোষাল-পরিবারে সূর্যোদয় দেখা দিল অবিনাশের বাপ মধুসূদনের জোর কপালে।

২

মধুসূদনের বাপ আনন্দ ঘোষাল রজবপুরের আড়তদারদের মুহুরি। মোটা ভাত মোটা কাপড়ে সংসার চলে। গৃহিণীদের হাতে শাঁখা-খাড়ু, পুরুষদের গলায় রক্ষামন্ত্রের পিতলের মাদুলি আর বেলের আটা দিয়ে মাজা

খুব মোটা পইতে। ব্রাহ্মণ-মর্যাদার প্রমাণ ক্ষীণ হওয়াতে পইতেটা হয়েছিল প্রমাণসই।

মফস্বল ইস্কুলে মধুসূদনের প্রথম শিক্ষা। সঙ্গে সঙ্গে অবৈতনিক শিক্ষা ছিল নদীর ধারে, আড়তের প্রাঙ্গণে, পাটের গাঁটের উপর চ'ড়ে ব'সে। যাচনদার খরিদদার গোরুর গাড়ির গাড়োয়ানদের ভিড়ের মধ্যেই তার ছুটি, যেখানে বাজারে টিনের চালাঘরে সাজানো থাকে সারবাঁধা গুড়ের কলসী, আঁটিবাঁধা তামাকের পাতা, গাঁটবাঁধা বিলিতি র‍্যাপার, কেরোসিনের টিন, সরষের ঢিবি, কলাইয়ের বস্তা, বড়ো বড়ো তৌল-দাঁড়ি আর বাটখারা, সেইখানে ঘুরে তার যেন বাগানে বেড়ানোর আনন্দ।

বাপ ঠাওরালে ছেলেটার কিছু হবে। ঠেলেঠুলে গোটা দুত্তিন পাস করাতে পারলেই ইস্কুলমাস্টারি থেকে মোক্তারি ওকালতি পর্যন্ত ভদ্রলোকদের যে-কয়টা মোক্ষতীর্থ তার কোনো-না-কোনোটাতে মধু ভিড়তে পারবে। অন্য তিনটে ছেলের ভাগ্যসীমারেখা গোমস্তাগিরি পর্যন্তই পিলপে-গাড়ি হয়ে রইল। তারা কেউ বা আড়তদারের কেউ বা তালুকদারের দফতরে কানে কলম গুঁজে শিক্ষানবিশিতে বসে গেল। আনন্দ ঘোষালের ক্ষীণ সর্বস্বের উপর ভর করে মধুসূদন বাসা নিলে কলকাতার মেসে।

অধ্যাপকেরা আশা করেছিল পরীক্ষায় এ-ছেলে কলেজের নাম রাখবে। এমন সময় বাপ গেল মারা। পড়বার বই, মায় নোটবই সমেত, বিক্রি করে মধু পণ করে বসল, এবার সে রোজগার করবে। ছাত্রমহলে সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড বই বিক্রি করে ব্যবসা হল শুরু। মা কেঁদে মরে— বড়ো তার আশা ছিল, পরীক্ষা-পাসের রাস্তা দিয়ে ছেলে ঢুকবে 'ভদ্দোর' শ্রেণীর ব্যূহের মধ্যে। তার পরে ঘোষাল-বংশদণ্ডের আগায় উড়বে কেরানিবৃত্তির জয়পতাকা।

ছেলেবেলা থেকে মধুসূদন যেমন মাল বাছাই করতে পাকা, তেমনি

তার বন্ধু বাছাই করবারও ক্ষমতা। কখনো ঠকে নি। তার প্রধান ছাত্রবন্ধু ছিল কানাই গুপ্ত। এর পূর্বপুরুষেরা বড়ো বড়ো সওদাগরের মুচ্ছুদ্দিগিরি করে এসেছে। বাপ নামজাদা কেরোসিন কোম্পানির আপিসে উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত।

ভাগ্যক্রমে এঁরই মেয়ের বিবাহ। মধুসূদন কোমরে চাদর বেঁধে কাজে লেগে গেল। চাঁদ বাঁধা, ফুলপাতায় সভা সাজানো, ছাপাখানায় দাঁড়িয়ে থেকে সোনার কালিতে চিঠি ছাপানো, চৌকি কার্পেট ভাড়া করে আনা, গেটে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা, গলা ভাঙিয়ে পরিবেষণ, কিছুই বাদ দিলে না। এই সুযোগে এমন বিষয়বুদ্ধি ও কাণ্ডজ্ঞানের পরিচয় দিলে যে, রজনীবাবু ভারি খুশি। তিনি কেজো মানুষ চেনেন, বুঝলেন, এ-ছেলের উন্নতি হবে। নিজের থেকে টাকা ডিপজিট দিয়ে মধুকে রজবপুরে কেরোসিনের এজেন্সিতে বসিয়ে দিলেন।

সৌভাগ্যের দৌড় শুরু হল ; সেই যাত্রাপথে কেরোসিনের ডিপো কোন্ প্রান্তে বিন্দুআকারে পিছিয়ে পড়ল। জমার ঘরের মোটা মোটা অঙ্কের উপর পা ফেলতে ফেলতে ব্যবসা হু-হু করে এগোল গলি থেকে সদর রাস্তায়, খুচরো থেকে পাইকিরিতে, দোকান থেকে আপিসে, উদ্‌যোগপর্ব থেকে স্বর্গারোহণে। সবাই বললে, “একেই বলে কপাল।” অর্থাৎ, পূর্বজন্মের ইস্‌টিমেতেই এ-জন্মের গাড়ি চলছে। মধুসূদন নিজে জানত যে, তাকে ঠকাবার জন্যে অদৃষ্টের ত্রুটি ছিল না, কেবল হিসেবে ভুল করে নি বলেই জীবনের অঙ্ক-ফলে পরীক্ষকের কাটা দাগ পড়ে নি ;—যারা হিসেবের দোষে ফেল করতে মজবুত পরীক্ষকের পক্ষপাতের ’পরে তারাই কটাক্ষপাত করে থাকে।

মধুসূদনের রাশ ভারি। নিজের অবস্থা সম্বন্ধে কথাবার্তা কয় না। তবে কিনা আন্দাজে বেশ বোঝা যায়, মরা গাঙে বান এসেছে। গৃহপালিত

বাংলাদেশে এমন অবস্থায় সহজ মানুষে বিবাহের চিন্তা করে, জীবিত-কালবর্ত্তী সম্পত্তি-ভোগটাকে বংশাবলীর পথ বেয়ে মৃত্যুর পরবর্ত্তী ভবিষ্যতে প্রসারিত করবার ইচ্ছা তাদের প্রবল হয়। কন্যাদায়িকেরা মধুকে উৎসাহ দিতে ত্রুটি করে না; মধুসূদন বলে, "প্রথমে একটা পেট সম্পূর্ণ ভরলে তার পরে অন্য পেটের দায় নেওয়া চলে।" এর থেকে বোঝা যায় মধুসূদনের হৃদয়টা যাই হোক পেটটা ছোটো নয়।

এই সময়ে মধুসূদনের সতর্কতায় রজবপুরের পাটের নাম দাঁড়িয়ে গেল। হঠাৎ মধুসূদন সব-প্রথমেই নদীর ধারের পোড়ো জমি বেবাক কিনে ফেললে, তখন দর সস্তা। ইঁটের পাঁজা পোড়ালে বিস্তর, নেপাল থেকে এল বড়ো বড়ো শালকাঠ, সিলেট থেকে চুন, কলকাতা থেকে মালগাড়ি-বোঝাই করোগেটেড লোহা। বাজারের লোক অবাক। ভাবলে, "এই রে! হাতে কিছু জমেছিল, সেটা সইবে কেন! এবার বদহজমের পালা, কারবার মরণদশায় ঠেকল ব'লে!"

এবারও মধুসূদনের হিসেবে ভুল হল না। দেখতে দেখতে রজবপুরে ব্যবসার একটা আওড় লাগল। তার ঘূর্ণিটানে দালালরা এসে জুটল, এল মাড়োয়ারির দল, কুলির আমদানি হল, কল বসল, চিমনি থেকে কুণ্ডলায়িত ধূমকেতু আকাশে আকাশে কালিমা বিস্তার করলে।

হিসেবের খাতার গবেষণা না করেও মধুসূদনের মহিমা এখন দূর থেকে খালি-চোখেই ধরা পড়ে। একা সমস্ত গঞ্জের মালিক, পাঁচিল-ঘেরা দোতলা ইমারত, গেটে শিলাফলকে লেখা 'মধুচক্র'। এ-নাম তার কলেজের পূর্ব্বতন সংস্কৃত অধ্যাপকের দেওয়া। মধুসূদনকে তিনি পূর্ব্বের চেয়ে অকস্মাৎ এখন অনেক বেশি স্নেহ করেন।

এইবার বিধবা মা ভয়ে-ভয়ে এসে বললে, "বাবা, কবে মরে যাব, বউ-দেখে যেতে পারব না কি?"

মধু গম্ভীরমুখে সংক্ষেপে উত্তর করলে, "বিবাহ করতেও সময় নষ্ট, বিবাহ করেও তাই। আমার ফুরসত কোথায় ?"

পীড়াপীড়ি করে এমন সাহস ওর মায়েরও নেই, কেননা সময়ের বাজার-দর আছে। সবাই জানে, মধুসূদনের এক কথা।

আরও কিছুকাল যায়। উন্নতির জোয়ার বেয়ে কারবারের আপিস মফস্বল থেকে কলকাতায় উঠল। নাতিনাতনীর দর্শনসুখ সম্বন্ধে হাল ছেড়ে দিয়ে মা ইহলোক ত্যাগ করলে। ঘোষাল-কোম্পানির নাম আজ দেশবিদেশে, ওদের ব্যবসা বনেদি বিলিতি কোম্পানির গা ঘেঁষে চলে, বিভাগে বিভাগে ইংরেজ ম্যানেজার।

মধুসূদন এবার স্বয়ং বললে, বিবাহের ফুরসত হল। কন্যার বাজারে ক্রেডিট তার সর্বোচ্চে। অতিবড়ো অভিমানী ঘরেরও মানভঞ্জন করবার মতো তার শক্তি। চারদিক থেকে অনেক কুলবতী রূপবতী গুণবতী ধনবতী বিদ্যাবতী কুমারীদের খবর এসে পৌঁছোয়। মধুসূদন চোখ পাকিয়ে বলে, ওই চাটুজ্যেদের ঘরের মেয়ে চাই।

ঘা-খাওয়া বংশ ঘা-খাওয়া নেকড়ে বাঘের মতো, বড়ো ভয়ংকর।

৩

এইবার কন্যাপক্ষের কথা।

নুরনগরের চাটুজ্যেদের অবস্থা এখন ভালো নয়। ঐশ্বর্যের বাঁধ ভাঙছে। ছয়-আনি শরিকরা বিষয় ভাগ করে বেরিয়ে গেল, এখন তারা বাইরে থেকে লাঠি হাতে দশ-আনির সীমানা খাবলে বেড়াচ্ছে। তাছাড়া রাধাকান্ত জীউর সেবায়তি অধিকার দশে-ছয়ে যতই সূক্ষ্মভাবে ভাগ করবার চেষ্টা চলছে, ততই তার শস্য অংশ স্থূলভাবে উকিলমোক্তারের আঙিনায় নয়-ছয় হয়ে ছড়িয়ে পড়ল, আমলারাও বঞ্চিত হল না

মুরনগরের সে-প্রতাপ নেই— আয় নেই, ব্যয় বেড়েছে চতুর্গুণ। শতকরা ন-টাকা হারে সুদের ন-পাওআলা মাকড়সা জমিদারির চারদিকে জাল জড়িয়ে চলেছে।

পরিবারে দুই ভাই, পাঁচ বোন। কন্যাধিক্য-অপরাধের জরিমানা এখনও শোধ হয় নি। কর্তা থাকতেই চার বোনের বিয়ে হয়ে গেল কুলীনের ঘরে। এদের ধনের বহরটুকু হাল আমলের, খ্যাতিটা সাবেক আমলের। জামাইদের পণ দিতে হল কৌলীন্যের মোটা দামে ও ফাঁকা খ্যাতির লম্বা মাপে। এই বাবদেই ন-পার্সেণ্টের সূত্রে গাঁথা দেনার ফাঁসে বারো পার্সেণ্টের গ্রন্থি পড়ল। ছোটো ভাই মাথা ঝাড়া দিয়ে উঠে বললে, বিলেতে গিয়ে ব্যারিস্টার হয়ে আসি, রোজগার না করলে চলবে না। সে গেল বিলেতে, বড়ো ভাই বিপ্রদাসের ঘাড়ে পড়ল সংসারের ভার।

এই সময়টাতে পূর্বোক্ত ঘোষাল ও চাটুজ্যেদের ভাগ্যের ঘুড়িতে পরস্পরের লখে লখে আর-একবার বেধে গেল। ইতিহাসটা বলি।

বড়োবাজারের তনসুকদাস হালওআইদের কাছে এদের একটা মোটা অঙ্কের দেনা। নিয়মিত সুদ দিয়ে আসছে, কোনো কথা ওঠে নি। এমন সময়ে পূজোর ছুটি পেয়ে বিপ্রদাসের সহপাঠী অমূল্যধন এল আত্মীয়তা দেখাতে। সে হল বড়ো অ্যাটর্নি-আপিসের আর্টিকেল্‌ড্‌ হেড্‌-ক্লার্ক। এই চশমা-পরা যুবকটি মুরনগরের অবস্থাটা আড়চোখে দেখে নিলে। সেও কলকাতায় ফিরল আর তনসুকদাসও টাকা ফেরত চেয়ে বসল; বললে, নতুন চিনির কারবার খুলেছে, টাকার জরুরি দরকার।

বিপ্রদাস মাথায় হাত দিয়ে পড়ল।

সেই সংকটকালেই চাটুজ্যে ও ঘোষাল এই দুই নামে দ্বিতীয়বার ঘটল দ্বন্দ্ব-সমাস। তার পূর্বেই সরকারবাহাদুরের কাছ থেকে মধুসূদন রাজখেতাব

পেয়েছে। পূর্বোক্ত ছাত্রবন্ধু এসে বললে, নতুন রাজা খোশমেজাজে আছে, এই সময়ে ওর কাছ থেকে সুবিধেমতো ধার পাওয়া যেতে পারে। তাই পাওয়া গেল— চাটুজ্যেদের সমস্ত খুচরো দেনা একঠাঁই করে এগারো লাখ টাকা সাত পার্সেন্ট সুদে। বিপ্রদাস হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

কুমুদিনী ওদের শেষ অবশিষ্ট বোন বটে, তেমনি আজ ওদের সম্বলেরও শেষ অবশিষ্ট দশা। পণ জোটানোর, পাত্র জোটানোর কথা কল্পনা করতে গেলে আতঙ্ক হয়। দেখতে সে সুন্দরী, লম্বা ছিপ্‌ছিপে, যেন রজনীগন্ধার পুষ্পদণ্ড; চোখ বড়ো না হোক একেবারে নিবিড় কালো, আর নাকটি নিখুঁত রেখায় যেন ফুলের পাপড়ি দিয়ে তৈরি। রঙ শাঁখের মতো চিকন গৌর; নিটোল দুখানি হাত; সে-হাতের সেবা কমলার বরদান, কৃতজ্ঞ হয়ে গ্রহণ করতে হয়। সমস্ত মুখে একটি বেদনায় সকরুণ ধৈর্যের ভাব।

কুমুদিনী নিজের জন্যে নিজে সংকুচিত। তার বিশ্বাস, সে অপয়া। সে জানে, পুরুষরা সংসার চালায় নিজের শক্তি দিয়ে, মেয়েরা লক্ষ্মীকে ঘরে আনে নিজের ভাগ্যের জোরে। ওর দ্বারা তা হল না। যখন থেকে ওর বোঝবার বয়স হয়েছে তখন থেকে চারিদিকে দেখছে দুর্ভাগ্যের পাপদৃষ্টি। আর, সংসারের উপর চেপে আছে ওর নিজের আইবুড়ো-দশা, জগদ্দল পাথর, তার যতবড়ো দুঃখ, ততবড়ো অপমান। কিছু করবার নেই, কপালে করাঘাত ছাড়া। উপায় করবার পথ বিধাতা মেয়েদের দিলেন না, দিলেন কেবল ব্যথা পাবার শক্তি। অসম্ভব একটা কিছু ঘটে না কি? কোনো দেবতার বর, কোনো যক্ষের ধন, পূর্বজন্মের কোনো একটা বাকিপড়া পাওনার এক মুহূর্তে পরিশোধ? এক-একদিন রাতে বিছানা থেকে উঠে বাগানের মর্মরিত ঝাউগাছগুলোর মাথার উপরে চেয়ে থাকে, মনে-মনে বলে, "কোথায় আমার রাজপুত্র, কোথায় তোমার সাতরাজার ধন মানিক, বাঁচাও আমার ভাইদের, আমি চিরদিন তোমার দাসী হয়ে থাকব।"

বংশের দুর্গতির জন্য নিজেকে যতই অপরাধী করে, ততই হৃদয়ের সুধাপাত্র উপুড় ক'রে ভাইদের ওর ভালোবাসা দেয়— কঠিন দুঃখে নেংড়ানো ওর ভালোবাসা। কুমুর 'পরে তাদের কর্তব্য করতে পারছে না বলে ওর ভাইরাও বড়ো ব্যথার সঙ্গে কুমুকে তাদের স্নেহ দিয়ে ঘিরে রেখেছে। এই পিতৃমাতৃহীনাকে উপরওআলা যে স্নেহের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করেছেন ভাইরা তা ভরিয়ে দেবার জন্যে সর্বদা উৎসুক। ও যে চাঁদের আলোর টুকরো, দৈন্যের অন্ধকারকে একা মধুর করে রেখেছে। যখন মাঝে মাঝে দুর্ভাগ্যের বাহন বলে নিজেকে সে ধিক্‌কার দেয়, দাদা বিপ্রদাস হেসে বলে, "কুমু, তুই নিজেই তো আমাদের সৌভাগ্য— তোকে না পেলে বাড়িতে শ্রী থাকত কোথায় ?"

কুমুদিনী ঘরে পড়াশুনা করেছে। বাইরের পরিচয় নেই বললেই হয়। পুরোনো নতুন দুই কালের আলো-আঁধারে তার বাস। তার জগৎটা আবছায়া— সেখানে রাজত্ব করে সিদ্ধেশ্বরী, গন্ধেশ্বরী, ঘেঁটু, ষষ্ঠী ; সেখানে বিশেষ দিনে চন্দ্র দেখতে নেই ; শাঁখ বাজিয়ে গ্রহণের কুদৃষ্টিকে তাড়াতে হয়, অম্বুবাচীতে সেখানে দুধ খেলে সাপের ভয় ঘোচে ; মন্ত্র প'ড়ে, পাঁঠা মানত ক'রে, সুপুরি আলো-চাল ও পাঁচ পয়সার শিন্নি মেনে, তাগাতাবিজ প'রে, সে-জগতের শুভ-অশুভের সঙ্গে কারবার ; স্বস্ত্যয়নের জোরে ভাগ্য সংশোধনের আশা— সে-আশা হাজারবার ব্যর্থ হয়। প্রত্যক্ষ দেখা যায় অনেক সময়েই শুভলগ্নের শাখায় শুভফল ফলে না, তবু বাস্তবের শক্তি নেই প্রমাণের দ্বারা স্বপ্নের মোহ কাটাতে পারে। স্বপ্নের জগতে বিচার চলে না, একমাত্র চলে মেনে-চলা। এ-জগতে দৈবের ক্ষেত্রে যুক্তির সুসংগতি, বুদ্ধির কর্তৃত্ব, ভালো-মন্দর নিত্যতত্ত্ব নেই বলেই কুমুদিনীর মুখে এমন একটা করুণা। ও জানে, বিনা অপরাধেই ও লাঞ্ছিত। আট বছর হল সেই লাঞ্ছনাকে একান্ত-সে নিজের বলেই গ্রহণ করেছিল— সে তার পিতার মৃত্যু নিয়ে।

৪

পুরোনো ধনী-ঘরে পুরাতন কাল যে-দুর্গে বাস করে তার পাকা গাঁথুনি। অনেক দেউড়ি পার হয়ে তবে নতুন কালকে সেখানে ঢুকতে হয়। সেখানে যারা থাকে নতুন যুগে এসে পৌঁছোতে তাদের বিস্তর লেট হয়ে যায়। বিপ্রদাসের বাপ মুকুন্দলালও ধাবমান নতুন যুগকে ধরতে পারেন নি।

দীর্ঘ তাঁর গৌরবর্ণ দেহ, বাবরি-কাটা চুল, বড়ো বড়ো টানা চোখে অপ্রতিহত প্রভুত্বের দৃষ্টি। ভারি গলায় যখন হাঁক পাড়েন, অনুচর-পরিচরদের বুক থর্ থর্ করে কেঁপে ওঠে। যদিও পালোয়ন রেখে নিয়মিত কুস্তি করা তাঁর অভ্যাস, গায়ে শক্তিও কম নয়, তবু সুকুমার শরীরে শ্রমের চিহ্ন নেই। পরনে চুনট-করা ফুরফুরে মসলিনের জামা, ফরাসডাঙা বা ঢাকাই ধুতির বহুযত্নবিন্যস্ত কোঁচা ভূলুণ্ঠিত, কর্তার আসন্ন আগমনের বাতাস ইস্তাম্বুল আতরের সুগন্ধবার্তা বহন করে। পানের সোনাব বাটা হাতে খানসামা পশ্চাদ্‌বর্তী, দ্বারের কাছে সর্বদা হাজির তকমাপরা আরদালি। সদর-দরজায় বৃদ্ধ চন্দ্রভান জমাদার তামাক মাখা ও সিদ্ধি কোটার অবকাশে বেঞ্চে বসে লম্বা দাড়ি দুই ভাগ করে বার বার আঁচড়িয়ে দুই কানের উপর বাঁধে, নিম্নতন দারোয়ানরা তলোয়ার হাতে পাহারা দেয়। দেউড়ির দেওয়ালে ঝোলে নানারকমের ঢাল, বাঁকা তলোয়ার, বহুকালের পুরানো বন্দুক বল্লম, বর্শা।

বৈঠকখানায় মুকুন্দলাল বসেন গদির উপর, পিঠের কাছে তাকিয়া। পারিষদেরা বসে নিচে, সামনে বাঁয়ে দুই ভাগে। হুঁকাবরদারের জানা আছে এদের কার সম্মান কোন্ রকম হুঁকোয় রক্ষা হয়, বাঁধানো, আবাঁধানো, না, গুড়্গুড়ি। কর্তামহারাজের জন্যে বৃহৎ আলবোলা, গোলাপজলের গন্ধে সুগন্ধি।

বাড়ির আর-এক মহলে বিলিতি বৈঠকখানা, সেখানে অষ্টাদশ শতাব্দীর বিলিতি আসবাব। সামনেই কালোদাগ-ধরা মস্ত এক আয়না, তার গিলটি-করা ফ্রেমের দুই গায়ে ডানাওআলা পরীমূর্তির হাতে-ধরা বাতিদান। তলায় টেবিলে সোনার জলে চিত্রিত কালো পাথরের ঘড়ি, আর কতকগুলো বিলিতি কাঁচের পুতুল। খাড়াপিঠওআলা চৌকি, সোফা, কড়িতে দোদুল্যমান ঝাড়লণ্ঠন সমস্তই হল্যাণ্ড-কাপড়ে মোড়া। দেয়ালে পূর্বপুরুষদের অয়েলপেন্টিং, আর তার সঙ্গে বংশের মুরুব্বি দু-একজন রাজ-পুরুষের ছবি। ঘরজোড়া বিলিতি কার্পেট, তাতে মোটা মোটা ফুল টক্‌টকে কড়া রঙে আঁকা। বিশেষ ক্রিয়াকর্মে জিলার সাহেবসুবাদের নিমন্ত্রণোপলক্ষ্যে এই ঘরের অবগুণ্ঠন মোচন হয়। বাড়িতে এই একটা মাত্র আধুনিক ঘর, কিন্তু মনে হয়, এইটেই সবচেয়ে প্রাচীন ভূতে-পাওয়া কামরা, অব্যবহারের রুদ্ধ ঘনগন্ধে দম-আটকানো দৈনিক জীবনযাত্রার সম্পর্কবঞ্চিত, বোবা।

মুকুন্দলালের যে শৌখিনতা সেটা তখনকার আদবকায়দার অত্যাবশ্যক অঙ্গ। তার মধ্যে যে নির্ভীক ব্যয়বাহুল্য, সেইটেতেই ধনের মর্যাদা। অর্থাৎ ধন বোঝা হয়ে মাথায় চড়ে নি, পাদপীঠ হয়ে আছে পায়ের তলায়। এঁদের শৌখিনতার আমদরবারে দানদাক্ষিণ্য, খাসদরবারে ভোগবিলাস,—দুই-ই খুব টানা মাপের। একদিকে আশ্রিতবাৎসল্যে যেমন অকৃপণতা, আর-একদিকে ঔদ্ধত্যদমনে তেমনি অবাধ অধৈর্য। একজন হঠাৎ-ধনী প্রতিবেশী গুরুতর অপরাধে কর্তার বাগানের মালীর ছেলের কান মলে দিয়েছিল মাত্র; এই ধনীর শিক্ষাবিধান বাবদ যত খরচ হয়েছে, নিজের ছেলেকে কলেজ পার করতেও এখনকার দিনে এত খরচ করে না। অথচ মালীর ছেলেটাকেও অগ্রাহ্য করেন নি। চাবকিয়ে তাকে শয্যাগত করেছিলেন। রাগের চোটে চাবুকের মাত্রা বেশি হয়েছিল বলে

ছেলেটার উন্নতি হল। সরকারি খরচে পড়াশুনা করে সে আজ ডাক্তারি করে।

পুরাতন কালের ধনবানদের প্রথামতো মুকুন্দলালের জীবন দুই-মহলা। এক মহলে গার্হস্থ্য, আর-এক মহলে ইয়ারকি। অর্থাৎ এক মহলে দশকর্ম, আর-এক মহলে একাদশ অকর্ম। ঘরে আছেন ইষ্টদেবতা আর ঘরের গৃহিণী। সেখানে পূজা-অর্চনা, অতিথিসেবা, পালপার্বণ, ব্রত-উপবাস, কাঙালিবিদায়, ব্রাহ্মণভোজন, পাড়াপড়শি, গুরুপুরোহিত। ইয়ারমহল গৃহিণীমার বাইরেই, সেখানে নবাবি আমল, মজলিসি সমারোহে সরগরম। এইখানে আনাগোনা চলত গৃহের প্রত্যন্তপুরবাসিনীদের। তাদের সংসর্গকে তখনকার ধনীরা সহবত শিক্ষার উপায় বলে গণ্য করত। দুই বিরুদ্ধ হাওয়ার দুই কক্ষবর্তী গ্রহ-উপগ্রহ নিয়ে গৃহিণীদের বিস্তর সহ্য করতে হয়।

মুকুন্দলালের স্ত্রী নন্দরানী অভিমানিনী, সহ্য করাটা তাঁর সম্পূর্ণ অভ্যাস হল না। তার কারণ ছিল। তিনি নিশ্চিত জানেন বাইরের দিকে তাঁর স্বামীর তানের দৌড় যতদূরই থাক তিনিই হচ্ছেন ধুয়ো, ভিতরের শক্ত টান তাঁরই দিকে। সেইজন্যেই স্বামী যখন নিজের ভালোবাসার 'পরে নিজে অন্যায় করেন, তিনি সেটা সইতে পারেন না। এবারে তাই ঘটল।

৫

রাসের সময় খুব ধুম। কতক কলকাতা কতক ঢাকা থেকে আমোদের সরঞ্জাম এল। বাড়ির উঠোনে কৃষ্ণযাত্রা, কোনোদিন বা কীর্তন। এইখানে মেয়েদের ও সাধারণ পাড়াপড়শির ভিড়। অন্যবারে তামসিক আয়োজনটা হত বৈঠকখানাঘরে; অন্তঃপুরিকারা, রাতে ঘুম নেই, বুকে ব্যথা বিঁধছে, দরজার ফাঁক দিয়ে কিছু-কিছু আভাস নিয়ে যেতে পারতেন। এবারে খেয়াল গেল বাইনাচের ব্যবস্থা হবে বজরায় নদীর উপর।

কী হচ্ছে দেখবার জো নেই বলে নন্দরানীর মন রুদ্ধবাণীর অন্ধকারে আছড়ে আছড়ে কাঁদতে লাগল। ঘরে কাজকর্ম, লোককে খাওয়ানো, দাওয়ানো, দেখাশুনা হাসিমুখেই করতে হয়। বুকের মধ্যে কাঁটাটা নড়তে-চড়তে কেবলই বেঁধে, প্রাণটা হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে ওঠে, কেউ জানতে পারে না। ওদিকে থেকে-থেকে তৃপ্ত কণ্ঠের রব ওঠে, জয় হোক্‌ রানীমার।

অবশেষে উৎসবের মেয়াদ ফুরোল, বাড়ি হয়ে গেল খালি। কেবল ছেঁড়া কলাপাতা ও সরা-খুরি-ভাঁড়ের ভগ্নাবশেষের উপর কাক-কুকুরের কলরবমুখর উত্তরকাণ্ড চলছে। ফরাশেরা সিঁড়ি খাটিয়ে লণ্ঠন খুলে নিল, চাঁদোয়া নামাল, ঝাড়ের টুকরো বাতি ও শোলার ফুলের ঝালরগুলো নিয়ে পাড়ার ছেলেরা কাড়াকাড়ি বাধিয়ে দিল। সেই ভিড়ের মধ্যে মাঝে মাঝে চড়ের আওয়াজ ও চীৎকার কান্না যেন তারস্বরের হাউইয়ের মতো আকাশ ফুঁড়ে উঠছে। অন্তঃপুরের প্রাঙ্গণ থেকে উচ্ছিষ্ট ভাত-তরকারির গন্ধে বাতাস অম্লগন্ধী; সেখানে সর্বত্র ক্লান্তি, অবসাদ ও মলিনতা। এই শূন্যতা অসহ্য হয়ে উঠল যখন মুকুন্দলাল আজও ফিরলেন না। নাগাল পাবার উপায় নেই বলেই নন্দরানীর ধৈর্যের বাঁধ হঠাৎ ফেটে খান্‌-খান্‌ হয়ে গেল।

দেওয়ানজিকে ডাকিয়ে পরদার আড়াল থেকে বললেন, "কর্তাকে বলবেন, "বৃন্দাবনে মার কাছে আমাকে এখনই যেতে হচ্ছে। তাঁর শরীর ভালো নেই।"

দেওয়ানজি কিছুক্ষণ টাকে হাত বুলিয়ে মৃদুস্বরে বললেন, "কর্তাকে জানিয়ে গেলেই ভালো হত, মাঠাকরুন। আজকালের মধ্যে বাড়ি ফিরবেন খবর পেয়েছি।"

"না, দেরি করতে পারব না।"

নন্দরানীও খবর পেয়েছেন, আজকালের মধ্যেই ফেরবার কথা। সেই জন্যেই যাবার এত তাড়া। নিশ্চয় জানেন, অল্প একটু কান্নাকাটি-

সাধ্যসাধনাতেই সব শোধ হয়ে যাবে। প্রতিবারই এমনি হয়েছে। উপযুক্ত শাস্তি অসমাপ্তই থাকে। এবারে তা কিছুতেই চলবে না। তাই দণ্ডের ব্যবস্থা করে দিয়েই দণ্ডদাতাকে পালাতে হচ্ছে। বিদায়ের ঠিক পূর্বমুহূর্তে পা সরতে চায় না— শোবার খাটের উপর উপুড় হয়ে পড়ে ফুলে ফুলে কান্না। কিন্তু যাওয়া বন্ধ হল না।

তখন কার্তিক মাসের বেলা দুটো। রৌদ্রে বাতাস আতপ্ত। রাস্তার ধারের শিশুতরুশ্রেণীর মর্মরের সঙ্গে মিশে কচিৎ গলাভাঙা কোকিলের ডাক আসছে। যে রাস্তা দিয়ে পালকি চলেছে, সেখান থেকে কাঁচা ধানের খেতের পরপ্রান্তে নদী দেখা যায়। নন্দরানী থাকতে পারলেন না, পালকির দরজা ফাঁক করে সেদিকে চেয়ে দেখলেন। ওপারের চরে বজরা বাঁধা আছে, চোখে পড়ল। মাস্তলের উপর নিশেন উড়ছে। দূর থেকে মনে হল বজরার ছাতের উপর চিরপরিচিত গুপি হরকরা বসে; তার পাগড়ির তকমার উপর সূর্যের আলো ঝক্‌মক্‌ করছে। সবলে পালকির দরজা বন্ধ করে দিলেন, বুকের ভিতরটা পাথর হয়ে গেল।

৬

মুকুন্দলাল, যেন মাস্তল-ভাঙা, পাল-ছেঁড়া, টোল-খাওয়া, তুফানে আছাড়-লাগা জাহাজ, সসংকোচে বন্দরে এসে ভিড়লেন। অপরাধের বোঝায় বুক ভারি। প্রমোদের স্মৃতিটা যেন অতিভোজনের পরের উচ্ছিষ্টের মতো মনটাকে বিতৃষ্ণায় ভরে দিয়েছে। যারা ছিল তাঁর এই আমোদের উৎসাহদাতা উদ্‌যোগকর্তা, তারা যদি সামনে থাকত তাহলে তাদের ধরে চাবুক কষিয়ে দিতে পারতেন। মনে-মনে পণ করছেন, আর কখনো এমন হতে দেবেন না। তাঁর আলুথালু চুল, রক্তবর্ণ চোখ আর মুখের অতিশুষ্ক ভাব দেখে প্রথমটা কেউ সাহস করে কর্ত্রীঠাকরুনের খবরটা

দিতে পারলে না ; মুকুন্দলাল ভয়ে-ভয়ে অন্তঃপুরে গেলেন। "বড়োবউ, মাপ করো, অপরাধ করেছি, আর-কখনো এমন হবে না" এই কথা মনে-মনে বলতে বলতে শোবার ঘরের দরজার কাছে একটুখানি থমকে দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে ভিতরে ঢুকলেন। মনে-মনে নিশ্চয় স্থির করেছিলেন যে, অভিমানিনী বিছানায় পড়ে আছেন। একেবারে পায়ের কাছে গিয়ে পড়বেন, এই ভেবে ঘরে ঢুকেই দেখলেন ঘর শূন্য। বুকের ভিতরটা দমে গেল। শোবার ঘরে বিছানায় নন্দরানীকে যদি দেখতেন তবে বুঝতেন যে, অপরাধ ক্ষমা করবার জন্যে মানিনী অর্ধেক রাস্তা এগিয়ে আছেন। কিন্তু বড়োবউ যখন শোবার ঘরে নেই তখন মুকুন্দলাল বুঝলেন তাঁর প্রায়শ্চিত্তটা হবে দীর্ঘ এবং কঠিন। হয়তো আজ রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে, কিংবা হবে আরও দেরি। কিন্তু এতক্ষণ ধৈর্য ধরে থাকা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। সম্পূর্ণ শাস্তি এখনই মাথা পেতে নিয়ে ক্ষমা আদায় করবেন, নইলে জলগ্রহণ করবেন না। বেলা হয়েছে, এখনও স্নানাহার হয় নি, এ দেখে কি সাধ্বী থাকতে পারবেন ? শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দেখলেন, প্যারী দাসী বারান্দার এক কোণে মাথায় ঘোমটা দিয়ে দাঁড়িয়ে। জিজ্ঞাসা করলেন, "তোর বড়োবউমা কোথায় ?"

সে বললে, "তিনি তাঁর মাকে দেখতে পরশুদিন বৃন্দাবনে গেছেন।"

ভালো যেন বুঝতে পারলেন না, রুদ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, "কোথায় গেছেন ?"

"বৃন্দাবনে। মায়ের অসুখ।"

মুকুন্দলাল একবার বারান্দার রেলিং চেপে ধরে দাঁড়ালেন। তার পরে দ্রুতপদে বাইরের বৈঠকখানায় গিয়ে একা বসে রইলেন। একটি কথা কইলেন না। কাছে আসতে কারও সাহস হয় না।

যোগাযোগ

দেওয়ানজি এসে ভয়ে ভয়ে বললেন, "মাঠাকরুনকে আনতে লোক পাঠিয়ে দিই ?"

কোনো কথা না বলে কেবল আঙুল নেড়ে নিষেধ করলেন। দেওয়ানজি চলে গেলে রাধু খানসামাকে ডেকে বললেন, "ব্র্যাণ্ডি লে আও।"

বাড়িসুদ্ধ লোক হতবুদ্ধি। ভূমিকম্প যখন পৃথিবীর গভীর গর্ভ থেকে মাথা নাড়া দিয়ে ওঠে তখন যেমন তাকে চাপা দেবার চেষ্টা করা মিছে, নিরুপায়ভাবে তার ভাঙাচোরা সহ্য করতেই হয়— এ ও তেমনি।

দিনরাত চলছে নির্জল ব্র্যাণ্ডি। খাওয়াদাওয়া প্রায় নেই। একে শরীর পূর্ব থেকেই ছিল অবসন্ন, তারপরে এই প্রচণ্ড অনিয়মে বিকারের সঙ্গে রক্তবমন দেখা দিল।

কলকাতা থেকে ডাক্তার এল— দিনরাত মাথায় বরফ চাপিয়ে রাখলে।

মুকুন্দলাল যাকে দেখেন খেপে ওঠেন, তাঁর বিশ্বাস তাঁর বিরুদ্ধে বাড়িসুদ্ধ লোকের চক্রান্ত। ভিতরে ভিতরে একটা নালিশ গুমরে উঠছিল —এরা যেতে দিলে কেন ?

একমাত্র মানুষ যে তাঁর কাছে আসতে পারত সে কুমুদিনী। সে এসে পাশে বসে ; ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তার মুখের দিকে মুকুন্দলাল চেয়ে দেখেন,— যেন মার সঙ্গে ওর চোখে কিংবা কোথাও একটা মিল দেখতে পান। কখনো কখনো বুকের উপরে তার মুখ টেনে নিয়ে চুপ করে চোখ বুজে থাকেন, চোখের কোণ দিয়ে জল পড়তে থাকে, কিন্তু কখনো ভুলে একবার তার মার কথা জিজ্ঞাসা করেন না। এদিকে বৃন্দাবনে টেলিগ্রাম গেছে। কর্ত্রীঠাকরুনের কালই ফেরবার কথা। কিন্তু শোনা গেল কোথায় এক জায়গায় রেলের লাইন গেছে ভেঙে।

যোগাযোগ

৭

সেদিন তৃতীয়া; সন্ধ্যাবেলায় ঝড় উঠল। বাগানে মড়্ মড়্ করে গাছের ডাল ভেঙে পড়ে। থেকে-থেকে বৃষ্টির ঝাপটা ঝাঁকানি দিয়ে উঠছে ক্রুদ্ধ অধৈর্যের মতো। লোকজন খাওয়াবার জন্যে যে-চালাঘর তোলা হয়েছিল তার করোগেটেড লোহার চাল উড়ে দিঘিতে গিয়ে পড়ল। বাতাস বাণবিদ্ধ বাঘের মতো গোঁ গোঁ করে গোঙরাতে গোঙরাতে আকাশে আকাশে লেজ ঝাপটা দিয়ে পাক খেয়ে বেড়ায়। হঠাৎ বাতাসের এক দমকে জানলাদরজাগুলো খড়্ খড়্ করে কেঁপে উঠল। কুমুদিনীর হাত চেপে ধরে মুকুন্দলাল বললেন, "মা কুমু, ভয় নেই, তুই তো কোনো দোষ করিস নি। ওই শোন্ দাঁতকড়মড়ানি, ওরা আমাকে মারতে আসছে।"

বাবার মাথায় বরফের পুঁটুলি বুলোতে বুলোতে কুমুদিনী বলে, "মারবে কেন বাবা? ঝড় হচ্ছে, এখনই থেমে যাবে।"

"বৃন্দাবন? বৃন্দাবন...চন্দ্র...চক্রবর্তী! বাবার আমলের পুরুত— সে তো মরে গেছে— ভূত হয়ে গেছে বৃন্দাবনে। কে বললে সে আসবে?"

"কথা কোয়ো না বাবা, একটু ঘুমোও।"

"ওই যে, কাকে বলছে, খবরদার, খবরদার।"

"কিছু না, বাতাসে বাতাসে গাছগুলোকে ঝাঁকানি দিচ্ছে।"

"কেন, ওর রাগ কিসের? এতই কী দোষ করেছি, তুই বল্ মা।"

"কোনো দোষ কর নি বাবা। একটু ঘুমোও।"

"বিন্দে দূতী? সেই যে মধু অধিকারী সাজত।

মিছে কর কেন নিন্দে
ওগো বিন্দে শ্রীগোবিন্দে—"

চোখ বুজে গুন্ গুন্ করে গাইতে লাগলেন।—

"কার বাঁশি ঐ বাজে বৃন্দাবনে।
সই লো সই
ঘরে আমি রইব কেমনে।"

"মাধু, ব্র্যাণ্ডি লে আও।"

কুমুদিনী বাবার মুখের দিকে ঝুঁকে পড়ে বলে, "বাবা, ও কী বলছ?" মুকুন্দলাল চোখ চেয়ে তাকিয়েই জিভ কেটে চুপ করেন। বুদ্ধি যখন অত্যন্ত বেঠিক তখনও এ কথা ভোলেন নি যে, কুমুদিনীর সামনে মদ চলতে পারে না।

একটু পরে আবার গান ধরলেন,

"শ্যামের বাঁশি কাড়তে হবে,
নইলে আমায় এ বৃন্দাবন ছাড়তে হবে।"

এই এলোমেলো গানের টুকরোগুলো শুনে কুমুর বুক ফেটে যায়— মায়ের উপর রাগ করে, বাবার পায়ের তলায় মাথা রাখে, যেন মায়ের হয়ে মাপ-চাওয়া।

মুকুন্দ হঠাৎ ডেকে উঠলেন, "দেওয়ানজি!"

দেওয়ানজি আসতে তাকে বললেন "ওই যেন ঠক্ ঠক্ শুনতে পাচ্ছি।"

দেওয়ানজি বললেন, "বাতাসে দরজা নাড়া দিচ্ছে।"

"বুড়ো এসেছে, সেই বৃন্দাবনচন্দ্র— টাক মাথায়, লাঠি হাতে, চেলির চাদর কাঁধে। দেখে এস তো। কেবলি ঠক্ ঠক্ ঠক্ ঠক্ করছে। লাঠি না খড়ম?"

রক্তবমন কিছুক্ষণ শান্ত ছিল। তিনটে রাত্রে আবার আরম্ভ হল। মুকুন্দলাল বিছানার চারিদিকে হাত বুলিয়ে জড়িতস্বরে বললেন, "বড়োবউ, ঘর যে অন্ধকার! এখনও আলো জ্বালবে না?"

যোগাযোগ

বজরা থেকে ফিরে আসবার পর মুকুন্দলাল এই প্রথম স্ত্রীকে সম্ভাষণ করলেন — আর এই শেষ।

বৃন্দাবন থেকে ফিরে এসে নন্দরানী বাড়ির দরজার কাছে মূর্ছিত হয়ে লুটিয়ে পড়লেন। তাঁকে ধরাধরি করে বিছানায় এনে শোয়াল। সংসারে কিছুই তাঁর আর রুচল না। চোখের জল একেবারে শুকিয়ে গেল। ছেলেমেয়েদের মধ্যেও সান্ত্বনা নেই। গুরু এসে শাস্ত্রের শ্লোক আওড়ালেন, মুখ ফিরিয়ে রইলেন। হাতের লোহা খুললেন না — বললেন, "আমার হাত দেখে বলেছিল আমার এয়োত ক্ষয় হবে না। সে কি মিথ্যে হতে পারে ?"

দূরসম্পর্কের ক্ষেমা ঠাকুরঝি আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে বললেন, "যা হবার তা তো হয়েছে, এখন ঘরের দিকে তাকাও। কর্তা যে যাবার সময় বলে গেছেন, বড়োবউ ঘরে কি আলো জ্বালবে না ?"

নন্দরানী বিছানা থেকে উঠে বসে দূরের দিকে তাকিয়ে বললেন, "যাব, আলো জ্বালতে যাব। এবার আর দেরি হবে না।" বলে তাঁর পাণ্ডুবর্ণ শীর্ণ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, যেন হাতে প্রদীপ নিয়ে এখনই যাত্রা করে চলেছেন।

সূর্য গেছেন উত্তরায়ণে, মাঘ মাস এল, শুক্লা চতুর্দশী। নন্দরানী কপালে মোটা করে সিঁদুর পরলেন, গায়ে জড়িয়ে নিলেন লাল বেনারসি শাড়ি। সংসারের দিকে না তাকিয়ে, মুখে হাসি নিয়ে চলে গেলেন।

বাবার মৃত্যুর পর বিপ্রদাস দেখলে, যে-গাছে তাদের আশ্রয় তার শিকড় খেয়ে দিয়েছে পোকায়। বিষয়সম্পত্তি ঋণের চোরাবালির উপর

দাঁড়িয়ে— অল্প করে ডুবছে। ক্রিয়াকর্ম সংক্ষেপ ও চালচলন খাটো না করলে উপায় নেই। কুমুর বিয়ে নিয়েও কেবলই প্রশ্ন আসে, তার উত্তর দিতে মুখে বাধে। শেষকালে নুরনগর থেকে বাসা তুলতে হল। কলকাতায় বাগবাজারের দিকে একটা বাড়িতে এসে উঠল।

পুরোনো বাড়িতে কুমুদিনীর একটা প্রাণময় পরিমণ্ডল ছিল। চারিদিকে ফুলফল, গোয়ালঘর, পূজোবাড়ি, শস্যখেত, মানুষজন। অন্তঃপুরের বাগানে ফুল তুলেছে, সাজি ভরেছে, নুন-লঙ্কা-ধনেপাতার সঙ্গে কাঁচা কুল মিশিয়ে অপথ্য করেছে, চালতা পেড়েছে, বোশেখ-জষ্টির ঝড়ে আমবাগানে আম কুড়িয়েছে। বাগানের পূর্বপ্রান্তে ঢেঁকিশাল, সেখানে লাডুকোটা প্রভৃতি উপলক্ষ্যে মেয়েদের কলকোলাহলে তারও অল্প কিছু অংশ ছিল। শ্যাওলায়-সবুজ প্রাচীর দিয়ে ঘেরা খিড়কির পুকুর, ঘন ছায়ায় স্নিগ্ধ, কোকিল-ঘুঘু-দোয়েল-শ্যামার ডাকে মুখরিত। এইখানে প্রতিদিন সে জলে কেটেছে সাঁতার, নালফুল তুলেছে, ঘাটে বসে দেখেছে খেয়াল, আনমনে একা বসে করেছে পশম সেলাই। ঋতুতে ঋতুতে মাসে মাসে প্রকৃতির উৎসবের সঙ্গে মানুষের এক-একটি পরব বাঁধা; অক্ষয়-তৃতীয়া থেকে দোলযাত্রা বাসন্তীপূজো পর্যন্ত কত কী। মানুষে প্রকৃতিতে হাত মিলিয়ে সমস্ত বছরটিকে যেন নানা কারুশিল্পে বুনে তুলছে। সবই যে সুন্দর, সবই যে সুখের তা নয়। মাছের ভাগ, পূজোর পার্বণী, কর্ত্রীর পক্ষপাত, ছেলেদের কলহে স্ব-স্ব ছেলের পক্ষসমর্থন প্রভৃতি নিয়ে নীরবে ঈর্ষা বা তারস্বরে অভিযোগ, কানে কানে পরচর্চা বা মুক্তকণ্ঠে অপবাদঘোষণা এ-সমস্ত প্রচুর পরিমাণেই আছে— সব-চেয়ে আছে নিত্যনৈমিত্তিক কাজের ব্যস্ততার ভিতরে ভিতরে নিয়ত একটা উদ্বেগ— কর্তা কখন কী করে বসেন, তাঁর বৈঠকে কখন কী দুর্যোগ আরম্ভ হয়। যদি আরম্ভ হল তবে দিনের পরে দিন শান্তি নেই। কুমুদিনীর বুক দুর্ দুর্ করে, ঘরে লুকিয়ে

মা কাঁদেন, ছেলেদের মুখ শুকনো। এই সমস্ত শুভে অশুভে সুখে দুঃখে সর্বদা আন্দোলিত প্রকাণ্ড সংসারযাত্রা।

এরই মধ্য থেকে কুমুদিনী এল কলকাতায়। এ যেন মস্ত একটা সমুদ্র কিন্তু কোথায় একফোঁটা পিপাসার জল? দেশে আকাশের বাতাসেরও একটা চেনা চেহারা ছিল। গ্রামের দিগন্তে কোথাও বা ঘন বন, কোথাও বা বালির চর, নদীর জলরেখা, মন্দিরের চূড়ো, শূন্য বিস্তৃত মাঠ, বুনো ঝাউয়ের ঝোপ, গুণটানা পথ— এরা নানা রেখায় নানা রঙে বিচিত্র ঘের দিয়ে আকাশকে একটি বিশেষ আকাশ করে তুলেছিল, কুমুদিনীর আপন আকাশ। সূর্যের আলোও ছিল তেমনি বিশেষ আলো। দিঘিতে, শস্যখেতে, বেতের ঝাড়ে, জেলে-নৌকোর খয়েরি রঙের পালে, বাঁশঝাড়ের কচি ডালের চিকন পাতায়, কাঁঠালগাছের মসৃণ-ঘন সবুজে, ওপারের বালুতটের ফ্যাকাশে হলদেয়— সমস্তর সঙ্গে নানাভাবে মিশিয়ে সেই আলো একটি চিরপরিচিত রূপ পেয়েছিল। কলকাতার এই সব অপরিচিত বাড়ির ছাদে দেয়ালে কঠিন অনম্র রেখার আঘাতে নানাখানা হয়ে সেই চিরদিনের আকাশ আলো তাকে বেগানা লোকের মতো কড়া চোখে দেখে। এখানকার দেবতাও তাকে একঘরে করেছে।

বিপ্রদাস তাকে কেদারার কাছে টেনে নিয়ে বলে, "কী কুমু, মন কেমন করছে?"

কুমুদিনী হেসে বলে, "না দাদা, একটুও না।"

"যাবি বোন, ম্যুজিয়ম দেখতে?"

"হ্যাঁ, যাব।"

এত বেশি উৎসাহের সঙ্গে বলে যে, বিপ্রদাস যদি পুরুষমানুষ না হত তবে বুঝতে পারত যে এটা স্বাভাবিক নয়। ম্যুজিয়মে না যেতে হলেই সে বাঁচে। বাইরের লোকের ভিড়ের মধ্যে বেরোনো অভ্যেস নেই বলে

জনসমাগমে যেতে তার সংকোচের অন্ত নেই। হাতপা ঠাণ্ডা হয়ে যায়, চোখ চেয়ে ভালো করে দেখতেই পারে না।

বিপ্রদাস তাকে দাবাখেলা শেখালে। নিজে অসামান্য খেলোয়াড়, কুমুর কাঁচা খেলা নিয়ে তার আমোদ লাগে। শেষকালে নিয়মিত খেলতে খেলতে কুমুর এতটা হাত পাকল যে, বিপ্রদাসকে সাবধানে খেলতে হয়। কলকাতায় কুমুর সমবয়সী মেয়ে-সঙ্গিনী না থাকাতে এই দুই ভাইবোন যেন দুই ভাইয়ের মতো হয়ে উঠেছে। সংস্কৃত সাহিত্যে বিপ্রদাসের বড়ো অনুরাগ; কুমু একমনে তার কাছ থেকে ব্যাকরণ শিখেছে। যখন কুমারসম্ভব পড়লে তখন থেকে শিবপূজায় সে শিবকে দেখতে পেলে, সেই মহাতপস্বী যিনি তপস্বিনী উমার পরম তপস্যার ধন। কুমারীর ধ্যানে তার ভাবী পতি পবিত্রতার দৈবজ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে দেখা দিলে।

বিপ্রদাসের ফটোগ্রাফ তোলার শখ, কুমুও তাই শিখে নিলে। ওরা কেউ বা নেয় ছবি, কেউ বা সেটাকে ফুটিয়ে তোলে। বন্দুকে বিপ্রদাসের হাত পাকা। পার্বণ উপলক্ষ্যে দেশে যখন যায়, খিড়কির পুকুরে ডাব, বেলের খোলা, আখরোট প্রভৃতি ভাসিয়ে দিয়ে পিস্তল অভ্যাস করে; কুমুকে ডাকে, "আয় না কুমু, দেখ্ না চেষ্টা করে।"

যে-কোনো বিষয়েই তার দাদার রুচি সে-সমস্তকেই বহু যত্নে কুমু আপনার করে নিয়েছে। দাদার কাছে এসরাজ শিখে শেষে ওর হাত এমন হল যে, দাদা বলে, "আমি হার মানলুম।"

এমনি করে, শিশুকাল থেকে যে-দাদাকে ও সব চেয়ে বেশি ভক্তি করে, কলকাতায় এসে তাকেই সে সব চেয়ে কাছে পেলে। কলকাতায় আসা সার্থক হল। কুমু স্বভাবতই মনের মধ্যে একলা। পর্বতবাসিনী উমার মতোই ও যেন এক কল্প-তপোবনে বাস করে, মানস-সরোবরের

কুলে। এইরকম জন্ম-একলা মানুষদের জন্যে দরকার মুক্ত আকাশ, বিস্তৃত নির্জনতা, এবং তারই মধ্যে এমন একজন কেউ, যাকে নিজের সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে ভক্তি করতে পারে। নিকটের সংসার থেকে এই দূরবর্তিতা মেয়েদের স্বভাবসিদ্ধ নয় বলে মেয়েরা এটা একেবারেই পছন্দ করে না। তারা এটাকে হয় অহংকার, নয় হৃদয়হীনতা বলে মনে করে। তাই দেশে থাকতেও সঙ্গিনীদের মহলে কুমুদিনীর বন্ধুত্ব জমে ওঠে নি।

পিতা-বর্তমানেই বিপ্রদাসের বিবাহ প্রায় ঠিক, এমন সময় গায়ে হলুদের দুদিন আগেই কনেটি জরবিকারে মারা গেল। তখন ভাটপাড়ায় বিপ্রদাসের কুষ্ঠিগণনায় বেরোল, বিবাহস্থানীয় দুর্গ্রহের ভোগক্ষয় হতে দেরি আছে। বিবাহ চাপা পড়ল। ইতিমধ্যে ঘটল পিতার মৃত্যু। তার পর থেকে ঘটকালি প্রশ্রয় পাবার মতো অনুকূল সময় বিপ্রদাসের ঘরে এল না। ঘটক একদা মস্ত একটা মোটা পণের আশা দেখালে। তাতে হল উলটো ফল। কম্পিত হস্তে হুঁকোটি দেয়ালের গায়ে ঠেকিয়ে সেদিন অত্যন্ত দ্রুতপদেই ঘটককে রাস্তায় বেরিয়ে পড়তে হয়েছিল।

৯

সুবোধের চিঠি বিলেত থেকে আসত নিয়মমতো। এখন মাঝে মাঝে ফাঁক পড়ে। কুমু ডাকের জন্যে ব্যগ্র হয়ে চেয়ে থাকে। বেহারা এবার চিঠি তারই হাতে দিল। বিপ্রদাস আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দাড়ি কামাচ্ছে, কুমু ছুটে গিয়ে বললে, "দাদা, ছোড়দাদার চিঠি।"

দাড়ি-কামানো সেরে কেদারায় বসে বিপ্রদাস একটু যেন ভয়ে ভয়েই চিঠি খুললে। পড়া হয়ে গেলে চিঠিখানা এমন করে হাতে চাপলে যেন সে একটা তীব্র ব্যথা।

কুমুদিনী ভয় পেয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "ছোড়দাদার অসুখ করে নি তো?"

"না, সে ভালোই আছে।"

"চিঠিতে কী লিখেছেন বলো না দাদা।"

"পড়াশুনোর কথা।"

কিছুদিন থেকে বিপ্রদাস কুমুকে সুবোধের চিঠি পড়তে দেয় না। একটু-আধটু পড়ে শোনায়। এবার তাও নয়। চিঠিখানা চেয়ে নিতে কুমুর সাহস হল না, মনটা ছট্‌ফট্‌ করতে লাগল।

সুবোধ প্রথম-প্রথম হিসেব করেই খরচ চালাত। বাড়ির দুঃখের কথা তখনও মনে তাজা ছিল। এখন সেটা যতই ছায়ার মতো হয়ে এসেছে, খরচও ততই চলেছে বেড়ে। বলছে, বড়োরকম চালে চলতে না পারলে এখানকার সামাজিক উচ্চশিখরের আবহাওয়ায় পৌঁছানো যায় না। আর তা না গেলে বিলেতে আসাই ব্যর্থ হয়।

দায়ে পড়ে দুই-একবার বিপ্রদাসকে তার-যোগে অতিরিক্ত টাকা পাঠাতে হয়েছে। এবার দাবি এসেছে হাজার পাউণ্ডের— জরুরি দরকার।

বিপ্রদাস মাথায় হাত দিয়ে বললে, পাব কোথায়। গায়ের রক্ত জল করে কুমুর বিবাহের জন্যে টাকা জমাচ্ছি, শেষে কি সেই টাকায় টান পড়বে? কী হবে সুবোধের ব্যারিস্টার হয়ে, কুমুর ভবিষ্যৎ ফতুর করে যদি তার দাম দিতে হয়?

সে-রাত্রে বিপ্রদাস বারান্দায় পায়চারি করে বেড়াচ্ছে। জানে না, কুমুদিনীর চোখেও ঘুম নেই। এক সময়ে যখন বড়ো অসহ্য হল কুমু ছুটে এসে বিপ্রদাসের হাত ধরে বললে, "সত্যি করে বলো দাদা, ছোড়দাদার কী হয়েছে? পায়ে পড়ি, আমার কাছে লুকিয়োনা।"

বিপ্রদাস বুঝলে গোপন করতে গেলে কুমুদিনীর আশঙ্কা আরও বেড়ে উঠবে। একটু চুপ করে থেকে বললে, "সুবোধ টাকা চেয়ে পাঠিয়েছে, অত টাকা দেবার শক্তি আমার নেই।"

যোগাযোগ

কুমু বিপ্রদাসের হাত ধরে বললে, "দাদা, একটা কথা বলি, রাগ করবে না বলো।"

"রাগ করবার মতো কথা হলে রাগ না করে বাঁচব কী করে?"

"না দাদা, ঠাট্টা নয়, শোনো আমার কথা— মায়ের গয়না তো আমার জন্যে আছে— তাই নিয়ে—"

"চুপ, চুপ, তোর গয়নায় কি আমরা হাত দিতে পারি!"

"আমি তো পারি।"

"না, তুইও পারিস নে। থাক সে-সব কথা, এখন ঘুমোতে যা।"

কলকাতা শহরের সকাল, কাকের ডাক ও স্ক্যাভেঞ্জারের গাড়ির খড়্‌খড়ানিতে রাত পোয়াল। দূরে কখনো স্টীমারের, কখনো তেলের কলের বাঁশি বাজে। বাসার সামনের রাস্তা দিয়ে একজন লোক মই কাঁধে জ্বরারি বটিকার বিজ্ঞাপন খাটিয়ে চলেছে; খালি-গাড়ির দুটো গোরু গাড়োয়ানের দুই হাতের প্রবল তাড়ার উত্তেজনায় গাড়ি নিয়ে দ্রুতবেগে ধাবমান; কল থেকে জল নেবার প্রতিযোগিতায় এক হিন্দুস্থানি মেয়ের সঙ্গে উড়িয়া ব্রাহ্মণের ঠেলাঠেলি বকাবকি জমেছে। বিপ্রদাস বারান্দায় ব'সে; গুড়্‌গুড়ির নলটা হাতে; মেজেতে পড়ে আছে না-পড়া খবরের কাগজ।

কুমু এসে বললে, "দাদা, 'না' ব'লো না।"

"আমার মতের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবি তুই? তোর শাসনে রাতকে দিন, না-কে হাঁ করতে হবে?"

"না, শোনো বলি;—আমার গয়না নিয়ে তোমার ভাবনা ঘুচুক।"

"সাধে তোকে বলি বুড়ী? তোর গয়না নিয়ে আমার ভাবনা ঘুচবে এমন কথা ভাবতে পারলি কোন্ বুদ্ধিতে?"

"সে জানি নে, কিন্তু তোমার এই ভাবনা আমার সয় না।"

"ভেবেই ভাবনা শেষ করতে হয় রে, তাকে ফাঁকি দিয়ে থামাতে গেলে বিপরীত ঘটে। একটু ধৈর্য ধর, একটা ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।"

বিপ্রদাস সে-মেলে চিঠিতে লিখলে টাকা পাঠাতে হলে কুমুর পণের সম্বলে হাত দিতে হয়; সে অসম্ভব।

যথাসময়ে উত্তর এল। সুবোধ লিখেছে, কুমুর পণের টাকা সে চায় না। সম্পত্তিতে তার নিজের অর্ধ অংশ বিক্রি করে যেন টাকা পাঠানো হয়। সঙ্গে সঙ্গেই পাওআর অফ অ্যাটর্নি পাঠিয়েছে।

এ-চিঠি বিপ্রদাসের বুকে বাণের মতো বিঁধল। এতবড়ো নিষ্ঠুর চিঠি সুবোধ লিখল কী করে? তখনই বুড়ো দেওয়ানজিকে ডেকে পাঠালে। জিজ্ঞাসা করলে, "ভূষণ রায়রা করিমহাটি তালুক পত্তনি নিতে চেয়েছিল না? কত পণ দেবে?"

দেওয়ান বললে, "বিশ হাজার পর্যন্ত উঠতে পারে।"

"ভূষণ রায়কে তলব দিয়ে পাঠাও। কথাবার্তা কইতে চাই।"

বিপ্রদাস বংশের বড়ো ছেলে। তার জন্মকালে তার পিতামহ এই তালুক স্বতন্ত্র ভাবে তাকেই দান করেছেন। ভূষণ রায় মস্ত মহাজন, বিশ-পঁচিশ লাখ টাকার তেজারতি। জন্মস্থান করিমহাটিতে। এই জন্যে অনেক দিন থেকে নিজের গ্রাম পত্তনি নেবার চেষ্টা। অর্থসংকটে মাঝে মাঝে বিপ্রদাস রাজি হয় আর কি, কিন্তু প্রজারা কেঁদে পড়ে। বলে, ওকে আমরা কিছুতেই জমিদার বলে মানতে পারব না। তাই প্রস্তাবটা বারে বারে যায় ফেঁসে। এবার বিপ্রদাস মন কঠিন করে বসল। ও নিশ্চয় জানে সুবোধের টাকার দাবি এইখানেই শেষ হবে না। মনে মনে বললে, আমার তালুকের এই সেলামির টাকা রইল সুবোধের জন্যে, তার পর দেখা যাবে।

দেওয়ান বিপ্রদাসের মুখের উপর জবাব দিতে সাহস করলে না।

গোপনে কুমুকে গিয়ে বললে, "দিদি, তোমার কথা বড়োবাবু শোনেন। বারণ করো তাঁকে, এটা অন্যায় হচ্ছে।"

বিপ্রদাসকে বাড়ির সকলেই ভালোবাসে। কারও জন্যে বড়োবাবু যে নিজের স্বত্ব নষ্ট করবে এ ওদের গায়ে সয় না।

বেলা হয়ে যায়। বিপ্রদাস ওই তালুকের কাগজ পত্র নিয়ে ঘাঁটছে। এখনও স্নানাহার হয় নি। কুমু বারে বারে তাকে ডেকে পাঠাচ্ছে। শুকনো মুখ করে এক সময়ে অন্দরে এল। যেন বাজে-ছোঁয়া পাতা-ঝলসানো গাছের মতো। কুমুর বুকে শেল বিঁধল।

স্নানাহার হয়ে গেলে পর বিপ্রদাস আলবোলার নল-হাতে খাটের বিছানায় পা ছড়িয়ে তাকিয়া ঠেসান দিয়ে বসল যখন, কুমু তার শিয়রের কাছে বসে ধীরে ধীরে তার চুলের মধ্যে হাত বুলোতে বুলোতে বললে, "দাদা, তোমার তালুক তুমি পত্তনি দিতে পারবে না।"

"তোকে নবাব সিরাজউদ্দৌলার ভূতে পেয়েছে নাকি? সব কথাতেই জুলুম?"

"না দাদা, কথা চাপা দিও না।"

তখন বিপ্রদাস আর থাকতে পারলে না, সোজা হয়ে উঠে বসে কুমুকে শিয়রের কাছ থেকে সরিয়ে সামনে বসালে। রুদ্ধ স্বরটাকে পরিষ্কার করবার জন্যে একটুখানি কেশে নিয়ে বললে, "সুবোধ কী লিখেছে জানিস? এই দেখ্।"

এই বলে জামার পকেট থেকে তার চিঠি বের করে কুমুর হাতে দিলে। কুমু সমস্তটা পড়ে দুই হাতে মুখ ঢেকে বললে, "মাগো, ছোড়দাদা এমন চিঠিও লিখতে পারলে?"

বিপ্রদাস বললে, "ওর নিজের সম্পত্তি আর আমার সম্পত্তিতে ও যখন আজ ভেদ করে দেখতে পেরেছে, তখন আমার তালুক আমি কি আর

আলাদা রাখতে পারি ? আজ ওর বাপ নেই, বিপদের সময়ে আমি ওকে দেব না তো কে দেবে ?”

এর উপর কুমু আর কথা কইতে পারলে না, নীরবে তার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। বিপ্রদাস তাকিয়ায় আবার ঠেস দিয়ে চোখ বুজে রইল।

অনেকক্ষণ দাদার পায়ে হাত বুলিয়ে অবশেষে কুমু বললে, “দাদা, মায়ের ধন তো এখন মায়েরই আছে, তাঁর সেই গয়না থাকতে তুমি কেন—”

বিপ্রদাস আবার চমকে উঠে বসে বললে, “কুমু, এটা তুই কিছুতে বুঝলি নে, তোর গয়না নিয়ে সুবোধ আজ যদি বিলেতে থিয়েটার-কনসার্ট দেখে বেড়াতে পারে তাহলে আমি কি তাকে কোনোদিন ক্ষমা করতে পারব,—না, সে কোনোদিন মুখ তুলে দাঁড়াতে পারবে ? তাকে এত শাস্তি কেন দিবি ?”

কুমু চুপ করে রইল, কোনো উপায় সে খুঁজে পেল না। তখন, অনেকবার যেমন ভেবেছে তেমনি করেই ভাবতে লাগল,—অসম্ভব কিছু ঘটে না কি ? আকাশের কোনো গ্রহ, কোনো নক্ষত্র এক মুহূর্তে সমস্ত বাধা সরিয়ে দিতে পারে না ? কিন্তু শুভলক্ষণ দেখা দিয়েছে যে, কিছুদিন থেকে বার বার তার বাঁ চোখ নাচছে। এর পূর্বে জীবনে আরও অনেকবার বাঁ চোখ নেচেছে, তা নিয়ে কিছু ভাববার দরকার হয় নি। এবারে লক্ষণটাকে মনে-মনে ধরে পড়ল। যেন তার প্রতিশ্রুতি তাকে রাখতেই হবে—শুভ-লক্ষণের সত্যভঙ্গ যেন না হয়।

১০

বাদলা করেছে। বিপ্রদাসের শরীরটা ভালো নেই। বালাপোশ মুড়ি দিয়ে আধশোওয়া অবস্থায় খবরের কাগজ পড়ছে। কুমুর আদরের

বিড়ালটা বালাপোশের একটা ফালতো অংশ দখল করে গোলাকার হয়ে নিদ্রামগ্ন। বিপ্রদাসের টেরিয়র কুকুরটা অগত্যা ওর স্পর্ধা সহ্য করে মনিবের পায়ের কাছে শুয়ে স্বপ্নে এক-এক বার গোঁ গোঁ করে উঠছে।

এমন সময়ে এল আর-এক ঘটক।

"নমস্কার।"

"কে তুমি।"

"আজ্ঞে, কর্তারা আমাকে খুবই চিনতেন, (মিথ্যে কথা) আপনারা তখন শিশু। আমার নাম নীলমণি ঘটক, ৺গঙ্গামণি ঘটকের পুত্র।"

"কী প্রয়োজন ?"

"ভালো পাত্রের সন্ধান আছে। আপনাদেরই ঘরের উপযুক্ত।"

বিপ্রদাস একটু উঠে বসল। ঘটক রাজাবাহাদুর মধুসূদন ঘোষালের নাম করলে।

বিপ্রদাস বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "ছেলে আছে না কি ?"

ঘটক জিভ কেটে বললে, "না তিনি বিবাহ করেন নি। প্রচুর ঐশ্বর্য। নিজে কাজ দেখা ছেড়ে দিয়েছেন, এখন সংসার করতে মন দিয়েছেন।"

বিপ্রদাস খানিকক্ষণ বসে গুড়গুড়িতে টান দিতে লাগল। তার পরে হঠাৎ এক সময়ে একটু যেন জোর করে বলে উঠল, "বয়সের মিল আছে এমন মেয়ে আমাদের ঘরে নেই।"

ঘটক ছাড়তে চায় না, বরের ঐশ্বর্যের যে পরিমাণ কত, আর গবর্নরের দরবারে তাঁর আনাগোনার পথ যে কত প্রশস্ত ইনিয়ে-বিনিয়ে তারই ব্যাখ্যা করতে লাগল।

বিপ্রদাস আবার স্তম্ভিত হয়ে বসে রইল। আবার অনাবশ্যক বেগের সঙ্গে বলে উঠল, "বয়সে মিলবে না।"

ঘটক বললে, "ভেবে দেখবেন, দু-চারদিন বাদে আর-এক বার আসব।"

বিপ্রদাস দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আবার শুয়ে পড়ল।

দাদার জন্যে গরম চা নিয়ে কুমু ঘরে ঢুকতে যাচ্ছিল। দরজার বাইরে গামছাশুদ্ধ একটা ভিজে জীর্ণ ছাতি ও কাদামাখা তালতলার চটি দেখে থেমে গেল। ওদের কথাবার্তা অনেকখানি কানে পৌঁছল। ঘটক তখন বলছে, "রাজাবাহাদুর এবার বছর না যেতে মহারাজা হবেন এটা একেবারে লাটসাহেবের নিজ মুখের কথা। তাই এতদিন পরে তাঁর ভাবনা ধরেছে, মহারানীর পদ এখন আর খালি রাখা চলবে না। আপনাদের গ্রহাচার্য কিনু ভটচাজ দূরসম্পর্কে আমার সম্বন্ধী, তার কাছে কন্যার কুষ্ঠি দেখা গেল—লক্ষণ ঠিকটি মিলেছে। এই নিয়ে শহরের মেয়ের কুষ্ঠি ঘাঁটতে বাকি রাখি নি—এমন কুষ্ঠি আর-একটিও হাতে পড়ল না। এই দেখে নেবেন, আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি, এ-সম্বন্ধ হয়েই গেছে, এ প্রজাপতির নির্বন্ধ।

ঠিক এই সময়ে কুমুর আবার বাঁ চোখ নাচল। শুভলক্ষণের কী অপূর্ব রহস্য! কিনু আচার্যি কতবার তার হাত দেখে বলেছে, রাজরানী হবে সে। করকোষ্ঠীর সেই পরিণত ফলটা আপনি যেচে আজ তার কাছে উপস্থিত। ওদের গ্রহাচার্য এই কদিন হল বার্ষিক আদায় করতে কলকাতায় এসেছিল; সে বলে গেছে, এবার আষাঢ় মাস থেকে বৃষরাশির রাজসম্মান, স্ত্রীলোক-ঘটিত অর্থলাভ, শত্রুনাশ; মন্দের মধ্যে পত্নীপীড়া, এমন কি হয়তো পত্নীবিয়োগ। বিপ্রদাসের বৃষরাশি। মাঝে মাঝে দৈহিক পীড়ার কথা আছে। তারও প্রমাণ হাতে হাতে, কাল রাত থেকে স্পষ্টই সর্দির লক্ষণ। আষাঢ় মাসও পড়ল—পত্নীর পীড়া ও মৃত্যুর কথাটা ভাববার আশু প্রয়োজন নেই, অতএব এবার সময় ভালো।

কুমু দাদার পাশে বসে বললে, "দাদা মাথা ধরেছে কি ?"

দাদা বললে, "না।"

"চা তো ঠাণ্ডা হয়ে যায় নি ? তোমার ঘরে লোক দেখে ঢুকতে পারলুম না।"

বিপ্রদাস কুমুর মুখের দিকে চেয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। ভাগ্যের নিষ্ঠুরতা সব চেয়ে অসহ্য, যখন সে সোনার রথ আনে যার চাকা অচল। দাদার মুখভাবে এই দ্বিধার বেদনা কুমুকে ব্যথা দিলে। দৈবের দানকে কেন দাদা এমন করে সন্দেহ করছেন ? বিবাহ-ব্যাপারে নিজের পছন্দ বলে যে একটা উপসর্গ আছে এ চিন্তা কখনো কুমুদিনীর মাথায় আসে নি। শিশুকাল থেকে পরে পরে সে তার চার দিদির বিয়ে দেখেছে। কুলীনের ঘরে বিয়ে—কুল ছাড়া আর বিশেষ কিছু পছন্দর বিষয় ছিল তাও নয়। ছেলেপুলে নিয়ে তবু তারা সংসার করছে, দিন কেটে যাচ্ছে। যখন দুঃখ পায় বিদ্রোহ করে না ; মনে ভাবতেও পারে না যে, কিছুতেই এটা ছাড়া আর কিছুই হতে পারত। মা কি ছেলে বেছে নেয় ? ছেলেকে মেনে নেয়। কুপুত্রও হয়, সুপুত্রও হয়। স্বামীও তেমনি। বিধাতা তো দোকান খোলেন নি। ভাগ্যের উপর বিচার চলবে কার ?

এতদিন পরে কুমুর মন্দভাগ্যের তেপান্তর মাঠ পেরিয়ে এল রাজপুত্র ছদ্মবেশে। রথচক্রের শব্দ কুমু তার হৃৎস্পন্দনের মধ্যে ওই যে শুনতে পাচ্ছে। বাইরের ছদ্মবেশটা সে যাচাই করে দেখতেই চায় না।

তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়েই সে পাঁজি খুলে দেখলে আজ মনোরথ-দ্বিতীয়া। বাড়িতে কর্মচারীদের মধ্যে যে-কয়জন ব্রাহ্মণ আছে সন্ধ্যাবেলা ডাকিয়ে তাদের ফলার করালে, দক্ষিণাও যথাসাধ্য কিছু দিলে। সবাই আশীর্বাদ করলে, রাজরানী হয়ে থাকো, ধনে-পুত্রে লক্ষ্মীলাভ হোক।

দ্বিতীয়বার বিপ্রদাসের বৈঠকখানায় ঘটকের আগমন। তুড়ি দিয়ে শিব শিব বলে বৃদ্ধ উচ্চস্বরে হাই তুললে। এবারে অসম্মতি দিয়ে কথাটাকে শেষ করে দিতে বিপ্রদাসের সাহস হল না। ভাবলে এতবড়ো দায়িত্ব নিই কী করে ? কেমন করে নিশ্চয় জানব কুমুর পক্ষে এ-সম্বন্ধ সব চেয়ে ভালো নয় ? পরশুদিন শেষকথা দেবে বলে ঘটককে বিদায় করে দিলে।

১১

সন্ধ্যার অন্ধকার মেঘের ছায়ায় বৃষ্টির জলে নিবিড়। কুমুর আসবাবপত্র বেশি কিছু নেই। এক পাশে ছোটো খাট, আলনায় গুটি দুয়েক পাকানো শাড়ি আর চাঁপা রঙের গামছা। কোণে কাঁঠাল-কাঠের সিন্দুক, তার মধ্যে ওর ব্যবহারের কাপড়। খাটের নিচে সবুজ রঙ-করা টিনের বাক্সে পান সাজবার সরঞ্জাম, আর একটা বাক্সে চুল বাঁধবার সামগ্রী। দেয়ালের খাঁজের মধ্যে কাঠের থাকে কিছু বই, দোয়াতকলম, চিঠির কাগজ, মায়ের হাতের পশমে-বোনা বাবার সর্বদা ব্যবহারের চটিজুতো-জোড়া; শোবার খাটের শিয়রে রাধাকৃষ্ণের যুগলরূপের পট। দেয়ালের কোণে ঠেসানো একটা এসরাজ।

ঘরে কুমু আলো জ্বালায় নি। কাঠের সিন্দুকের উপর বসে জানলার বাইরে চেয়ে আছে। সামনে ইঁটের কলেবরওআলা কলিকাতা, আদিম কালের বর্মকঠিন একটা অতিকায় জন্তুর মতো, জলধারার মধ্য দিয়ে ঝাপসা দেখা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে তার গায়ে গায়ে আলোকশিখার বিন্দু। কুমুর মন তখন ছিল অদৃষ্টনিরূপিত তার ভাবীলোকের মধ্যে। সেখানকার ঘরবাড়ি-লোকজন সবই তার আপন আদর্শে গড়া। তারই মাঝখানে নিজের সতীলক্ষ্মী-রূপের প্রতিষ্ঠা, কত ভক্তি, কত পূজা, কত সেবা। তার নিজের মায়ের পুণ্যচরিতে এক জায়গায় একটা গভীর ক্ষত

রয়ে গেছে। তিনি স্বামীর অপরাধে কিছুকালের জন্যেও ধৈর্য হারিয়েছিলেন। কুমু কখনো সে-ভুল করবে না।

বিপ্রদাসের পায়ের শব্দ শুনে কুমু চমকে উঠল। দাদাকে দেখে বললে, "আলো জ্বেলে দেব কি ?"

"না কুমু দরকার নেই" বলে বিপ্রদাস সিন্দুকে তার পাশে এসে বসল। কুমু তাড়াতাড়ি মেজের উপর নেমে বসে আস্তে আস্তে তার পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

বিপ্রদাস স্নিগ্ধস্বরে বললে, "বৈঠকখানায় লোক এসেছিল তাই তোকে ডেকে পাঠাই নি। এতক্ষণ একলা বসে ছিলি ?"

কুমু লজ্জিত হয়ে বললে, "না, ক্ষেমা পিসি অনেকক্ষণ ছিলেন।" কথাটা ফিরিয়ে দেবার জন্যে বললে, "বৈঠকখানায় কে এসেছিল, দাদা ?"

"সেই কথাই তোকে বলতে এসেছি। এ-বছর জষ্টি মাসে তুই আঠারো পেরিয়ে উনিশে পড়লি, তাই না ?"

"হাঁ দাদা, তাতে দোষ হয়েছে কী ?"

"দোষের কথা না। আজ নীলমণি ঘটক এসেছিল। লক্ষ্মী বোন, লজ্জা করিস নে। বাবা যখন ছিলেন, তোর বয়স দশ—বিয়ে প্রায় ঠিক হয়েছিল। হয়ে গেলে তোর মতের অপেক্ষা কেউ করত না। আজ তো আমি তা পারি নে। রাজা মধুসূদন ঘোষালের নাম নিশ্চয়ই শুনেছিস। বংশমর্যাদায় ওঁরা খাটো নন। কিন্তু বয়সে তোর সঙ্গে অনেক তফাত। আমি রাজি হতে পারি নি। এখন, তোর মুখের একটা কথা শুনলেই চুকিয়ে দিতে পারি। লজ্জা করিস নে কুমু।"

"না লজ্জা করব না।" বলে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। "যাঁর কথা বলছ নিশ্চয়ই তাঁর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ঠিক হয়েই গেছে।" এটা সেই ঘটকের কথার প্রতিধ্বনি—কখন কথাটা এর মনের গভীরতায় আটকা পড়ে গেছে।

বিপ্রদাস আশ্চর্য হয়ে বললে, "কেমন করে ঠিক হল ?"

কুমু চুপ করে রইল।

বিপ্রদাস তার মাথায় হাত বুলিয়ে বললে, "ছেলেমানুষি করিস নে, কুমু।"

কুমুদিনী বললে, "তুমি বুঝবে না দাদা, একটুও ছেলেমানুষি করছি নে।"

দাদার উপর তার অসীম ভক্তি। কিন্তু দাদা তো দৈববাণী মানে না, কুমুদিনী জানে এইখানেই দাদার দৃষ্টির ক্ষীণতা।

বিপ্রদাস বললে, "তুই তো তাঁকে দেখিস নি।"

"তা হোক আমি যে ঠিক জেনেছি।"

বিপ্রদাস ভালো করেই জানে এই জায়গাতেই ভাইবোনের মধ্যে অসীম প্রভেদ।

কুমুর চিত্তের এই অন্ধকার মহলে ওর উপর দাদার একটুও দখল নেই। তবে বিপ্রদাস আর একবার বললে, "দেখ্ কুমু, চির জীবনের কথা, ফস করে একটা খেয়ালের মাথায় পণ করে বসিস নে।"

কুমু ব্যাকুল হয়ে বললে, "খেয়াল নয় দাদা, খেয়াল নয়। আমি তোমার এই পা ছুঁয়ে বলছি আর কাউকে বিয়ে করতে পারব না।"

বিপ্রদাস চমকে উঠল। যেখানে কার্যকারণের যোগাযোগ নেই সেখানে তর্ক করবে কী নিয়ে ? অমাবস্যার সঙ্গে কুস্তি করা চলে না। বিপ্রদাস বুঝেছে কী একটা দৈব-সংকেত কুমু মনের মধ্যে বানিয়ে বসেছে। কথাটা সত্য। আজই সকালে ঠাকুরকে উদ্দেশ করে মনে মনে বলেছিল, এই বেজোড় সংখ্যার ফুলে জোড় মিলিয়ে সব-শেষে যেটি বাকি থাকে তাঁর রঙ যদি ঠাকুরের মতো নীল হয় তবে বুঝব তাঁর ইচ্ছা। সব-শেষের ফুলটি হল নীল অপরাজিতা।

অদূরে মল্লিকদের বাড়িতে সন্ধ্যারতির কাঁসরঘণ্টা বেজে উঠল। কুমু জোড়হাত করে প্রণাম করলে। বিপ্রদাস অনেকক্ষণ রইল বসে। ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে; বৃষ্টি ধারার বিরাম নেই।

১২

বিপ্রদাস আরও কয়েকবার কুমুদিনীকে বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করলে। কুমু কথার জবাব না দিয়ে মাথা নিচু করে আঁচল খুঁটতে লাগল।

বিয়ের প্রস্তাব পাকা, কেবল একটা বিষয় নিয়ে দুই পক্ষে কিছু কথা-চালাচালি হল। বিয়েটা হবে কোথায়? বিপ্রদাসের ইচ্ছে কলকাতার বাড়িতে। মধুসূদনের একান্ত জেদ নূরনগরে। বরপক্ষের ইচ্ছেই বাহাল রইল।

আয়োজনের জন্যে কিছু আগে থাকতেই নূরনগরে আসতে হল। বৈশেখ-জষ্টির খরার পরে আষাঢ়ের বৃষ্টি নামলে মাটি যেমন দেখতে দেখতে সবুজ হয়ে আসে, কুমুদিনীর অন্তরে-বাহিরে তেমনি একটা নূতন প্রাণের রং লাগল। আপন-মনগড়া মানুষের সঙ্গে মিলনের আনন্দ ওকে অহরহ পুলকিত করে রাখে। শরৎকালের সোনার আলো ওর সঙ্গে চোখে চোখে কথা কইছে, কোন্ এক অনাদিকালের মনের কথা। শোবার ঘরের সামনের বারান্দায় কুমু মুড়ি ছড়িয়ে দেয়, পাখিরা এসে এসে খায়; রুটির টুকরো রাখে, কাঠবিড়ালি চঞ্চল চোখে চারিদিকে চেয়ে দ্রুত ছুটে এসে লেজের উপর ভর দিয়ে দাঁড়ায়; সামনের দুই পায়ে রুটি তুলে ধরে কুটুর কুটুর করে খেতে থাকে। কুমুদিনী আড়াল থেকে আনন্দিত হয়ে বসে দেখে। বিশ্বের প্রতি ওর অন্তর আজ দাক্ষিণ্যে ভরা। বিকেলে গা ধোবার সময় খিড়কির পুকুরে গলা ডুবিয়ে চুপ করে বসে থাকে, জল যেন ওর সর্বাঙ্গে আলাপ করে। বিকেলের বাঁকা আলো পুকুরের পশ্চিম-

খারের বাতাবি-লেবুগাছের শাখার উপর দিয়ে এসে ঘন কালো জলের উপরে ঝিকযে সোনার রেখার মতো ঝিকিমিকি করতে থাকে ; ও চেয়ে চেয়ে দেখে, সেই আলোয় ছায়ায় ওর সমস্ত শরীরের উপর দিয়ে অনির্বচনীয় পুলকের কাঁপন বয়ে যায়। মধ্যাহ্নে বাড়ির ছাদের চিলেকোঠায় একলা গিয়ে বসে থাকে, পাশের জামগাছ থেকে ঘুঘুর ডাক কানে আসে। ওর যৌবন-মন্দিরে আজ যে-দেবতার বরণ হচ্ছে ভাবঘন রসের রূপটি তার, কৃষ্ণরাধিকার যুগলরূপের মাধুর্য তার সঙ্গে মিশেছে। বাড়ির ছাদের উপরে এসরাজটি নিয়ে ধীরে ধীরে বাজায়, ওর দাদার সেই ভূপালী সুরের গানটি :

> আজু মোর ঘরে আইল পিয়রওয়া
>
> রোমে রোমে হরখীলা।

রাত্রে বিছানায় বসে প্রণাম করে, সকালে উঠে বিছানায় বসে আবার প্রণাম করে। কাকে করে সেটা স্পষ্ট নয়,—একটি নিরবলম্ব ভক্তির স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাস।

কিন্তু মনগড়া প্রতিমার মন্দিরদ্বার চিরদিন তো রুদ্ধ থাকতে পারে না। কানাকানির নিশ্বাসের তাপে ও বেগে সে-মূর্তির সুষমা যখন ঘা খেতে আরম্ভ করে তখন দেবতার রূপ টিঁকবে কী করে। তখন ভক্তের বড়ো দুঃখের দিন।

একদিন তেলেনিপাড়ার বুড়ী তিনকড়ি এসে কুমুদিনীর মুখের সামনেই বলে বসল, “হ্যাঁ গা, আমাদের কুমুর কপালে কেমন রাজা জুটল ? ওই যে বেদেনীদের গান আছে,

> এক-যে ছিল কুকুর-চাটা শেয়ালকাঁটার বন,
>
> কেটে করলে সিংহাসন।

এ-ও সেই শেয়ালকাঁটা-বনের রাজা। ওই তো রজবপুরের আন্দো মুহুরির ছেলে মোধো। দেশে যে-বার আকাল, মগের মুলুক থেকে চাল আনিয়ে বেচে ওর টাকা। তবু বুড়ী মাকে শেষদিন পর্যন্ত রাঁধিয়ে রাঁধিয়ে হাড় কালি করিয়েছে।"

মেয়েরা উৎসুক হয়ে তিনকড়িকে ধরে বসে; বলে, "বরকে জানতে না কি?"

"জানতুম না? ওর মা যে আমাদের পাড়ার মেয়ে, পুরুত চক্রবর্তীদের ঘরের। (গলা নিচু করে) সত্যি কথা বলি বাছা, ভালো বামনের ঘরে ওদের বিয়ে চলে না। তা হোক গে, লক্ষ্মী তো জাতবিচার করেন না।"

পূর্বেই বলেছি কুমুদিনীর মন একালের ছাঁচে নয়। জাতকুলের পবিত্রতা তার কাছে খুব একটা বাস্তব জিনিস। মনটা তাই যতই সংকুচিত হয়ে ওঠে ততই যারা নিন্দে করে তাদের উপর রাগ করে; ঘর থেকে হঠাৎ কেঁদে উঠে ছুটে বাইরে চলে যায়। সবাই গা-টেপাটেপি করে বলে, "ইস, এখনই এত দরদ? এ যে দেখি দক্ষযজ্ঞের সতীকেও ছাড়িয়ে গেল।"

বিপ্রদাসের মনের গতি হাল-আমলের, তবু জাত-কুলের হীনতায় তাকে কাবু করে। তাই, গুজবটা চাপা দেবার অনেক চেষ্টা করলে। কিন্তু ছেঁড়া বালিশে চাপ দিলে তার তুলো যেমন আরও বেশি বেরিয়ে পড়ে, তেমনি হল।

এদিকে বুড়ো প্রজা দামোদর বিশ্বাসের কাছে খবর পাওয়া গেল যে, বহুপূর্বে ঘোষালেরা নুরনগরের পাশের গ্রাম শেয়াকুলির মালেক ছিল। এখন সেটা চাটুজ্যেদের দখলে। ঠাকুর-বিসর্জনের মামলায় কী করে সবসুদ্ধ ঘোষালদেরও বিসর্জন ঘটেছিল, কী কৌশলে কর্তাবাবুরা, শুধু দেশছাড়া নয়, তাদের সমাজছাড়া করেছিলেন, তার বিবরণ বলতে বলতে

দামোদরের মুখ ভক্তিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ঘোষালেরা এককালে ধনে মানে কুলে চাটুজ্যেদের সমকক্ষ ছিলেন এটা সুখবর, কিন্তু বিপ্রদাসের মনে ভয় লাগল যে, এই বিয়েটাও সেই পুরাতন মামলার একটা জের না কি?

১৩

অঘ্রান মাসে বিয়ে। পঁচিশে আশ্বিন লক্ষ্মীপূজো হয়ে গেল। হঠাৎ সাতাশে আশ্বিনে তাঁবু ও নানাপ্রকার সাজসরঞ্জাম নিয়ে ঘোষাল-কোম্পানির ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ওভারসিয়র এসে উপস্থিত, সঙ্গে একদল পশ্চিমি মজুর। ব্যাপারখানা কী? শেয়াকুলিতে ঘোষালদিঘির ধারে তাঁবু গেড়ে বর ও বরযাত্রীরা কিছুদিন আগে থাকতেই সেখানে এসে উঠবেন।

এ কী রকম কথা? বিপ্রদাস বললে, "তাঁরা যতজন খুশি আসুন, যতদিন খুশি থাকুন, আমরাই বন্দোবস্ত করে দেব। তাঁবুর দরকার কী? আমাদের স্বতন্ত্র বাড়ি আছে, সেটা খালি করে দিচ্ছি।"

ওভারসিয়র বললে, "রাজাবাহাদুরের হুকুম। দিঘির চারিধারের বনজঙ্গলও সাফ করে দিতে বলেছেন,—আপনি জমিদার, অনুমতি চাই।"

বিপ্রদাস মুখ লাল করে বললে, "এটা কি উচিত হচ্ছে? জঙ্গল তো আমরাই সাফ করে দিতে পারি।"

ওভারসিয়র বিনীতভাবে উত্তর করলে, "ওইখানেই রাজাবাহাদুরের পূর্বপুরুষের ভিটেবাড়ি, তাই শখ হয়েছে নিজেই ওটা পরিষ্কার করে নেবেন।"

কথাটা নিতান্ত অসংগত নয়, কিন্তু আত্মীয়স্বজনেরা খুঁত খুঁত করতে লাগল। প্রজারা বলে, এটা আমাদের কর্তাবাবুদের উপর টেক্কা দেবার চেষ্টা। হঠাৎ তবিল ফেঁপে উঠেছে, সেটা ঢাকা দিতে পারছে না; সেটাকে জয়ঢাক করে তোলবার জন্তেই না এই কাণ্ড? সাবেক আমল

হলে বরসুদ্ধ বরসজ্জা বৈতরণী পার করতে দেরি হত না। ছোটোবাবু থাকলে তিনিও সইতেন না, দেখা যেত ওই বাবুগুলো আর তাঁবুগুলো থাকত কোথায়।

প্রজারা এসে বিপ্রদাসকে বললে, "হুজুর ওদের কাছে হটতে পারব না। যা খরচ লাগে আমরাই দেব।"

ছয়-আনার কর্তা নবগোপাল এসে বললে, "বংশের অমর্যাদা সওয়া যায় না। একদিন আমাদের কর্তারা ওই ঘোষালদের হাড়ে হাড়ে ঠকাঠকি লাগিয়েছেন, আজ তারা আমাদেরই এলাকার উপর চড়াও হয়ে টাকার ঝলক মারতে এসেছে। ভয় নেই দাদা, খরচ যা লাগে আমরাও আছি। বিষয় ভাগ হোক বংশের মান তো ভাগ হয়ে যায় নি।"

এই বলে নবগোপালই ঠেলেঠুলে কর্মকর্তা হয়ে বসল।

বিপ্রদাস কয়দিন কুমুর কাছে যেতে পারে নি। তার মুখের দিকে তাকাবে কী করে? কুমুর কাছে বরপক্ষের স্পর্ধার কথা কেউ যে গলা খাটো করে বলবে সমাজে সে-দয়া বা ভদ্রতা নেই। তারই কাছে সবাই বাড়িয়ে-বাড়িয়ে বলে। মেয়েদের রাগ তারই 'পরে। ওরই জন্যে পূর্বপুরুষের মাথা যে হেঁট হল। রাজরানী হতে চলেছেন! কীবে রাজার ছিরি!

জাতকুলের কথাটাকে কুমু তার ভক্তি দিয়ে চাপা দিয়েছিল। কিন্তু ধনের বড়াই করে শ্বশুরকুলকে খাটো করার নীচতা দেখে তার মন বিষাদে ভরে উঠল। কেবলই লোকের কাছ থেকে সে পালিয়ে বেড়ায়। ঘোষালদের লজ্জায় আজ যে ওরই লজ্জা। দাদার মুখ থেকে কিছু শোনবার জন্যে মনটা ছটফট করছে। কিন্তু দাদার দেখা নেই, অন্দর-মহলে খেতেও আসে না।

একদিন বিপ্রদাস অন্তঃপুরের বাগানে ভিয়েনঘরের জন্যে চালা বাঁধবার জায়গা ঠিক করতে গিয়ে হঠাৎ খিড়কির পুকুরের ঘাটে দেখে কুমু নিচের পৈঁঠের উপর বসে মাথা হেঁট করে জলের দিকে তাকিয়ে আছে। দাদাকে দেখে তাড়াতাড়ি উপরে উঠে এল। এসেই রুদ্ধস্বরে বললে, "দাদা, কিছুই বুঝতে পারছি নে।" বলেই মুখে কাপড় দিয়ে কেঁদে উঠল।

দাদা ধীরে ধীরে পিঠে হাত বুলিয়ে বললে, "লোকের কথায় কান দিস নে বোন।"

"কিন্তু ওঁরা এ-সব কী করছেন? এতে কি তোমাদের মান থাকবে?"

"ওদের দিকটাও ভেবে দেখিস। পূর্বপুরুষের জন্মস্থানে আসছে, ধুমধাম করবে না? বিয়ের ব্যাপার থেকে এটাকে স্বতন্ত্র করে দেখিস।"

কুমু চুপ করে রইল। বিপ্রদাস থাকতে পারলে না, মরিয়া হয়ে বললে, "তোর মনে যদি একটুও খটকা থাকে বিয়ে এখনও ভেঙে দিতে পারি।"

কুমুদিনী সবেগে মাথা নেড়ে বললে, "ছি ছি, সে কি হয়?"

অন্তর্যামীর সামনে সত্যগ্রন্থিতে তো গাঁঠ পড়ে গেছে। বাকি যেটুকু সে তো বাইরের।

বিপ্রদাসের একেলে মন এতটা নিষ্ঠায় অধৈর্য হয়ে ওঠে। সে বললে, "দুই পক্ষের সততায় তবেই বিবাহ-বন্ধন সত্য। সুরে-বাঁধা এসরাজের কোনো মানেই থাকে না যদি বাজাবার হাতটা হয় বেসুরো। পুরাণে দেখ না, যেমন সীতা তেমনি রাম, যেমন মহাদেব তেমনি সতী, অরুন্ধতী যেমন বশিষ্ঠও তেমনি। হাল-আমলের বাবুদের নিজেদের মধ্যে নেই পুণ্য তাই একতরফা সতীত্ব প্রচার করেন। তাঁদের তরফে তেল জোটে না সলতেকে বলেন জ্বলতে—শুকনো প্রাণে জ্বলতে জ্বলতেই ওরা গেল ছাই হয়ে।"

কুমুকে বলা মিথ্যে। এখন থেকে ও মনে মনে জোরের সঙ্গে জপতে লাগল, তিনি ভালোই হন, মন্দই হন তিনি আমার পরম গতি।

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনা সুখেষু বিগতস্পৃহঃ
বীতরাগভয়ক্রোধঃ—

শুধু যতিধর্মের নয়, সতীধর্মেরও এই লক্ষণ। সে ধর্ম সুখদুঃখের অতীত,—তাতে ক্রোধ নেই, ভয় নেই। আর অনুরাগ? তারই বা অত্যাবশ্যকতা কিসের। অনুরাগে চাওয়া-পাওয়ার হিসেব থাকে, ভক্তি তারও বড়ো। তাতে আবেদন নেই নিবেদন আছে। সতীধর্ম নির্ব্যক্তিক, যাকে ইংরেজিতে বলে ইম্পার্সোনাল। মধুসূদন-ব্যক্তিটিতে দোষ থাকতে পারে, কিন্তু স্বামী নামক ভাব পদার্থটি নির্বিকার নিরঞ্জন। সেই ব্যক্তিকতাহীন ধ্যানরূপের কাছে কুমুদিনী একমনা হয়ে নিজেকে সমর্পণ করে দিলে।

১৪

ঘোষালদিঘির ধারে জঙ্গল সাফ হয়ে গেল,—চেনা যায় না। জমি নিখুঁতভাবে সমতল, মাঝে মাঝে সুরকি দিয়ে রাঙানো রাস্তা, রাস্তার ধারে ধারে আলো দেবার থাম। দিঘির পানা সব তোলা হয়েছে। ঘাটের কাছে তকতকে নতুন বিলিতি পাল-খেলাবার দুটি নৌকা; তাদের একটির গায়ে লেখা "মধুমতী", আর-একটির গায়ে "মধুকরী"। যে-তাঁবুতে রাজা-বাহাদুর স্বয়ং থাকবেন তার সামনে ফ্রেমে হলদে বনাতের উপর লাল রেশমে বোনা "মধুচক্র"। একটা তাঁবু অন্তঃপুরের, সেখান থেকে জল পর্যন্ত চাটাই দিয়ে ঘেরা ঘাট। ঘাটের উপরেই মস্ত নিমগাছের গায়ে কাঠের ফলকে লেখা "মধুসাগর"। খানিকটা জমিতে নানা আকারের চানকায় সূর্যমুখী

রজনীগন্ধা, গাঁদা দোপাটি, ক্যানা ও পাতাবাহার, কাঠের চৌকো বাক্সে নানা রঙের বিলিতি ফুল। মাঝে একটি ছোটো বাঁধানো জলাশয়, তারই মধ্যে লোহার ঢালাই-করা নগ্ন স্ত্রীমূর্তি, মুখে শাঁখ তুলে ধরেছে, তার থেকে ফোয়ারার জল বেরোবে। এই জায়গাটার নাম দেওয়া হয়েছে "মধুকুঞ্জ"। প্রবেশপথে কারুকাজকরা লোহার গেট, উপরে নিশান উড়ছে—নিশানে লেখা "মধুপুরী"। চারদিকেই "মধু" নামের ছাপ। নানা রঙের কাপড়ে কানাতে চাঁদোয়ায় নিশানে রঙিন ফুলে চীনালণ্ঠনে হঠাৎ-তৈরি এই মায়াপুরী দেখবার জন্যে দূর থেকে দলে দলে লোক আসতে লাগল। এদিকে ঝকঝকে চাপরাস-ঝোলানো হলদের উপর লালপাড় দেওয়া পাগড়ি-বাঁধা, জরির ফিতে-দেওয়া লাল বনাতের উর্দিপরা চাপরাসির দল বিলিতি জুতো মস্‌মসিয়ে বেড়ায়, সন্ধ্যাবেলায় বন্দুকে ফাঁকা আওয়াজ করে, দিনরাত প্রহরে প্রহরে ঘণ্টা বাজায়, তাদের কারও কারও চামড়ার কোমরবন্ধে ঝোলানো বিলিতি তলোয়ারটা জমিদারের মাটিকে পায়ে পায়ে খোঁচা দিতে থাকে। চাটুজ্যেদের সাবেক কালের জীর্ণসাজপরা ববকন্দাজেরা লজ্জায় ঘর হতে বার হতে চায় না। কাণ্ড দেখে চাটুজ্যে-পরিবারের গায়ের জ্বালা ধরল। নূরনগরের পাঁজরটার মধ্যে বিঁধিয়ে দিয়ে শেলদণ্ডের উপর আজ ঘোষালদের জয়পতাকা উড়েছে।

শুভপরিণয়ের এই সূচনা।

১৫

বিপ্রদাস নবগোপালকে ডেকে বললে, "নবু, আড়ম্বরে পাল্লা দেবার চেষ্টা,—ওটা ইতরের কাজ।"

নবগোপাল বললে, "চতুর্মুখ তাঁর পা ঝাড়া দিয়েই বেশি মানুষ গড়েছেন; চারটে মুখ কেবল বড়ো বড়ো কথা বলবার জন্যেই। সাড়ে

পনেরো আনা লোক যে ইতর, তাদের কাছে সম্মান রাখতে হলে ইতরের রাস্তাই ধরতে হয়।"

বিপ্রদাস বললে, "তাতেও তুমি পেরে উঠবে না। তার চেয়ে সাত্ত্বিকভাবে কাজ করি, সে দেখাবে ভালো। উপযুক্ত ব্রাহ্মণপণ্ডিত আনিয়ে আমাদের সামবেদের মতে বিশুদ্ধভাবে অনুষ্ঠান পালন করব। ওরা রাজা হয়েছে করুক আড়ম্বর; আমরা ব্রাহ্মণ, পুণ্যকর্ম্ম আমাদের।"

নবগোপাল বললে, "দাদা, পাঁজি ভুলেছ, এটা সত্যযুগ নয়। জলের নৌকো চালাতে চাও পাঁকের উপর দিয়ে! তোমার প্রজারা আছে,—তিনু সরকার আছে তোমার তালুকদার,—ভাদু পরামানিক, কমরদ্দি বিশ্বেস, পাঁচু মণ্ডল,—এরা কি তোমার ওই কাঁচকলাভাতে হবিষ্যি-করা বামনাইয়ের এক অক্ষর মানে বুঝবে? এরা কি যাজ্ঞবল্ক্যের প্রপৌত্র? এদের যে বুক ফেটে যাবে। তুমি চুপ করে থাকো, তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না।"

নবগোপাল প্রজাদের সঙ্গে মিলে উঠে-পড়ে লাগল। সবাই বুক ঠুকে বললে, টাকার জন্যে ভাবনা কী? আমলা ফয়লা পাইক বরকন্দাজ সবারই গায়ে চড়ল নতুন লাল বনাতের চাদর, রঙিন ধুতি। সালুতে-মোড়া ঝালর-ঝোলানো নিশেন-ওড়ানো এক নহবতখানা উঠল, সাত ক্রোশ তফাত থেকে তার চুড়ো দেখা যায়। দুই শরিকে মিলে তাদের চার-চার হাতি বের করলে, সাজ চড়ল তাদের পিঠে, যখন-তখন বিনা কারণে ঘোষালদিঘির সামনের রাস্তায় শুঁড় দুলিয়ে দুলিয়ে তারা টহলিয়ে বেড়ায়, গলায় ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজতে থাকে। আর যাই হোক, পাটের বস্তা থেকে হাতি বের হয় না, এই বলে সকলেই দুই পা চাপড়ে হো হো করে হেসে নিলে।

অঘ্রানের সাতাশে পড়েছে বিয়ের দিন; এখনও দিনদশেক বাকি। এমন সময় লোকমুখে জানা গেল, রাজা আসছে দলবল নিয়ে। ভাবনা পড়ে গেল, কর্তব্য কী। মধুসূদন এদের কাছে কোনো খবর দেয় নি। বুঝি মনে করেছে ভদ্রতা সাধারণ লোকের, অভদ্রতাই রাজোচিত। এমন অবস্থায় নিজেরা গায়ে পড়ে স্টেশন থেকে ওদের এগিয়ে আনতে যাওয়া কি সংগত হবে? খবর না-দেওয়ার উচিত জবাব হচ্ছে খবর না-নেওয়া।

সবই সত্য, কিন্তু যুক্তির দ্বারা সংসারের দুঃখ ঠেকানো যায় না। কুমুর প্রতি বিপ্রদাসের গভীর স্নেহ; পাছে তাকে কিছুতেই আঘাত করে এ-কথাটা সকল তর্ক ছাড়িয়ে যায়। মেয়েদের পীড়ন করা এতই সহজ; তাদের মর্মস্থান চারদিকেই অনাবৃত। জবরদস্তের হাতেই সমাজ চাবুক জুগিয়েছে; আর যারা বর্মহীন তাদের স্পর্শকাতর পিঠের দিকে কোনো বিধিবিধান নজর করে না। এমন অবস্থায় স্নেহের ধনকে রোষ-বিদ্বেষ-ঈর্ষার তুফানে ভাসিয়ে দিয়ে নিজের অভিমান বাঁচাবার চেষ্টা করা কাপুরুষতা, বিপ্রদাসের মনের এই ভাব।

বিপ্রদাস কাউকে না-জানিয়ে ঘোড়ায় চড়ে গেল স্টেশনে। গাড়ি এসে পৌঁছল, তখন বেলা পাঁচটা। সেলুন-গাড়ি থেকে রাজা নামল দল বল নিয়ে। বিপ্রদাসকে দেখে শুষ্ক সংক্ষিপ্ত নমস্কার করে বললে, "এ কী, আপনি কেন কষ্ট করে?"

বিপ্রদাস। বিলক্ষণ! এই প্রথম আসা আমার দেশে, অভ্যর্থনা করে নেব না?

রাজা। ভুল করছেন। আপনার দেশে এখনও আসি নি। সে হবে বিয়ের দিনে।

বিপ্রদাস কথাটার মানে বুঝতে পারলে না। স্টেশনে ভিড়ের

মধ্যে তর্ক করবার জায়গা নয়—তাই কেবল বললে, "ঘাটে বজরা তৈরি।"

রাজা বললে, "দরকার হবে না, আমাদের স্টীমলঞ্চ এসেছে।"

বিপ্রদাস বুঝলে সুবিধে নয়। তবু আর-একবার বললে, "খাওয়া-দাওয়ার জিনিস-পত্র, রসুইয়ের নৌকো সমস্তই প্রস্তুত।"

"কেন এত উৎপাত করলেন! কিছুই দরকার হবে না। দেখুন, একটা কথা মনে রাখবেন, এসেছি আমার পূর্বপুরুষদের জন্মভূমিতে—আপনাদের দেশে না। বিয়ের দিনে সেখানে যাবার কথা।"

বিপ্রদাস বুঝলে কিছুতেই নরম হবার আশা নেই। বুকের ভিতরটা দমে গেল। স্টেশনের বসবার ঘরে কেদারায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। শীতের সন্ধ্যা, অন্ধকার হয়ে এসেছে। উত্তর থেকে গাড়ি আসবার জন্যে ঘণ্টা পড়ল, স্টেশনে আলো জ্বলল,—লাগাম ছেড়ে ঘোড়াকে নিজের মরজিমতো চলতে দিয়ে বিপ্রদাস যখন বাড়ি ফিরলে তখন যথেষ্ট রাত। কোথায় গিয়েছিল, কী ঘটেছিল, কাউকে কিছুই বললে না।

সেইদিন রাত্রে ওর ঠাণ্ডা লেগে কাশি আরম্ভ হল। ক্রমেই চলল বেড়ে। উপেক্ষা করতে গিয়ে ব্যামোটাকে আরও উসকে তুললে। শেষ-কালে কুমু ওকে অনেক ধরে করে এনে বিছানায় শোওয়ায়। অনুষ্ঠানের সমস্ত ভারই পড়ল নবগোপালের উপর।

১৬

দু-দিন পরেই নবগোপাল এসে বললে, "কী করি একটা পরামর্শ দাও।"

বিপ্রদাস ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "কেন? কী হয়েছে?"

"সঙ্গে গোটাকতক সাহেব,—দালাল হবে, কিংবা মদের দোকানের বিলিতি শুঁড়ি, কাল পীরপুরের চরের থেকে কিছু না হবে তো দু-শ

কাদাখোঁচা পাখি মেরে নিয়ে উপস্থিত। আজ চলেছে চন্দনদহের বিলে। এই শীতের সময় সেখানে হাঁসের মরসুম—রাক্ষুসে ওজনের জীবহত্যা হবে,—অহিরাবণ মহীরাবণ হিড়িম্বা ঘটোৎকচ ইস্তিক কুম্ভকর্ণের পর্যন্ত পিণ্ডি দেবার উপযুক্ত,—প্রেতলোকে দশমুণ্ড রাবণের চোয়াল ধরে যাবার মতো।"

বিপ্রদাস স্তম্ভিত হয়ে রইল, কিছু বললে না।

নবগোপাল বললে, "তোমারই হুকুম ওই বিলে কেউ শিকার করতে পাবে না। সেবার জেলার ম্যাজিস্ট্রেটকে পর্যন্ত ঠেকিয়েছিলে—আমরা তো ভয় করেছিলুম তোমাকেও পাছে সে রাজহাঁস ভুল করে গুলি করে বসে। লোকটা ছিল ভদ্র, চলে গেল। কিন্তু এরা গো-মৃগ-দ্বিজ কাউকে মানবার মতো মানুষ নয়। তবু যদি বল তো একবার না হয়—"

বিপ্রদাস ব্যস্ত হয়ে বললে, "না না, কিছু বোলো না।"

বিপ্রদাস বাঘ শিকারে জেলার মধ্যে সব-সেরা। কোনো একবার পাখি মেরে তার এমন ধিক্‌কার হয়েছিল যে, সেই অবধি নিজের এলেকায় পাখি মারা একেবারে বন্ধ করে দিয়েছে।

শিয়রের কাছে কুমু বসে বিপ্রদাসের মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল। নবগোপাল চলে গেলে সে মুখ শক্ত করে বললে, "দাদা, বারণ করে পাঠাও।"

"কী বারণ করব?"

"পাখি মারতে।"

"ওরা ভুল বুঝবে কুমু, সইবে না।"

"তা বুঝুক ভুল। মান-অপমান শুধু ওদের একলার নয়।"

বিপ্রদাস কুমুর মুখের দিকে চেয়ে মনে-মনে হাসলে। সে জানে

কঠিন নিষ্ঠার সঙ্গে কুমু মনে-মনে সতীধর্ম অনুশীলন করছে। ছায়েবানুগতাস্বচ্ছা। সামান্য পাখির প্রাণ নিয়ে কায়ার সঙ্গে ছায়ার পথভেদ ঘটবে না কি?

বিপ্রদাস স্নেহের স্বরে বললে, "রাগ করিস নে কুমু, আমিও একদিন পাখি মেরেছি। তখন অন্যায় বলে বুঝতেই পারি নি। এদেরও সেই দশা।"

অক্লান্ত উৎসাহের সঙ্গে চলল শিকার, পিকনিক, এবং সন্ধ্যেবেলায় ব্যাণ্ডের সংগীতসহযোগে ইংরেজ অভ্যাগতদের নাচ। বিকালে টেনিস; তা ছাড়া দিঘির নৌকোর 'পরে তিন-চার পর্দা তুলে দিয়ে বাজি রেখে পালের খেলা;—তাই দেখতে গ্রামের লোকেরা দিঘির পাড়ে দাঁড়িয়ে যায়। রাত্রে ডিনারের পরে চীৎকার চলে, "ফর হী ইজ এ জলি গুড ফেলো।" এই সব বিলাসের প্রধান নায়কনায়িকা সাহেব-মেম, তাতেই গাঁয়ের লোকের চমক লাগে। এরা যে সোলার টুপি মাথায় ছিপ ফেলে মাছ ধরে, সেও বড়ো অপরূপ দৃশ্য। অন্য পক্ষে লাঠিখেলা কুস্তি নৌকোবাচ যাত্রা শখের থিয়েটার এবং চারটে হাতির সমাবেশ এর কাছে লাগে কোথায়?

বিবাহের দুদিন আগে গায়ে-হলুদ। দামি গহনা থেকে আরম্ভ করে খেলার পুতুল পর্যন্ত সওগাত যা বরের বাসা থেকে এল তার ঘটা দেখে সকলে অবাক। তার বাহনই বা কত! চাটুজ্যেরা খুব দরাজ হাতেই তাদের বিদেয় করলে।

অবশেষে জনসাধারণকে খাওয়ানো নিয়ে বৈবাহিক কুরুক্ষেত্রের দ্রোণপর্ব শুরু হল।

সেদিন ঢোল পিটিয়ে সর্বসাধারণের নিমন্ত্রণ মধুসাগরের তীরে মধুপুরীতে। রবাহূত অনাহূত কারও বাদ নেই। নবগোপাল রেগে

আগুন। এ কী আস্পর্ধা! আমরা হলুম জমিদার, এর মধ্যে উনি ওঁর মধুপুরী খাড়া করেন কোথা থেকে?

এদিকে ভোজের আয়োজনটা খুব ব্যাপকরূপেই সকলের কাছে প্রকাশমান হয়ে উঠল। সামান্য ফলার নয়। মাছ দই ক্ষীর সন্দেশ ঘি ময়দা চিনি খুব শোরগোল করে আমদানি। গাছতলায় মস্ত-মস্ত উনন পাতা; রান্নার জন্যে নানা আয়তনের হাঁড়ি হাঁড়া মালসা কলসী জালা; সারবন্দি গোরুর গাড়িতে এল আলু বেগুন কাঁচকলা শাকসবজি। আহারটা হবে সন্ধ্যের সময় বাঁধা রোশনাইয়ের আলোয়।

এদিকে চাটুজ্যেদের বাড়িতে মধ্যাহ্নভোজন। দলে দলে প্রজারা মিলে নিজেরাই আয়োজন করেছে। হিন্দুদের মুসলমানদের স্বতন্ত্র জায়গা। মুসলমান প্রজার সংখ্যাই বেশি—রাত না পোয়াতেই তারা নিজেরাই রান্না চড়িয়েছে। আহারের উপকরণ যত না হোক, ঘন ঘন, চাটুজ্যেদের জয়ধ্বনি উঠছে তার চতুর্গুণ। স্বয়ং নবগোপালবাবু বেলা প্রায় পাঁচটা পর্যন্ত অভুক্ত অবস্থায় বসে থেকে সকলকে খাওয়ালেন। তার পরে হল কাঙালিবিদায়। মাতব্বর প্রজারা নিজেরাই দানবিতরণের ব্যবস্থা করলে। কলধ্বনিতে জয়ধ্বনিতে বাতাসে চলল সমুদ্রমন্থন।

মধুপুরীতে সমস্তদিন রান্না বসেছে। গন্ধে বহুদূর পর্যন্ত আমোদিত। খুরি ভাঁড় কলাপাতা হয়েছে পর্বতপ্রমাণ। তরকারি ও মাছকোটার আবর্জনা নিয়ে কাকেদের কলরবের বিরাম নেই—রাজ্যের কুকুরগুলোও পরস্পর কামড়াকামড়ি চেঁচামেচি বাধিয়ে দিয়েছে। সময় হয়ে এল, রোশনাই জ্বলেছে, মেটিয়াবুরুজের রোশনচৌকি ইমনকল্যাণ থেকে কেদারা পর্যন্ত বাজিয়ে চলল। অনুচরপরিচরেরা থেকে-থেকে উদ্বিগ্নমুখে রাজাবাহাদুরের কানের কাছে ফিস ফিস করে জানাচ্ছে এখনও খাবার লোক যথেষ্ট এল না। আজ হাটের দিন, ভিন্ন এলেকা থেকে যারা

হাট করতে এসেছে তাদের কেউ কেউ পাত-পাড়া দেখে বসে গেছে। কাঙাল-ভিক্ষুকও সামান্য কয়েকজন আছে।

মধুসূদন নির্জন তাঁবুর ভিতর ঢুকে মুখ অন্ধকার করে একটা চাপা হুংকার দিলে,—"হুঁ।"

ছোটো ভাই রাধু এসে বললে, "দাদা, আর কেন? চলো।"

"কোথায়?"

"ফিরে যাই কলকাতায়। এরা সব বদমাইশি করছে। এদের চেয়ে বড়ো বড়ো ঘরের পাত্রী তোমার কড়ে আঙুল নাড়ার অপেক্ষায় বসে। একবার তু করলেই হয়।"

মধুসূদন গর্জন করে উঠে বললে, "যা চলে।"

এক-শ বছর পূর্বে যেমন ঘটেছিল আজও তাই। এবারেও একপক্ষের আড়ম্বরের চুড়োটা অন্যপক্ষের চেয়ে অনেক উঁচু করেই গড়া হয়েছিল, অন্যপক্ষ তা রাস্তা পার হতে দিলে না। কিন্তু আসল হারজিত বাইরে থেকে দেখা যায় না। তার ক্ষেত্রটা লোকচক্ষুর অগোচরে।

চাটুজ্যেদের প্রজারা খুব হেসে নিলে। বিপ্রদাস রোগশয্যায়; তার কানে কিছুই পৌঁছল না।

১৭

বিয়ের দিনে, রাজার হুকুম, কনের বাড়ি যাবার পথে ধুমধাম একেবারেই বন্ধ। আলো জ্বলল না, বাজনা বাজল না, সঙ্গে কেবল নিজেদের পুরোহিত, আর দুই জন ভাট। পালকিতে করে নিঃশব্দে বিয়ে বাড়িতে বর এল, লোকে হঠাৎ বুঝতেই পারলে না। ওদিকে মধুপুরীর তাঁবুতে আলো জ্বালিয়ে ব্যাণ্ড বাজিয়ে বিপরীত হৈ হৈ শব্দে বরযাত্রীর দল আহারে আমোদে প্রবৃত্ত। নবগোপাল বুঝলে এটা হল পালটা জবাব।

এমন স্থলে কন্যাপক্ষ হাতে পায়ে ধরে বরপক্ষের সাধ্যসাধনা করে ;— মধুগোপাল তার কিছুই করলে না। একবার জিজ্ঞাসাও করলে না, বরযাত্রীদের হল কী।

কুমুদিনী সাজসজ্জা করে বিবাহ-আসরে যাবার আগে দাদাকে প্রণাম করতে এল ; তার সর্বশরীর কাঁপছে। বিপ্রদাসের তখন এক-শ পাঁচ ডিগ্রী জ্বর, বুকে পিঠে রাইসরষের পলস্তারা ; কুমুদিনী তার পায়ের উপর মাথা ঠেকিয়ে আর থাকতে পারলে না, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। ক্ষেমা পিসি মুখে হাত চাপা দিয়ে বললে, "ছি, ছি, অমন করে কাঁদতে নেই।"

বিপ্রদাস একটু উঠে বসে ওকে হাত ধরে পাশে বসিয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে খানিকক্ষণ চুপ করে রইল—দুই চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। ক্ষেমা পিসি বললে, "সময় হল যে।"

বিপ্রদাস কুমুর মাথায় হাত দিয়ে রুদ্ধকণ্ঠে বললে, "সর্বশুভদাতা কল্যাণ করুন।" বলেই ধপ করে বিছানায় শুয়ে পড়ল।

বিবাহের সমস্তক্ষণ কুমুর দু-চোখ দিয়ে কেবল জল পড়েছে। বরের হাতে যখন হাত দিলে সে-হাত ঠাণ্ডা হিম, আর থরথর করে কাঁপছে। শুভদৃষ্টির সময় সে কি স্বামীর মুখ দেখেছে ? হয়তো দেখে নি। এদের ব্যবহারে সবসুদ্ধ জড়িয়ে স্বামীর উপর ওর ভয় ধরে গেছে। পাখির মনে হচ্ছে তার জন্যে বাসা নেই, আছে ফাঁস।

মধুসূদন দেখতে কুশ্রী নয় কিন্তু বড়ো কঠিন। কালো মুখের মধ্যে যেটা প্রথমেই চোখে পড়ে সে হচ্ছে পাখির চঞ্চুর মতো মস্ত বড়ো বাঁকা নাক, ঠোঁটের সামনে পর্যন্ত ঝুঁকে পড়ে যেন পাহারা দিচ্ছে। প্রশস্ত গড়ানে কপাল ঘন ভ্রূর উপর বাধাপ্রাপ্ত স্রোতের মতো স্ফীত। সেই ভ্রূর ছায়াতলে সংকীর্ণ তির্যক চক্ষুর দৃষ্টি তীব্র। গোঁফদাড়ি কামানো,

ঠোঁট চাপা, চিবুক ভারি। কড়া চুল কাফ্রিদের মতো কোঁকড়া, মাথায় তেলো ঘেঁষে ছাঁটা। খুব আঁটসাঁট শরীর; যত বয়েস তার চেয়ে কম বোধ হয়, কেবল দুই রগের কাছে চুলে পাক ধরেছে। বেঁটে, মাথায় প্রায় কুমুদিনীর সমান। হাত দুটো রোমশ ও দেহের তুলনায় খাটো। সবসুদ্ধ মনে হয় মানুষটা একেবারে নিরেট; মাথা থেকে পা পর্যন্ত সর্বদাই কী একটা প্রতিজ্ঞা যেন গুলি পাকিয়ে আছে। যেন ভাগ্যদেবতার কামান থেকে নিক্ষিপ্ত হয়ে একাগ্রভাবে চলেছে একটা একগুঁয়ে গোলা। দেখলেই বোঝা যায় বাজে কথা বাজে বিষয় বাজে মানুষের প্রতি মন দেবার ওর একটুও অবকাশ নেই।

বিবাহটা এমন ভাবে হল যে, সকলেরই মনে খারাপ লাগল। বরপক্ষ-কন্যাপক্ষের প্রথম সংস্পর্শমাত্রই এমন একটা বেসুর ঝনঝনিয়ে উঠল যে, তার মধ্যে উৎসবের সংগীত কোথায় গেল তলিয়ে। থেকে-থেকে কুমুর মনের একটা প্রশ্ন অভিমানে বুক ঠেলে ঠেলে উঠছে, "ঠাকুর কি তবে আমাকে ভোলালেন?" সংশয়কে প্রাণপণে চাপা দেয়, রুদ্ধঘরের মধ্যে একলা বসে বারবার মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে; বলে, মন যেন দুর্বল না হয়। সব-চেয়ে কঠিন হয়েছে দাদার কাছে সংশয় লুকোনো।

মায়ের মৃত্যুর পর থেকে কুমুদিনীর সেবার 'পরেই বিপ্রদাসের একান্ত নির্ভর। কাপড়চোপড়, দিনখরচের টাকাকড়ি, বইয়ের আলমারি, ঘোড়ার দানা, বন্দুকের সম্মার্জন, কুকুরের সেবা, ক্যামেরার রক্ষণ, সংগীতযন্ত্রের পর্যবেক্ষণ, শোবার বসবার ঘরের পারিপাট্যসাধন,—সমস্ত কুমুর হাতে। এত বেশি অভ্যাস হয়ে এসেছে যে, প্রাত্যহিক ব্যবহারে কুমুর হাত কোথাও না থাকলে তার রোচে না। সেই দাদার রোগশয্যায় বিদায়ের আগে শেষ কয়দিন যে-সেবা করতে হয়েছে তার মধ্যে নিজের ভাবনার কোনো ছায়া না পড়ে এই তার দুঃসাধ্য চেষ্টা। কুমুর এসরাজের

হাত নিয়ে বিপ্রদাসের ভারি গর্ব। লাজুক কুমু সহজে বাজাতে চায় না। এই দুদিন সে আপনি যেচে দাদাকে কানাড়া-মালকোষের আলাপ শুনিয়েছে। সেই আলাপের মধ্যেই ছিল তার দেবতার স্তব, তার প্রার্থনা, তার আশঙ্কা, তার আত্মনিবেদন। বিপ্রদাস চোখ বুজে চুপ করে শোনে আর মাঝে মাঝে ফরমাশ করে—সিন্ধু, বেহাগ, ভৈরবী—যে-সব সুরে বিচ্ছেদ-বেদনার কান্না বাজে। সেই সুরের মধ্যে ভাইবোন দুজনেরই ব্যথা এক হয়ে মিশে যায়। মুখের কথায় দুজনে কিছুই বললে না; না দিলে পরস্পরকে সান্ত্বনা, না জানালে দুঃখ।

বিপ্রদাসের জ্বর কাশি বুকে ব্যথা সারল না,—বরং বেড়ে উঠছে। ডাক্তার বলছে ইনফ্লুয়েঞ্জা, হয়তো ন্যুমোনিয়ায় গিয়ে পৌঁছতে পারে, খুব সাবধান হওয়া চাই। কুমুর মনে উদ্বেগের সীমা নেই। কথা ছিল বাসি-বিয়ের কালরাত্রিটা এখানেই কাটিয়ে দিয়ে পরদিন কলকাতায় ফিরবে। কিন্তু শোনা গেল মধুসূদন হঠাৎ পণ করেছে, বিবাহের পরদিনে ওকে নিয়ে চলে যাবে। বুঝলে, এটা প্রথার জন্যে নয়, প্রয়োজনের জন্যে নয়, প্রেমের জন্যে নয়, শাসনের জন্যে। এমন অবস্থায় অনুগ্রহ দাবি করতে অভিমানিনীর মাথায় বজ্রাঘাত হয়। তবু কুমু মাথা হেঁট করে লজ্জা কাটিয়ে কম্পিতকণ্ঠে বিবাহের রাতে স্বামীর কাছে এইমাত্র প্রার্থনা করেছিল যে, আর দুটো দিন যেন তাকে বাপের বাড়িতে থাকতে দেওয়া হয়, দাদাকে একটু ভালো দেখে যেন সে যেতে পারে। মধুসূদন সংক্ষেপে বললে, "সমস্ত ঠিকঠাক হয়ে গেছে।" এমন বজ্রে-বাঁধা একপক্ষের ঠিকঠাক, তার মধ্যে কুমুর মর্মান্তিক বেদনারও এক তিল স্থান নেই। তার পর মধুসূদন ওকে রাত্রে কথা কওয়াতে চেষ্টা করেছে, ও একটিও জবাব দিল না—বিছানার প্রান্তে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে রইল।

যোগাযোগ

তখনও অন্ধকার, প্রথম পাখির দ্বিধাজড়িত কাকলি শোনবামাত্র ও বিছানা ছেড়ে চলে গেল।

বিপ্রদাস সমস্ত রাত ছটফট করেছে। সন্ধ্যার সময় জ্বর-গায়েই বিবাহসভায় যাবার জন্যে ওর ঝোঁক হল। ডাক্তার অনেক চেষ্টায় চেপে রেখে দিলে। ঘন ঘন লোক পাঠিয়ে সে খবর নিয়েছে। খবরগুলো যুদ্ধের সময়কার খবরের মতো, অধিকাংশই বানানো। বিপ্রদাস জিজ্ঞাসা করলে, "কখন বর এল ? বাজনাবাদ্যির আওয়াজ তো পাওয়া গেল না।"

সংবাদদাতা শিবু বললে, "আমাদের জামাই বড়ো বিবেচক—বাড়িতে অসুখ শুনেই সব থামিয়ে দিয়েছে—বরযাত্রদের পায়ের শব্দ শোনা যায় না, এমনি ঠাণ্ডা।"

"ওরে শিবু, খাবার জিনিস তো কুলিয়েছিল ? আমার ওই এক ভাবনা ছিল, এ তো কলকাতা নয় !"

"কুলোয় নি ? বলেন কী হুজুর ? কত ফেলা গেল। আরও অতগুলো লোককে খাওয়াবার মতো জিনিস বাকি আছে।"

"ওরা খুশি হয়েছে তো ?"

"একটি নালিশ কারও মুখে শোনা যায় নি। একেবারে টুঁ শব্দটি না। আরও তো এত এত বিয়ে দেখেছি, বরযাত্রের দাপাদাপিতে কন্যাকর্তার ভির্মি লাগে ! এরা এমনি চুপ, আছে কি না-আছে বোঝাই যায় না।"

বিপ্রদাস বললে, "ওরা কলকাতার লোক কি না, তাই ভদ্র ব্যবহার জানা আছে। ওরা বোঝে যে, যে-বাড়ি থেকে মেয়ে নেবে তাদের অপমানে নিজেদেরই অপমান।"

"আহা হুজুর যা বললেন এই কথাটি ওদের লোকজনদের আমি শুনিয়ে দেব। শুনলে ওরা খুশি হবে।"

কুমু কাল সন্ধ্যের সময়েই বুঝেছিল অসুখ বাড়বার মুখে। অথচ

সে যে দাদার সেবা করতে পারবে না এই দুঃখ সর্বক্ষণ তার বুকের মধ্যে ফাঁদে-পড়া পাখির মতো ছটফট করতে লাগল। তার হাতের সেবা যে তার দাদার কাছে ওষুধের চেয়ে বেশি।

স্নান করে ঠাকুরকে ফুল দিয়ে কুমু যখন দাদার ঘরে এল তখনও সূর্য ওঠে নি। কঠিন রোগের সঙ্গে অনেকক্ষণ লড়াই করে ক্ষণকাল ছুটি পাবার সময় যে অবসাদের বৈরাগ্য আসে সেই বৈরাগ্যে বিপ্রদাসের মন তখন শিথিল। জীবনের আসক্তি, সংসারের ভাবনা সব তার কাছে শস্যশূন্য মাঠের মতো ধূসরবর্ণ। সমস্ত রাত দরজা বন্ধ ছিল, ডাক্তার ভোরের বেলায় পুবদিকের জানালাটা খুলে দিয়েছে। অশথগাছের শিশির-ভেজা পাতার আড়ালে অরুণবর্ণ আকাশের আভা ধীরে ধীরে শুভ্র হয়ে আসছে,—অদূরবর্তী নদীতে মহাজনি নৌকোর বৃহৎ তালি-দেওয়া পালগুলি সেই আরক্তিম আকাশের গায়ে স্ফীত হয়ে উঠল। নহবতে করুণ সুরে রামকেলি বাজছে।

পাশে বসে কুমু নিজের দুই ঠাণ্ডা হাতের মধ্যে দাদার শুকনো গরম হাত তুলে নিলে। বিপ্রদাসের টেরিয়র কুকুর খাটের নিচে বিমর্ষ মনে চুপ করে শুয়ে ছিল। কুমু খাটে এসে বসতেই সে দাড়িয়ে উঠে দু-পা তার কোলের উপর রেখে লেজ নাড়তে নাড়তে করুণ চোখে ক্ষীণ আর্তস্বরে কী যেন প্রশ্ন করলে।

বিপ্রদাসের মনে ভিতরে-ভিতরে কী একটা চিন্তার ধারা চলছিল, তাই হঠাৎ এক সময়ে অসংলগ্নভাবে বলে উঠল, "দিদি, আসলে কিছুই নয়,—কে বড়ো কে ছোটো, কে উপরে কে নিচে, এ সমস্তই বানানো কথা। ফেনার মধ্যে বুদ্‌বুদ্‌গুলোর কোন্‌টার কোথায় স্থান তাতে কী আসে যায়। আপনার ভিতরে আপনি সহজ হয়ে থাকিস কিছুতেই তোকে মারবে না।"

"আমাকে আশীর্বাদ করো, দাদা, আমাকে আশীর্বাদ করো," বলে কুমু দু-হাত দিয়ে মুখ ঢেকে কান্না চাপা দিলে।

বিপ্রদাস বালিশে ঠেস দিয়ে একটু উঠে বসে কুমুর মুখ নামিয়ে ধরে তার মাথায় চুমো খেলে।

ডাক্তার ঘরে ঢুকে বললে, "আর নয়, কুমুদিদি, এখন ওঁর একটু শান্ত থাকা দরকার।"

কুমু রোগীর বালিশ একটু চেপে-চুপে ঠিক করে গায়ের উপর গরম কাপড়টা টেনে দিয়ে, পাশের টিপাইটার উপরকার বিশৃঙ্খলতা একটু সেরে নিয়ে দাদার কানের কাছে মৃদুস্বরে বললে, "সেরে গেলেই কলকাতায় যেয়ো দাদা, সেখানে তোমাকে দেখতে পাব।"

বিপ্রদাস বড়ো বড়ো দুই স্নিগ্ধ চোখ কুমুর মুখের উপর স্থির রেখে বললে, "কুমু পশ্চিমের মেঘ যায় পুবে, পুবের মেঘ যায় পশ্চিমে, এ-সব হাওয়ায় হয়। সংসারে সেই হাওয়া বইছে। মেঘের মতোই অমনি সহজে এটাকে মেনে নিস দিদি। এখন থেকে আমাদের কথা বেশি ভাবিস নে। যেখানে যাচ্ছিস সেখানে লক্ষ্মীর আসন তুই জুড়ে থাকিস—এই আমার সকল মনের আশীর্বাদ। তোর কাছে আমরা আর কিছুই চাই নে।"

দাদার পায়ের কাছে কুমু মাথা রেখে পড়ে রইল। "আজ থেকে আমার কাছে আর কিছুই চাবার নেই। এখানকার প্রতিদিনের জীবনযাত্রায় আমার কোনো হাতই থাকবে না"—এক মুহূর্তে এতবড়ো বিচ্ছেদের কথা মনে মেনে নেওয়া যায় না। ঝড়ে যখন নৌকাকে ডাঙা থেকে টেনে নিয়ে যায় তখন নোঙর যেমন করে মাটি আঁকড়ে থাকতে চায়, দাদার পায়ের কাছে কুমুর তেমনি এই শেষ ব্যগ্রতার বন্ধন। ডাক্তার আবার এসে ধীরে ধীরে বললে, "আর নয় দিদি।" বলে নিজের

অশ্রুসিক্ত চোখ মুছে ফেললে। ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে দরজার বাইরে যে-চৌকিটা ছিল তার উপর বসে পড়ে মুখে আঁচল দিয়ে কুমু নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল। হঠাৎ এক সময়ে মনে পড়ে গেল দাদার "বেসি" ঘোড়াকে নিজের হাতে খাইয়ে দিয়ে যাবে বলে কাল রাত্রে সে গুড়মাখা আটার রুটি তৈরি করে রেখেছিল। সইস আজ ভোরবেলায় তাকে খিড়কির বাগানে রেখে এসেছে। কুমু সেখানে গিয়ে দেখলে ঘোড়া আমড়া-গাছতলায় ঘাস খেয়ে বেড়াচ্ছে। দূর থেকে কুমুর পায়ের শব্দ শুনেই কান খাড়া করলে এবং তাকে দেখেই চিঁহিঁ চিঁহিঁ করে ডেকে উঠল। বাঁ হাত তার কাঁধের উপর রেখে ডান হাতে কুমু তার মুখের কাছে রুটি ধরে তাকে খাওয়াতে লাগল। সে খেতে খেতে তার বড়ো বড়ো কালো স্নিগ্ধ চোখে কুমুর মুখের দিকে কটাক্ষে চাইতে লাগল। খাওয়া হয়ে গেলে বেসির দুই চোখের মাঝখানকার প্রশস্ত কপালের উপর চুমো খেয়ে কুমু দৌড়ে চলে গেল।

১৮

বিপ্রদাস নিশ্চয় মনে করেছিল মধুসূদন এই কয়দিনের মধ্যে একবার এসে দেখা করে যাবে। তা যখন করলে না তখন ওর বুঝতে বাকি রইল না যে, দুই পরিবারের এই বিবাহের সম্বন্ধটাই এল পরস্পরের বিচ্ছেদের খড়্গ হয়ে। রোগের নিরতিশয় ক্লান্তিতে এ-কথাটাকেও সহজভাবে সে মেনে নিলে। ডাক্তারকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলে, "একটু এসরাজ বাজাতে পারি কি ?"

ডাক্তার বললে, "না, আজ থাক্।"

"তাহলে কুমুকে ডাকো, সে একটু বাজাক। আবার কবে তার বাজনা শুনতে পাব, কে জানে।"

ডাক্তার বললে, "আজ সকালে ন-টার গাড়িতে ওঁদের ছাড়তে হবে, নইলে সূর্যাস্তের আগে কলকাতায় পৌঁছতে পারবেন না। কুমুর তো আর সময় নেই।"

বিপ্রদাস নিশ্বাস ফেলে বললে, "না, এখানে ওর সময় ফুরোল। উনিশ বছর কাটতে পেরেছে, এখন এক ঘণ্টাও আর কাটবে না।"

বিদায়ের সময় স্বামীস্ত্রী জোড়ে প্রণাম করতে এল। মধুসূদন ভদ্রতা করে বললে, "তাই তো, আপনার শরীর তো ভালো দেখছি নে।"

বিপ্রদাস তার কোনো উত্তর না করে বললে, "ভগবান তোমাদের কল্যাণ করুন।"

"দাদা, নিজের শরীরের একটু যত্ন কোরো" বলে আর-একবার বিপ্রদাসের পায়ের কাছে পড়ে কুমু কাঁদতে লাগল।

হুলুধ্বনি শঙ্খধ্বনি ঢাক-কাঁসর-নহবতে একটা আওয়াজের সাইক্লোন ঝড় উঠল। ওরা গেল চলে।

পরস্পরের আঁচলে চাদরে বাঁধা ওরা যখন চলে যাচ্ছে সেই দৃশ্যটা আজ, কেন কী জানি, বিপ্রদাসের কাছে বীভৎস লাগল। প্রাচীন ইতিহাসে তৈমুর জঙ্গিস অসংখ্য মানুষের কঙ্কালস্তম্ভ রচনা করেছিল। কিন্তু ওই যে চাদরে-আঁচলের গ্রন্থি, ওর সৃষ্ট জীবন-মৃত্যুর জয়তোরণ যদি মাপা যায় তবে তার চূড়া কোন্ নরকে গিয়ে ঠেকবে! কিন্তু এ কেমনতরো ভাবনা আজ ওর মনে!

পূজার্চনায় বিপ্রদাসের কোনোদিন উৎসাহ ছিল না। তবু আজ হাত জোড় করে মনে-মনে প্রার্থনা করতে লাগল।

এক সময়ে চমকে উঠে বললে, "ডাক্তার, ডাকো তো দেওয়ানজিকে।"

বিপ্রদাসের হঠাৎ মনে পড়ে গেল, বিয়ে দিতে আসবার কিছুদিন আগে যখন সুবোধকে টাকা পাঠানো নিয়ে মন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন, হিসাবের

খাতাপত্র ঘেঁটে ক্লান্ত, বেলা এগারোটা,—এমন সময়ে অত্যন্ত বে-মেরামত গোছের একটা মানুষ, কিছু-কালের না-কামানো কণ্টকিত জীর্ণ মুখ, হাড়-বের-করা শির-বের-করা হাত, ময়লা একখানা চাদর, খাটো একখানা ধুতি, ছেঁড়া একজোড়া চটি-পরা, এসে উপস্থিত। নমস্কার করে বললে, "বড়োবাবু মনে পড়ে কি?"

বিপ্রদাস একটু লক্ষ্য করে বললে, "কী, বৈকুণ্ঠ নাকি?"

বিপ্রদাস বালককালে যে-ইস্কুলে পড়ত সেই ইস্কুলেরই সংলগ্ন একটা ঘরে বৈকুণ্ঠ ইস্কুলের বই খাতা কলম ছুরি ব্যাটবল লাঠিম আর তারই সঙ্গে মোড়কে-করা চীনাবাদাম বিক্রি করত। তার ঘরে বড়ো ছেলেদের আড্ডা ছিল—যতরকম অদ্ভুত অসম্ভব খোশগল্প করতে এর জুড়ি কেউ ছিল না।

বিপ্রদাস জিজ্ঞাসা করলে, "তোমার এমন দশা কেন?"

কয়েক বৎসর হল সম্পন্ন অবস্থার গৃহস্থের ঘরে মেয়ের বিয়ে দিয়েছে। তাদের পণের বিশেষ কোনো আবশ্যক ছিল না বলেই বরের পণও ছিল বেশি। বারো-শ টাকায় রফা হয়, তাছাড়া আশি ভরি সোনার গয়না। একমাত্র আদরের মেয়ে বলেই মরিয়া হয়ে সে রাজি হয়েছিল। একসঙ্গে সব টাকা সংগ্রহ করতে পারে নি, তাই মেয়েকে যন্ত্রণা দিয়ে দিয়ে ওরা বাপের রক্ত শুষেছে। সম্বল সবই ফুরোল তবু এখনও আড়াই-শ টাকা বাকি। এবারে মেয়েটির অপমানের শেষ নেই। অত্যন্ত অসহ্য হওয়াতেই বাপের বাড়ি পালিয়ে এসেছিল। তাতে করে জেলের কয়েদির জেলের নিয়ম ভঙ্গ করা হল, অপরাধ বেড়েই গেল। এখন ওই আড়াই-শ টাকা ফেলে দিয়ে মেয়েটাকে বাঁচাতে পারলে বাপ মরবার কথাটা ভাববার সময় পায়।

বিপ্রদাস ম্লান হাসি হাসলে। যথেষ্টপরিমাণে সাহায্য করবার কথা

সেদিন ভাববারও জো ছিল না। ক্ষণকালের জন্যে ইতস্তত করলে, তার পরে উঠে গিয়ে বাক্স থেকে থলি ঝেড়ে দশটি টাকার নোট এনে তার হাতে দিল। বললে, "আরও দু-চার জায়গা থেকে চেষ্টা দেখো, আমার আর সাধ্য নেই।"

বৈকুণ্ঠ সে-কথা একটুও বিশ্বাস করলে না। পা টেনে টেনে চলে গেল, চটিজুতোয় অত্যন্ত অপ্রসন্ন শব্দ।

সেদিনকার এই ব্যাপারটা ভুলেই গিয়েছিল, আজ হঠাৎ বিপ্রদাসের মনে পড়ল। দেওয়ানজিকে ডেকে হুকুম হল—বৈকুণ্ঠকে আজই আড়াই-শ টাকা পাঠানো চাই। দেওয়ানজি চুপ করে দাঁড়িয়ে মাথা চুলকোয়। জেদাজেদির মুখে খরচ করে বিবাহ তো চুকেছে, কিন্তু অনেকদিন ধরে তার হিসাব শোধ করতে হবে—এখন দিনের গতিকে আড়াই-শ টাকা যে মস্তবড়ো অঙ্ক।

দেওয়ানজির মুখের ভাব দেখে বিপ্রদাস আঙুল থেকে হীরের আংটি খুলে বললে, "ছোটোবাবুর নামে যে-টাকা ব্যাঙ্কে জমা রেখেছি, তার থেকে ওই আড়াই-শ টাকা নাও, তার বদলে আমার আংটি বন্ধক রইল। বৈকুণ্ঠকে টাকাটা যেন কুমুর নামে পাঠানো হয়।"

১৯

বিবাহের লঙ্কাকাণ্ডের সব-শেষ অধ্যায়টা এখনও বাকি।

সকালবেলায় কুশণ্ডিকা সেরে তবে বরকনে যাত্রা করবে এই ছিল কথা। নবগোপাল তারই সমস্ত উদ্‌যোগ ঠিক করে রেখেছে। এমন সময় বিপ্রদাসের ঘর থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এসে রাজাবাহাদুর বলে বসল—কুশণ্ডিকা হবে বরের ওখানে, মধুপুরীতে।

প্রস্তাবের ঔদ্ধত্যটা নবগোপালের কাছে অসহ্য লাগল। আর কেউ হলে আজ একটা ফৌজদারি বাধত। তবু ভাষার প্রাবল্যে নবগোপালের আপত্তি প্রায় লাঠিয়ালির কাছ পর্যন্ত এসে তবে থেমেছিল।

অন্তঃপুরে অপমানটা খুব বাজল। বহুদূর থেকে আত্মীয়-কুটুম সব এসেছে, তাদের মধ্যে ঘরশত্রুর অভাব নেই। সবার সামনে এই অত্যাচার। ক্ষেমা পিসি মুখ গোঁ করে বসে রইলেন। বরকনে যখন বিদায় নিতে এল তাঁর মুখ দিয়ে যেন আশীর্বাদ বেরোতে চাইল না। সবাই বললে এ-কাজটা কলকাতায় সেরে নিলে তো কারও কিছু বলবার কথা থাকত না। বাপের বাড়ির অপমানে কুমু একান্তই সংকুচিত হয়ে গেল,—মনে হতে লাগল সে-ই যেন অপরাধিনী তার সমস্ত পূর্বপুরুষদের কাছে। মনে-মনে তার ঠাকুরের প্রতি অভিমান করে বার বার জিজ্ঞাসা করতে লাগল, "আমি তোমার কাছে কী দোষ করেছি যে-জন্যে আমার এত শাস্তি! আমি তো তোমাকেই বিশ্বাস করে সমস্ত স্বীকার করে নিয়েছি।"

বরকনে গাড়িতে উঠল। কলকাতা থেকে মধুসূদন যে-ব্যাণ্ড এনেছিল তাই উচ্চৈঃস্বরে নাচের সুর লাগিয়ে দিলে। মস্ত একটা শামিয়ানার নিচে হোমের আয়োজন। ইংরেজ মেয়েপুরুষ অভ্যাগত কেউ বা গদিওআলা চৌকিতে বসে কেউ বা কাছে এসে ঝুঁকে পড়ে দেখতে লাগল। এরই মধ্যে তাদের জন্যে চা-বিস্কুটও এল। একটা টিপায়ের উপর মস্তবড়ো একটা ওয়েডিং কেকও সাজানো আছে। অনুষ্ঠান সারা হয়ে গেলে এরা এসে যখন কন্‌গ্র্যাচুলেট করতে লাগল, কুমু মুখ লাল করে মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইল। একজন মোটাগোছের প্রৌঢ়া ইংরেজ মেয়ে ওর বেনারসি শাড়ির আঁচল তুলে ধরে পর্যবেক্ষণ করে দেখলে; ওর হাতে খুব মোটা সোনার বাজুবন্ধ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতেও তার বিশেষ কৌতূহল বোধ হল। ইংরেজি ভাষায়

প্রশংসাও করলে। অনুষ্ঠান সম্বন্ধে মধুসূদনকে একদল বললে, "how interesting," আর একদল বললে, "isn't it?"

এই মধুসূদনকে কুমু তার দাদা আর অন্যান্য আত্মীয়দের সঙ্গে ব্যবহার করতে দেখেছে,—আজ তাকেই দেখলে ইংরেজ বন্ধুমহলে। ভদ্রতায় অতি গদ্‌গদভাবে অবনম্র, আর হাসির আপ্যায়নে মুখ নিয়তই বিকসিত। চাঁদের যেমন এক পিঠে আলো আর এক পিঠে চির-অন্ধকার, মধুসূদনের চরিত্রেও তাই। ইংরেজের অভিমুখে তার মাধুর্য পূর্ণচাঁদের আলোর মতোই যেমন উজ্জ্বল তেমনি স্নিগ্ধ। অন্য দিকটা দুর্গম, দুর্দৃশ্য এবং জমাট বরফের নিশ্চলতায় দুর্ভেদ্য।

সেলুন-গাড়িতে ইংরেজ বন্ধুদের নিয়ে মধুসূদন; অন্য রিজার্ভ-করা গাড়িতে মেয়েদের দলে কুমু। তারা কেউ বা ওর হাত তুলে টিপে দেখে, কেউ বা চিবুক তুলে মুখশ্রী বিশ্লেষণ করে; কেউ বা বলে ঢ্যাঙা, কেউ বা বলে রোগা। কেউ বা অতি ভালোমানুষের মতো জিজ্ঞাসা করে, "হাঁগা, গায়ে কী রং মাখ, বিলেত থেকে তোমার ভাই বুঝি কিছু পাঠিয়েছে?" সকলেই মীমাংসা করলে, চোখ বড়ো নয়, পায়ের মাপটা মেয়েমানুষের পক্ষে অধিক বড়ো। গায়ের প্রত্যেক গয়নাটি নেড়েচেড়ে বিচার করতে বসল,—সেকেলে গয়না, ওজনে ভারি, সোনা খাঁটি—কিন্তু কী ফ্যাশান, মরে যাই!

ওদের গাড়িতে স্টেশন-প্ল্যাটফর্মের উলটো দিকের জানলা খোলা ছিল সেই দিকে কুমু চেয়ে রইল, চেষ্টা করতে লাগল এদের কথা যাতে কানে না যায়। দেখতে পেলে একটা এক-পা-কাটা কুকুর তিন পায়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে মাটি শুঁকে বেড়াচ্ছে। আহা, কিছু খাবার যদি হাতের কাছে থাকত! কিছুই ছিল না। কুমু মনে-মনে ভাবতে লাগল, যে-একটি পা গিয়েছে তারই অভাবে ওর যা-কিছু সহজ ছিল তার সমস্তই হয়ে গেল কঠিন

এমন সময় কুমুর কানে গেল সেলুন-গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে একজন ভদ্রলোক বলছে, "দেখুন এই চাষির মেয়েকে আড়কাটি আসাম চা-বাগানে ভুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, পালিয়ে এসেছে ; গোয়ালন্দ পর্যন্ত টিকিটের টাকা আছে, ওর বাড়ি ডুমরাঁও, যদি সাহায্য করেন তো এই মেয়েটি বেঁচে যায়। সেলুন-গাড়ি থেকে একটা মস্ত তাড়ার আওয়াজ কুমু শুনতে পেলে। সে আর থাকতে পারলে না, তখনই ডানদিকের জানলা খুলে তার পুঁতিগাঁথা থলে উজাড় করে দশ টাকা মেয়েটির হাতে দিয়েই জানালা বন্ধ করে দিলে। দেখে এক জন মেয়ে বলে উঠল, "আমাদের বউয়ের দরাজ হাত দেখি।" আর-একজন বললে, "দরাজ নয় তো দরজা, লক্ষ্মীকে বিদায় করবার।" আর-এক জন বললে, "টাকা ওড়াতে শিখেছে, রাখতে শিখলে কাজে লাগত।" এটাকে ওরা দেমাক বলে ঠিক করলে,— বাবুরা যাকে এক পয়সা দিলে না, ইনি তাকে অমনি ঝনাত করে টাকা ফেলে দেন, এত কিসের গুমোর! ওদের মনে হল এও বুঝি সেই চাটুজ্যে-ঘোষালদের চিরকেলে রেষারেষির অঙ্গ।

এমন সময়ে ওদের মধ্যে একটি মোটাসোটা কালোকোলো মেয়ে, মস্ত ডাগর চোখ, স্নেহরসে ভরা মুখের ভাব, কুমুর সমবয়সী হবে, ওর কাছে এসে বসল। চুপি চুপি বললে, "মন কেমন করছে ভাই ? এদের কথায় কান দিয়ো না, দু-দিন এই রকম টেপাটেপি বলাবলি করবে, তার পরে কণ্ঠ থেকে বিষ নেমে গেলেই থেমে যাবে।" এই মেয়েটি কুমুর মেজো জা, নবীনের স্ত্রী। ওর নাম নিস্তারিণী, ওকে সবাই মোতির মা বলে ডাকে।

মোতির মা কথা তুললে, "যেদিন নুরনগরে এলুম, ইস্টিশনে তোমার দাদাকে দেখলুম যে।"

কুমু চমকে উঠল। ওর দাদা যে স্টেশনে অভ্যর্থনা করতে গিয়েছিল সে-খবর এই প্রথম শুনলে।

"আহা কী সুপুরুষ! এমন কখনো চক্ষে দেখি নি। ওই-যে গান শুনেছিলেম কীর্তনে—

> গোরার রূপে লাগল রসের বান,—
> ভাসিয়ে নিয়ে যায় নদীয়ার পুরনারীর প্রাণ

আমার তাই মনে পড়ল।"

মুহূর্তে কুমুর মন গলে গেল। মুখ আড় করে জানলার দিকে রইল চেয়ে,— বাইরের মাঠ বন আকাশ অশ্রুবাষ্পে ঝাপসা হয়ে গেল।

মোতির মার বুঝতে বাকি ছিল না কোন্ জায়গায় কুমুর দরদ, তাই নানারকম করে ওর দাদার কথাই আলোচনা করলে। জিজ্ঞাসা করলে, বিয়ে হয়েছে কি না।

কুমু বললে, "না।"

মোতির মা বলে উঠল, "মরে যাই! অমন দেবতার মতো রূপ, এখনও ঘর খালি! কোন্ ভাগ্যবতীর কপালে আছে ওই বর!"

কুমু তখন ভাবছে— দাদা গিয়েছিলেন সমস্ত অভিমান ভাসিয়ে দিয়ে, কেবল আমারই জন্যে! তার পরে এঁরা একবার দেখতেও এলেন না! কেবলমাত্র টাকার জোরে এমন মানুষকেও অবজ্ঞা করতে সাহস করলেন! তাঁর শরীর এই জন্যেই বুঝি বা ভেঙে পড়ল।

বৃথা আক্ষেপের সঙ্গে বার বার মনে-মনে বলতে লাগল— দাদা কেন গেল ইস্টেশনে। কেন নিজেকে খাটো করলে। আমার জন্যে? আমার মরণ হল না কেন?

যে-কাজটা হয়ে গেছে, আর ফেরানো যাবে না, তারই উপরে ওর মনটা মাথা ঠুকতে লাগল। কেবলই মনে পড়তে লাগল, সেই রোগে-ক্লান্ত শান্ত মুখ, সেই আশীর্বাদে-ভরা স্নিগ্ধগম্ভীর দুটি চোখ।

২০

রেলগাড়ি হাওড়ায় পৌঁছল, বেলা তখন চারটে হবে। ওড়নায়-চাদরে গ্রন্থিবদ্ধ হয়ে বরকনে গিয়ে বসল ব্রুহাম গাড়িতে। কলকাতার দিবালোকের অসংখ্য চক্ষু, তার সামনে কুমুর দেহমন সংকুচিত হয়ে রইল। যে একটি অতিশয় শুচিতাবোধ এই উনিশ বছরের কুমারীজীবনে ওর অঙ্গে অঙ্গে গভীর করে ব্যাপ্ত, সেটা যে কর্ণের সহজ কবচের মতো, কেমন করে ও হঠাৎ ছিন্ন করে ফেলবে? এমন মন্ত্র আছে যে-মন্ত্রে এই কবচ এক নিমেষে আপনি খসে যায়। কিন্তু সে-মন্ত্র হৃদয়ের মধ্যে এখনও বেজে ওঠে নি। পাশে যে-মানুষটি বসে আছে মনের ভিতরে সে তো আজও বাইরের লোক। আপন লোক হবার পক্ষে তার দিক থেকে কেবল তো বাধাই এসেছে। তার ভাবে ব্যবহারে যে একটা রূঢ়তা সে যে কুমুকে এখনও পর্যন্ত কেবলই ঠেলে ঠেলে দূরে ঠেকিয়ে রাখল।

এদিকে মধুসূদনের পক্ষে কুমু একটি নূতন আবিষ্কার। স্ত্রীজাতির পরিচয় পায় এ-পর্যন্ত এমন অবকাশ এই কেজো মানুষের অল্পই ছিল। ওর পণ্যজগতের ভিড়ের মধ্যে পণ্য-নারীর ছোঁওয়াও ওকে কখনো লাগে নি। কোনো স্ত্রী ওর মনকে কখনো বিচলিত করে নি এ-কথা সত্য নয়, কিন্তু ভূমিকম্প পর্যন্তই ঘটেছে— ইমারত জখম হয় নি। মধুসূদন মেয়েদের অতি সংক্ষেপে দেখেছে ঘরের বউঝিদের মধ্যে। তারা ঘরকন্নার কাজ করে, কোঁদল করে, কানাকানি করে, অতি তুচ্ছ কারণে কান্নাকাটিও করে থাকে। মধুসূদনের জীবনে এদের সংস্রব নিতান্তই যৎসামান্য। ওর স্ত্রীও যে জগতের সেই অকিঞ্চিৎকর বিভাগে স্থান পাবে, এবং দৈনিক গার্হস্থ্যের তুচ্ছতায় ছায়াচ্ছন্ন হয়ে প্রাচীরের আড়ালে কর্তাদের কটাক্ষচালিত মেয়েলি জীবনযাত্রা অতিবাহিত করবে এর বেশি সে কিছুই ভাবে নি।

স্ত্রীর সঙ্গে ব্যবহার করবারও যে একটা কলানৈপুণ্য আছে, তার মধ্যেও যে পাওয়ার বা হারাবার একটা কঠিন সমস্যা থাকতে পারে, এ-কথা তার হিসাবদক্ষ সতর্ক মস্তিষ্কের এক কোণেও স্থান পায় নি; বনস্পতির নিজের পক্ষে প্রজাপতি যেমন বাহুল্য, অথচ প্রজাপতির সংসর্গ যেমন তাকে মেনে নিতে হয় ভাবী স্ত্রীকেও মধুসূদন তেমনি করেই ভেবেছিল।

এমন সময় বিবাহের পরে সে কুমুকে প্রথম দেখলে। এক রকমের সৌন্দর্য আছে তাকে মনে হয় যেন একটা দৈব আবির্ভাব, পৃথিবীর সাধারণ ঘটনার চেয়ে অসাধারণ পরিমাণে বেশি,— প্রতিক্ষণেই যেন সে প্রত্যাশার অতীত। কুমুর সৌন্দর্য সেই শ্রেণীর। ও যেন ভোরের শুকতারার মতো, রাত্রের জগৎ থেকে স্বতন্ত্র, প্রভাতের জগতের ওপারে। মধুসূদন তার অবচেতন মনে নিজের অগোচরে কুমুকে একরকম অস্পষ্ট-ভাবে নিজের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বোধ করলে— অন্তত একটা ভাবনা উঠল এর সঙ্গে কী রকম ভাবে ব্যবহার করা চাই, কোন্ কথা কেমন করে বললে সংগত হবে।

কী বলে আলাপ আরম্ভ করবে ভাবতে ভাবতে মধুসূদন হঠাৎ এক সময়ে কুমুকে জিজ্ঞাসা করলে, “এদিক থেকে রোদ্দুর আসছে, না?”

কুমু কিছুই জবাব করলে না। মধুসূদন ডান দিকের পর্দাটা টেনে দিলে।

খানিকক্ষণ আবার চুপচাপ কাটল। আবার খামকা বলে উঠল, “শীত করছে না তো?” বলেই উত্তরের প্রতীক্ষা না করে সামনের আসন থেকে বিলিতি কম্বলটা টেনে নিয়ে কুমুর ও নিজের পায়ের উপর বিছিয়ে দিয়ে তার সঙ্গে এক-আবরণের সহযোগিতা স্থাপন করলে। শরীর-মন পুলকিত হয়ে উঠল। চমকে উঠে কুমুদিনী কম্বলটাকে সরিয়ে দিতে যাচ্ছিল, শেষে নিজেকে সম্বরণ করে আসনের প্রান্তে গিয়ে সংলগ্ন হয়ে রইল।

কিছুক্ষণ এইভাবে যায় এমন সময় হঠাৎ কুমুর হাতের দিকে মধুসূদনের চোখ পড়ল।

"দেখি, দেখি" বলে হঠাৎ তার বাঁ হাতটা চোখের কাছে তুলে ধরে জিজ্ঞাসা করলে, "তোমার আঙুলে এ কিসের আংটি? এ যে নীলা দেখছি।"

কুমু চুপ করে রইল।

"দেখো, নীলা আমার সয় না, ওটা তোমাকে ছাড়তে হবে।"

কোনো এক সময়ে মধুসূদন নীলা কিনেছিল, সেই বছর ওর গাধাবোট-বোঝাই পাট হাওড়ার ব্রিজে ঠেকে তলিয়ে যায়। সেই অবধি নীলা-পাথরকে ও ক্ষমা করে না।

কুমুদিনী আস্তে আস্তে হাতটাকে মুক্ত করতে চেষ্টা করলে। মধুসূদন ছাড়লে না; বললে, "এটা আমি খুলে নিই।"

কুমু চমকে উঠল; বললে "না থাক্।"

একবার দাবাখেলায় ওর জিত হয়; সেইবার দাদা ওকে তার নিজের হাতের আংটি পারিতোষিক দিয়েছিল।

মধুসূদন মনে-মনে হাসলে। আংটির উপর বিলক্ষণ লোভ দেখছি। এইখানে নিজের সঙ্গে কুমুর সাধর্ম্যের পরিচয় পেয়ে একটু যেন আরাম লাগল। বুঝলে সময়ে অসময়ে সিঁথি কণ্ঠহার বালা বাজুর যোগে অভিমানিনীর সঙ্গে ব্যবহারের সোজা পথ পাওয়া যাবে,— এই পথে মধুসূদনের প্রভাব না মেনে উপায় নেই, বয়স না হয় কিছু বেশিই হল।

নিজের হাত থেকে মস্তবড়ো কমলহীরের একটা আংটি খুলে নিয়ে মধুসূদন হেসে বললে, "ভয় নেই, এর বদলে আর-একটা আংটি তোমাকে পরিয়ে দিচ্ছি।"

কুমু আর থাকতে পারলে না,— একটু চেষ্টা করেই হাত ছাড়িয়ে নিলে! এইবার মধুসূদনের মনটা ঝেঁকে উঠল। কর্তৃত্বের খর্বতা তাকে

সইবে না। শুষ্ক গলায় জোর করেই বললে, "দেখো, এ আংটি তোমাকে খুলতেই হবে।"

কুমুদিনী মাথা হেঁট করে চুপ করে রইল, তার মুখ লাল হয়ে উঠেছে।

মধুসূদন আবার বললে, "শুনছ? আমি বলছি ওটা খুলে ফেলা ভালো। দাও আমাকে।" বলে হাতটা টেনে নিতে উদ্যত হল।

কুমু হাত সরিয়ে নিয়ে বললে, "আমি খুলছি।"

খুলে ফেললে।

"দাও ওটা আমাকে দাও।"

কুমুদিনী বললে, "ওটা আমিই রেখে দেব।"

মধুসূদন বিরক্ত হয়ে হেঁকে উঠল, "রেখে লাভ কী? মনে ভাবছ, এটা ভারি একটা দামি জিনিস! এ কিছুতেই তোমার পরা চলবে না, বলে দিচ্ছি।"

কুমুদিনী বললে, "আমি পরব না।" বলে সেই পুঁতির কাজ-করা থলেটির মধ্যে আংটি রেখে দিলে।

"কেন, এই সামান্য জিনিসটার উপরে এত দরদ কেন? তোমার তো জেদ কম নয়।"

মধুসূদনের আওয়াজটা থরথরে; কানে বাজে, যেন বেলে-কাগজের ঘর্ষণ। কুমুদিনীর সমস্ত শরীরটা রী রী করে উঠল।

"এ আংটি তোমাকে দিলে কে?"

কুমুদিনী চুপ করে রইল।

"তোমার মা নাকি?"

নিতান্তই জবাব দিতে হবে বলেই অর্ধস্ফুটস্বরে বললে, "দাদা"।

দাদা! সে তো বোঝাই যাচ্ছে। দাদার দশা যে কী, মধুসূদন তা ভালোই জানে। সেই দাদার আংটি শনির সিঁধকাঠি— এ ঘরে আনা

চলবে না। কিন্তু তার চেয়েও ওকে এইটেই খোঁচা দিচ্ছে যে, এখনও কুমুদিনীর কাছে ওর দাদাই সব চেয়ে বেশি। সেটা স্বাভাবিক বলেই যে সেটা সহ্য হয় তা নয়। পুরোনো জমিদারের জমিদারি নতুন ধনী মহাজন নিলেমে কেনার পর ভক্ত প্রজারা যখন সাবেক আমলের কথা স্মরণ করে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলতে থাকে তখন আধুনিক অধিকারীর গায়ের জ্বালা ধরে, এও তেমনি। আজ থেকে আমিই যে ওর একমাত্র, এই কথাটা যত শীঘ্র হোক ওকে জানান দেওয়া চাই। তাছাড়া গায়ে-হলুদের খাওয়ানো নিয়ে বরের যা অপমান হয়েছে তাতে বিপ্রদাস নেই এ-কথা মধুসূদন বিশ্বাস করতেই পারে না। যদিও নবগোপাল বিবাহের পরদিনে ওকে বলেছিল, "ভায়া, বিয়েবাড়িতে তোমাদের হাটখোলার আড়ত থেকে যে-চালচলন আমদানি করেছিলে, সে-কথাটা ইঙ্গিতেও দাদাকে জানিয়ো না; উনি এর কিছুই জানেন না, ওঁর শরীরও বড়ো খারাপ।"

আংটির কথাটা আপাতত স্থগিত রাখলে, কিন্তু মনে রইল।

এদিকে রূপ ছাড়া আরও একটা কারণে হঠাৎ কুমুদিনীর দর বেড়ে গিয়েছে। নুরনগরে থাকতেই ঠিক বিবাহের দিনে মধুসূদন টেলিগ্রাফ পেয়েছে যে এবার তিসি চালানের কাজে লাভ হয়েছে প্রায় বিশ লাখ টাকা। সন্দেহ রইল না, এটা নতুন বধূর পয়ে। স্ত্রীভাগ্যে ধন, তার প্রমাণ হাতে হাতে। তাই কুমুকে পাশে নিয়ে গাড়িতে বসে ভিতরে ভিতরে এই পরম পরিতৃপ্তি তার ছিল যে, ভাবী মুনফার একটা জীবন্ত বিধিদত্ত দলিল নিয়ে বাড়ি চলেছে। এ নইলে আজকের এই ক্রুহাম-রথযাত্রার পালাটায় অপঘাত ঘটতে পারত।

২১

রাজা উপাধি পাওয়ার পর থেকে কলকাতায় ঘোষালবাড়ির দ্বারে নাম খোদা হয়েছে "মধুপ্রাসাদ"। সেই প্রাসাদের লোহার গেটের এক পাশে আজ নবহত বসেছে, আর বাগানে একটা তাঁবুতে বাজছে ব্যাণ্ড। গেটের মাথায় অর্ধচন্দ্রাকারে গ্যাসের টাইপে লেখা "প্রজাপতয়ে নমঃ"। সন্ধ্যাবেলায় আলোকশিখায় এই লিখনটি সমুজ্জ্বল হবে। গেট থেকে কাঁকর-দেওয়া যে-পথ বাড়ি পর্যন্ত গেছে, তার দুইধারে দেবদারুপাতা ও গাঁদার মালার শোভাসজ্জা; বাড়ির প্রথম তলার উঁচু মেজেতে ওঠবার সিঁড়ির ধাপে লাল সালু পাতা। আত্মীয়বন্ধুর জনতার ভিতর দিয়ে বরকনের গাড়ি গাড়িবারান্দায় এসে থামল। শাঁখ উলুধ্বনি ঢাক ঢোল কাঁসর নহবত ব্যাণ্ড সব একসঙ্গে উঠল বেজে— যেন দশ-পনেরোটা আওয়াজের মালগাড়ির এক জায়গাতে পুরো বেগে ঠোকাঠুকি ঘটল। মধুসূদনের কোন্ এক সম্পর্কের দিদিমা, পরিপক্ব বুড়ী, সিঁথিতে যত মোটা ফাঁক তত মোটা সিঁদুর, চওড়া-লালপেড়ে শাড়ি, মোটা হাতে মোটা মোটা সোনার বালা এবং শাঁখার চুড়ি, একটা রুপোর ঘটিতে জল নিয়ে বউএর পায়ে ছিটিয়ে দিয়ে আঁচলে মুছে নিলেন, হাতে নোয়া পরিয়ে দিলেন, বউয়ের মুখে একটু মধু দিয়ে বললেন, "আহা, এতদিন পরে আমাদের নীল গগনে উঠল পূর্ণ চাঁদ, নীল সরোবরে ফুটল সোনার পদ্ম।" বরকনে গাড়ি থেকে নাবল। যুবক-অভ্যাগতদের দৃষ্টি ঈর্ষান্বিত। একজন বললে, "দৈত্য স্বর্গ লুঠ করে এনেছে রে, অপ্সরী সোনার শিকলে বাঁধা।" আর-একজন বললে, "সাবেক কালে এমন মেয়ের জন্যে রাজায় রাজায় লড়াই বেধে যেত, আজ তিসি-চালানির টাকাতেই কাজ সিদ্ধি। কলিযুগে দেবতাগুলো বেরসিক। ভাগ্যচক্রের সব গ্রহনক্ষত্রই বৈশ্যবর্ণ।"

তারপরে বরণ, স্ত্রী-আচার প্রভৃতির পালা শেষ হতে হতে যখন সন্ধ্যা হয়ে আসে তখন কালরাত্রির মুখে ক্রিয়াকর্ম সাঙ্গ হল।

একটিমাত্র বড়ো বোনের বিবাহ কুমুর স্পষ্ট মনে আছে। কিন্তু তাদের নিজেদের বাড়িতে কোনো নতুন বউ আসতে সে দেখে নি। যৌবনারম্ভের পূর্বে থেকেই সে আছে কলকাতায়, দাদার নির্মল স্নেহের আবেষ্টনে। বালিকার মনের কল্পজগৎ সাধারণ সংসারের মোটা ছাঁচে গড়া হতে পায় নি। বাল্যকালে পতিকামনায় যখন সে শিবের পূজা করেছে, তখন পতির ধ্যানের মধ্যে সেই মহাতপস্বী রজতগিরিনিভ শিবকেই দেখেছে। সাধ্বী নারীর আদর্শরূপে সে আপন মাকেই জানত। কী স্নিগ্ধ শান্ত কমনীয়তা, কত ধৈর্য, কত দুঃখ, কত দেবপূজা, মঙ্গলাচরণ, অক্লান্ত সেবা। অপর পক্ষে তাঁর স্বামীর দিকে ব্যবহারের ত্রুটি চরিত্রের স্খলন ছিল; তৎসত্ত্বেও সে-চরিত্র ঔদার্যে বৃহৎ, পৌরুষে দৃঢ়, তার মধ্যে হীনতা কপটতা লেশমাত্র ছিল না, যে একটা মর্যাদাবোধ ছিল সে যেন দূরকালের পৌরাণিক আদর্শের। তাঁর জীবনের মধ্যে প্রতিদিন এইটেই প্রমাণ হয়েছে যে, প্রাণের চেয়ে মান বড়ো, অর্থের চেয়ে ঐশ্বর্য। তিনি ও তাঁব সমপর্যায়ের লোকেরা বড়ো বহরের মানুষ। তাঁদের ছিল নিজেদের ক্ষতি করেও অক্ষত সম্মানের গৌরব রক্ষা, অক্ষত সঞ্চয়ের অহংকার প্রচার নয়।

কুমুর যেদিন বাঁ চোখ নাচল সে দিন সে তার সব ভক্তি নিয়ে, আত্মোৎসর্গের পূর্ণ সংকল্প নিয়ে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কোথাও কোনো বাধা বা থর্বতা ঘটতে পারে এ-কথা তার কল্পনাতেই আসে নি। দময়ন্তী কী করে আগে থাকতে জেনেছিলেন যে, বিদর্ভরাজ নলকেই বরণ করে নিতে হবে! তাঁর মনের ভিতরে নিশ্চিত বার্তা এসে পৌঁছেছিল—তেমনি নিশ্চিত বার্তা কি কুমু পায় নি? বরণের আয়োজন সবই প্রস্তুত ছিল, রাজাও এলেন, কিন্তু মনে যাকে স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিল, বাইরে তাকে

দেখলে কই? রূপেতেও বাধত না, বয়সেও বাধত না। কিন্তু রাজা? সেই সত্যকার রাজা কোথায়?

তার পরে আজ, যে-অনুষ্ঠানের দ্বার দিয়ে কুমুকে তার নূতন সংসারে আহ্বান করলে তাতে এমন কোনো বজ্রগম্ভীর মঙ্গলধ্বনি বাজল না কেন যার ভিতর দিয়ে এই নববধূ আকাশের সপ্তর্ষিদের আশীর্বাদমন্ত্র শুনতে পেত! সমস্ত অনুষ্ঠানকে পরিপূর্ণ করে এমন বন্দনাগান উদাত্ত স্বরে কেন জাগল না—

জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্বতীপরমেশ্বরৌ

সেই "জগতঃ পিতরৌ" যাঁর মধ্যে চিরপুরুষ ও চিরনারী বাক্য ও অর্থের মতো একত্র মিলিত হয়ে আছে?

২২

মধুসূদন যখন কলকাতায় বাস করতে এল, তখন প্রথমে সে একটি পুরোনো বাড়ি কিনেছিল, সেই চকমেলানো বাড়িটাই আজ তার অন্তঃপুর-মহল। তার পরে তারই সামনে এখনকার ফ্যাশানে একটা মস্ত নতুন মহল এরই সঙ্গে জুড়ে দিয়েছে, সেইটে ওর বৈঠকখানা-বাড়ি। এই দুই মহল যদিও সংলগ্ন তবুও এরা সম্পূর্ণ আলাদা দুই জাত। বাইরের মহলে সর্বত্রই মার্বলের মেজে, তার উপরে বিলিতি কারপেট, দেয়ালে চিত্রিত কাগজ মারা এবং তাতে ঝুলছে নানা রকমের ছবি, কোনোটা এনগ্রেভিং, কোনোটা ওলিয়োগ্রাফ, কোনোটা অয়েলপেন্টিং— তার বিষয় হচ্ছে, হরিণকে তাড়া করেছে শিকারি কুকুর, কিংবা ডার্বির ঘোড়দৌড় জিতেছে এমন সব বিখ্যাত ঘোড়া, বিদেশী ল্যাণ্ডস্কেপ, কিংবা স্নানরত নগ্নদেহ নারী। তাছাড়া দেয়ালে কোথাও বা চীনে বাসন, মোরাদাবাদি পিতলের থালা, জাপানি পাখা, তিব্বতি চামর ইত্যাদি যত প্রকার অসংগত পদার্থের

অস্থানে অযথা সমাবেশ। এই সমস্ত গৃহসজ্জা পছন্দ করা, কেনা, এবং সাজানোর ভার মধুসূদনের ইংরেজ অ্যাসিস্টেণ্টের উপর। এ ছাড়া মকমলে বা রেশমে মোড়া চৌকি-সোফার অরণ্য। কাঁচের আলমারিতে জমকালো বাঁধানো ইংরেজি বই, ঝাড়ন-হস্ত বেহারা ছাড়া কোনো মানুষ তার উপর হস্তক্ষেপ করে না— টিপাইয়ে আছে অ্যালবাম, তার কোনোটাতে ঘরের লোকের ছবি, কোনোটাতে বিদেশিনী অ্যাক্ট্রেসদের।

অন্তঃপুরে একতলার ঘরগুলো অন্ধকার, স্যাঁতসেঁতে, ধোঁয়ায় ঝুলে কালো। উঠোনে আবর্জনা,—সেখানে জলের কল, বাসন মাজা কাপড় কাচা চলছেই, যখন ব্যবহার নেই তখনও কল প্রায় খোলাই থাকে। উপরের বারান্দা থেকে মেয়েদের ভিজে কাপড় ঝুলছে, আর দাঁড়ের কাকাতুয়ার উচ্ছিষ্ট ছড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ছে উঠোনে। বারান্দার দেয়ালের যেখানে-সেখানে পানের পিকের দাগ ও নানাপ্রকার মলিনতার অক্ষয় স্মৃতিচিহ্ন। উঠোনের পশ্চিম দিকের রোয়াকের পশ্চাতে রান্নাঘর, সেখান থেকে রান্নার গন্ধ ও কয়লার ধোঁয়া উপরের ঘরে সর্বত্রই প্রসার লাভ করে। রান্নাঘরের বাইরে প্রাচীরবদ্ধ অল্প একটু জমি আছে তারই এক কোণে পোড়া কয়লা, চুলোর ছাই, ভাঙা গামলা, ছিন্ন ধামা, জীর্ণ ঝাঁঝরি রাশীকৃত; অপর প্রান্তে গুটিদুয়েক গাই ও বাছুর বাঁধা, তাদের খড় ও গোবর জমছে, এবং সমস্ত প্রাচীর ঘুঁটের চক্রে আচ্ছন্ন। এক ধারে একটি মাত্র নিমগাছ, তার গুঁড়িতে গোরু বেঁধে বেঁধে বাকল গেছে উঠে, আর ক্রমাগত ঠেঙিয়ে ঠেঙিয়ে তার পাতা কেড়ে নিয়ে গাছটাকে জেরবার করে দিয়েছে। অন্তঃপুরে এই একটুমাত্র জমি, বাকি সমস্ত জমি বাইরের দিকে। সেটা লতামণ্ডপে, বিচিত্র ফুলের কেয়ারিতে, ছাঁটা ঘাসের মাঠে, খোয়া ও সুরকি-দেওয়া রাস্তায়, পাথরের মূর্তি ও লোহার বেঞ্চিতে সুসজ্জিত।

অন্দরমহলে তেতলায় কুমুদিনীর শোবার ঘর। মস্ত বড়ো খাট মেহগনি কাঠের ; ফ্রেমে নেটের মশারি, তাতে সিল্কের ঝালর। বিছানার পায়ের দিকে পুরো বহরের একটা নিরাবরণ মেয়ের ছবি, বুকের উপর দুই হাত চেপে লজ্জার ভান করছে। শিয়রের দিকে মধুসূদনের নিজের অয়েলপেন্টিং, তাতে তার কাশ্মীরি শালের কারুকার্যটাই সব চেয়ে প্রকাশমান। একদিকে দেয়ালের গায়ে কাপড় রাখবার দেরাজ, তার উপরে আয়না ; আয়নার দু-দিকে দুটো চীনেমাটির শামাদান, সামনে চীনেমাটির থালির উপর পাউডারের কৌটো, রুপো-বাঁধানো চিরুনি, তিন-চার রকমের এসেন্স, এসেন্স ছিটোবার পিচকারি এবং আরও নানা রকমের প্রসাধনের সামগ্রী, বিলিতি অ্যাসিস্টেন্টের কেনা। নানাশাখাযুক্ত গোলাপি কাঁচের ফুলদানিতে ফুলের তোড়া। আর-একদিকে লেখবার টেবিল, তাতে দামি পাথরের দোয়াতদান, কলম ও কাগজকাটা। ইতস্তত মোটা গদিওআলা সোফা ও কেদারা— কোথাও-বা টিপাই, তাতে চা খাওয়া যায়, তাসখেলা যেতেও পারে। নতুন মহারানীর উপযুক্ত শয়নঘর কী রকম হওয়া বিধিসংগত এ-কথা মধুসূদনকে বিশেষভাবে চিন্তা করতে হয়েছে। এমন হয়ে উঠল, যেন অন্দরমহলের সর্বোচ্চতলার এই ঘরটি ময়লা কাঁথা গায়ে-দেওয়া ভিখিরির মাথায় জরিজহরাত-দেওয়া পাগড়ি।

অবশেষে একসময়ে গোলমাল-ধুমধামের বানডাকা দিন পার হয়ে রাত্রিবেলা কুমু এই ঘরে এসে পৌঁছল। তাকে নিয়ে এল সেই মোতির মা। সে ওর সঙ্গে আজ রাত্রে শোবে ঠিক হয়েছে। আরও একদল মেয়ে সঙ্গে সঙ্গে আসছিল। তাদের কৌতূহল ও আমোদের নেশা মিটতে চায় না—মোতির মা তাদের বিদায় করে দিয়েছে। ঘরের মধ্যে এসেই এক হাতে সে ওর গলা জড়িয়ে ধরে বললে, "আমি কিছুখনের জন্যে যাই

ওই পাশের ঘরে,— তুমি একটু কেঁদে নাও ভাই,—চোখের জল যে বুক ভরে জমে উঠেছে।" বলে সে চলে গেল।

কুমু চৌকির উপর বসে পড়ল। কান্না পরে হবে, এখন ওর বড়ো দরকার হয়েছে নিজেকে ঠিক করা। ভিতরে ভিতরে সকলের চেয়ে যে-ব্যথাটা ওকে বাজছিল সে হচ্ছে নিজের কাছে নিজের অপমান। এতকাল ও যা-কিছু সংকল্প করে এসেছে ওর বিদ্রোহী মন সম্পূর্ণ তার উলটো দিকে চলে গেছে। সেই মনটাকে শাসন করবার একটুও সময় পাচ্ছিল না। ঠাকুর, বল দাও, বল দাও, আমার জীবন কালি করে দিয়ো না। আমি তোমার দাসী, আমাকে জয়ী করো, সে জয় তোমারই।

পরিণতবয়সী আঁটসাঁট গড়নের শ্যামবর্ণ একটি সুন্দরী বিধবা ঘরে ঢুকেই বললে "মোতির মা তোমাকে একটু ছুটি দিয়েছে সেই ফাঁকে এসেছি; কাউকে তো কাছে ঘেঁষতে দেবে না, বেড়ে রাখবে তোমাকে— যেন সিঁধকাটি নিয়ে বেড়াচ্ছি, ওর বেড়া কেটে তোমাকে চুরি করে নিয়ে যাব। আমি তোমার জা, শ্যামাসুন্দরী; তোমার স্বামী আমার দেওর। আমরা তো ভেবেছিলেম শেষ পর্যন্ত জমাখরচের খাতাই হবে ওর বউ। তা ওই খাতার মধ্যে জাদু আছে ভাই, এত বয়সে এমন সুন্দরী ওই খাতার জোরেই জুটল। এখন হজম করতে পারলে হয়। ওইখানে খাতার মন্তর খাটে না। সত্যি করে বলো ভাই, আমাদের বুড়ো দেওরটিকে পছন্দ হয়েছে তো?"

কুমু অবাক হয়ে রইল, কী জবাব দেবে ভেবেই পেলে না। শ্যামা বলে উঠল, "বুঝেছি, তা পছন্দ না হলেই বা কি, সাত পাক যখন ঘুরেছ তখন একুশ পাক উলটো ঘুরলেও ফাঁস খুলবে না।"

কুমু বললে, "এ কী কথা বলছ দিদি!"

শ্যামা জবাব দিলে, "খোলসা করে কথা বললেই কি দোষ হয় বোন?

মুখ দেখে কি বুঝতে পারি নে? তা দোষ দেব না তোমাকে। ও আমাদের আপন বলেই কি চোখের মাথা খেয়ে বসেছি? বড়ো শক্ত হাতে পড়েছ বউ, বুঝে সুঝে চ'লো!"

এমন সময় মোতির মাকে ঘরে ঢুকতে দেখেই বলে উঠল, "ভয় নেই, ভয় নেই, বকুলফুল, যাচ্ছি আমি। ভাবলুম তুমি নেই এই ফাঁকে আমাদের নতুন বউকে একবার দেখে আসি গে। তা সত্যি বটে, এ কৃপণের ধন, সাবধানে রাখতে হবে। সইকে বলছিলুম আমাদের দেওরের এ যেন হল আধ-কপালে মাথাধরা; বউকে ধরেছে ওর বাঁ-দিকের পাওয়ার-কপালে, এখন ডানদিকের রাখার-কপালে যদি ধরতে পারে তবেই পুরোপুরি হবে।

এই বলেই ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে মুহূর্ত পরে ঘরে ঢুকে কুমুর সামনে পানের ডিবে খুলে ধরে বললে, "একটা পান নেও। দোক্তা খাওয়া অভ্যেস আছে?"

কুমু বললে, "না।" তখন এক টিপ দোক্তা নিয়ে নিজের মুখে পুরে দিয়ে শ্যামা মন্দগমনে বিদায় নিলে।

"এখনই বদ্দিমাসিকে খাইয়ে বিদায় করে আসছি, দেরি হবে না" বলে মোতির মা চলে গেল।

শ্যামাসুন্দরী কুমুর মনের মধ্যে ভারি একটা বিস্বাদ জাগিয়ে দিলে। আজকে কুমুর সব চেয়ে দরকার ছিল মায়ার আবরণ, সেইটেই সে আপন মনে গড়তে বসেছিল, আর যে-সৃষ্টিকর্তা দ্যুলোকে ভূলোকে নানা রং নিয়ে রূপের লীলা করেন, তাঁকেও সহায় করবার চেষ্টা করছিল, এমন সময় শ্যামা এসে ওর স্বপ্ন-বোনা জালে ঘা মারলে। কুমু চোখ বুজে খুব জোর করে নিজেকে বলতে লাগল, "স্বামীর বয়স বেশি বলে তাঁকে ভালোবাসি নে এ-কথা কখনোই সত্য নয়— লজ্জা, লজ্জা! এ যে ইতর মেয়েদের মতো

কথা।” শিবের সঙ্গে সতীর বিয়ের কথা কি ওর মনে নেই? শিবনিন্দুকরা তাঁর বয়স নিয়ে খোঁটা দিয়েছিল, কিন্তু সে-কথা সতী কানে নেন নি।

স্বামীর বয়স বা রূপ নিয়ে এ-পর্যন্ত কুমু কোনো চিন্তাই করে নি। সাধারণত যে-ভালোবাসা নিয়ে স্ত্রীপুরুষের বিবাহ সত্য হয়, যার মধ্যে রূপ-গুণ দেহমন সমস্তই মিলে আছে, তার যে প্রয়োজন আছে এ-কথা কুমু ভাবেও নি। পছন্দ করে নেওয়ার কথাটাকেই রং মাখিয়ে চাপা দিতে চায়।

এমন সময় ফুলকাটা জামা ও জরির পাড়ওআলা ধুতি-পরা ছেলে, বয়স হবে বছর সাতেক, ঘরে ঢুকেই গা ঘেঁষে কুমুর কাছে এসে দাঁড়াল। বড়ো বড়ো স্নিগ্ধ চোখ ওর মুখের দিকে তুলে ভয়ে ভয়ে আস্তে আস্তে মিষ্টি সুরে বললে, “জ্যেঠাইমা।” কুমু তাকে কোলের উপর টেনে নিয়ে বললে, “কী বাবা, তোমার নাম?” ছেলেটি খুব ঘটা করে বললে, শ্রীটুকুও বাদ দিলে না, “শ্রীমোতিলাল ঘোষাল।” সকলের কাছে, পরিচয় ওর হাবলু বলে। সেইজন্যেই উপযুক্ত দেশকালপাত্রে নিজের সম্মান রাখবার জন্যে পিতৃদত্ত নামটাকে এত সুসম্পূর্ণ করে বলতে হয়। তখন কুমুর বুকের ভিতরটা টনটন করছিল— এই ছেলেকে বুকে চেপে ধরে যেন বাঁচল। হঠাৎ কেমন মনে হল কতদিন ঠাকুরঘরে যে-গোপালকে ফুল দিয়ে এসেছে, এই ছেলেটির মধ্যে সে-ই ওর কোলে এসে বসল। ঠিক যে-সময়ে ডাকছিল সেই দুঃখের সময়েই এসে ওকে বললে, “এই যে আমি আছি তোমার সান্ত্বনা।” মোতির গোল গোল গাল টিপে ধরে কুমু বললে, “গোপাল, ফুল নেবে?”

কুমুর মুখ দিয়ে গোপাল ছাড়া আর কোনো নাম বেরোল না। হঠাৎ নিজের নামান্তরে হাবলুর কিছু বিস্ময় বোধ হল— কিন্তু এমন সুর ওর কানে পৌঁছেছে যে কিছু আপত্তি ওর মনে আসতে পারে না।

এমন সময়ে পাশের ঘর থেকে মোতির মা ছেলের গলা শুনতে পেয়ে ছুটে এসে বললে, "ওই রে, বাঁদর ছেলেটা এসেছে বুঝি।" শ্রীমোতিলাল ঘোষাল-এর সম্মান আর থাকে না। নালিশে-ভরা চোখ তুলে নিঃশব্দে মায়ের মুখের দিকে সে চেয়ে রইল, ডান হাতে জ্যেঠাইমার আঁচল চেপে। কুমু হাবলুকে তার বাঁ হাত দিয়ে বেড়ে নিয়ে বললে, "আহা থাক্ না।"

"না ভাই, অনেক রাত হয়ে গেছে। এখন শুতে যাক্— এ-বাড়িতে ওকে খুব সহজেই মিলবে, ওর মতো সস্তা ছেলে আর কেউ নেই।" বলে মোতির মা অনিচ্ছুক ছেলেকে শোয়াবার জন্যে নিয়ে গেল। এতটুকুতেই কুমুর মনের ভার গেল হালকা হয়ে। ওর মনে হল প্রার্থনার জবাব পেলুম, জীবনের সমস্যা সহজ হয়ে দেখা দেবে, এই ছোটো ছেলেটির মতোই।

১৩

অনেক রাত্তিরে মোতির মা এক সময়ে জেগে উঠে দেখলে কুমু বিছানায় উঠে বসে আছে, তার কোলের উপর দুই হাত জোড়া, ধ্যানাবিষ্ট চোখ দুটি যেন সামনে কাকে দেখতে পাচ্ছে। মধুসূদনকে যতই সে হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণ করতে বাধা পায়, ততই তার দেবতাকে দিয়ে সে তার স্বামীকে আবৃত করতে চায়। স্বামীকে উপলক্ষ্য করে আপনাকে সে দান করছে তার দেবতাকে। দেবতা তাঁর পূজাকে বড়ো কঠিন করেছেন, এ প্রতিমা স্বচ্ছ নয়, কিন্তু এই তো ভক্তির পরীক্ষা। শালগ্রামশিলা তো কিছুই দেখায় না, ভক্তি সেই রূপহীনতার মধ্যে বৈকুণ্ঠনাথের রূপকে প্রকাশ করে কেবল আপন জোরে। যেখানে দেখা যাচ্ছে না সেইখানেই দেখব এই হোক আমার সাধনা, যেখানে ঠাকুর লুকিয়ে থাকেন সেইখানে গিয়েই তাঁর চরণে আপনাকে দান করব, তিনি আমাকে এড়াতে পারবেন না।

"মেরে গিরিধর গোপাল, ঔর নাহি কোহি"— দাদার কাছে শেখা মীরাবাই-এর এই গানটা বারবার মনে-মনে আওড়াতে লাগল।

মধুসূদনের অত্যন্ত রূঢ় যে-পরিচয় সে পেয়েছে তাকে কিছুই নয় বলে, জলের উপরকার বুদ্‌বুদ বলে উড়িয়ে দিতে চায়— চিরকালের যিনি সত্য, সমস্ত আবৃত করে তিনিই আছেন, "ঔর নাহি কোহি, ঔর নাহি কোহি।" এ ছাড়া আর-একটা পীড়ন আছে তাকেও মায়া বলতে চায়— সে হচ্ছে জীবনের শূন্যতা। আজ পর্যন্ত যাদের নিয়ে ওর সমস্ত কিছু গড়ে উঠেছে, যাদের বাদ দিতে গেলে জীবনের অর্থ থাকে না, তাদের সঙ্গে বিচ্ছেদ,— সে নিজেকে বলছে এই শূন্য ও পূর্ণ—

> বাপে ছাড়ে, মায়ে ছাড়ে, ছাড়ে সগা সহী,
> মীরা প্রভু লগন লগী যো ন হোয়ে হোয়ী।

ছেড়েছেন তো বাপ, ছেড়েছেন তো মা; কিন্তু তাঁদের ভিতরেই যিনি চিরকালকার তিনি তো ছাড়েন নি। ঠাকুর আরও যা-কিছু ছাড়ান না কেন, শূন্য ভরাবেন বলেই ছাড়িয়েছেন। আমি লেগে রইলুম, যা হয় তা হোক। মনের গান কখন তার গলায় ফুটে উঠল তা টেরই পেলে না— দুই চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

মোতির মা কথাটি বললে না, চুপ করে দেখলে, আর শুনলে। তার পরে কুমু যখন অনেকক্ষণ ধরে প্রণাম করে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে শুয়ে পড়ল তখন মোতির মার মনে একটা চিন্তা দেখা দিল যা পূর্বে আর কখনো ভাবে নি।

ও ভাবতে লাগল, আমাদের যখন বিয়ে হয়েছিল তখন আমরা তো কচি খুকী ছিলুম, মন বলে একটা বালাই ছিল না। ছোটোছেলে কাঁচা ফলটাকে যেমন টপ করে বিনা আয়োজনে মুখে পুরে দেয়, স্বামীর সংসার

তেমনি করেই বিনা বিচারে আমাদের গিলেছে, কোথাও কিছু বাধে নি। সাধন করে আমাদের নিতে হয় নি, আমাদের জন্যে দিন-গোনা ছিল অনাবশ্যক। যেদিন বললে ফুলশয্যে সেইদিনই হল ফুলশয্যে, কেননা ফুলশয্যের কোনো মানে ছিল না, সে ছিল একটা খেলা। এই তো কালই হবে ফুলশয্যে, কিন্তু এ মেয়ের পক্ষে সে কতবড়ো বিড়ম্বনা! বড়ঠাকুর এখন পর; আপন হতে অনেক সময় লাগে। একে ছোঁবে কী করে? এ-মেয়ের সেই অপমান সইবে কেন? ধন পেতে বড়ঠাকুরের কত কাল লাগল আর মন পেতে দু-দিন সবুর সইবে না? সেই লক্ষ্মীর দ্বারে হাঁটা-হাঁটি করে মরতে হয়েছে, এ লক্ষ্মীর দ্বারে একবার হাত পাততে হবে না?

এত কথা মোতির মার মনে আসত না। এসেছে তার কারণ, কুমুকে দেখবামাত্রই ও তাকে সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছে। এই ভালো-বাসার পূর্বভূমিকা হয়েছিল স্টেশনে যখন সে দেখেছিল বিপ্রদাসকে। যেন মহাভারত থেকে ভীষ্ম নেমে এলেন। বীরের মতো তেজস্বী মূর্তি, তাপসের মতো শান্ত মুখশ্রী, তার সঙ্গে একটি বিষাদের নম্রতা। মোতির মার মনে হয়েছিল কেউ যদি কিছু না বলে তবে একবার ওর পা দুটো ছুঁয়ে আসি। সেই রূপ আজও সে ভুলতে পারে নি। তার পরে যখন কুমুকে দেখলে, মনে মনে বললে, দাদারই বোন বটে!

একরকম জাতিভেদ আছে যা সমাজের নয়, যা রক্তের,— সে-জাত কিছুতে ভাঙা যায় না। এই যে রক্তগত জাতের অসামঞ্জস্য এতে মেয়েকে যেমন মর্মান্তিক করে মারে পুরুষকে এমন নয়। অল্প বয়সে বিয়ে হয়েছিল বলে মোতির মা এই রহস্য নিজের মধ্যে বোঝবার সময় পায় নি,— কিন্তু কুমুর ভিতর দিয়ে এই কথাটা সে নিশ্চিত করে অনুভব করলে। তার গা কেমন করতে লাগল। ও যেন একটা বিভীষিকার ছবি দেখতে পেলে,— যেখানে একটা অজানা জন্তু লালায়িত রসনা মেলে গুঁড়ি মেরে

বসে আছে, সেই অন্ধকার গুহার মুখে কুমুদিনী দাঁড়িয়ে দেবতাকে ডাকছে। মোতির মা রেগে উঠে মনে-মনে বললে, "দেবতার মুখে ছাই! যে-দেবতা ওর বিপদ ঘটিয়েছে সেই নাকি ওকে উদ্ধার করবে! হায় রে।"

২৪

পরের দিন সকালেই কুমু দাদার কাছ থেকে টেলিগ্রাম পেয়েছে, "ভগবান তোমাকে আশীর্বাদ করুন।" সেই টেলিগ্রামের কাগজখানি জামার মধ্যে বুকের কাছে রেখে দিলে। এই টেলিগ্রামে যেন দাদার দক্ষিণ হাতের স্পর্শ। কিন্তু দাদা নিজের শরীরের কথা কেন কিছুই লিখলে না? তবে কি অসুখ বেড়েছে? দাদার সব খবরই মুহূর্তে মুহূর্তে যার প্রত্যক্ষ-গোচর ছিল, আজ তার কাছে সবই অবরুদ্ধ।

আজ ফুলশয্যে, বাড়িতে লোকে লোকারণ্য। আত্মীয়-মেয়েরা সমস্ত-দিন কুমুকে নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। কিছুতে তাকে একলা থাকতে দিলে না। আজ একলা থাকবার বড়ো দরকার ছিল।

শোবার ঘরের পাশেই ওর নাবার ঘর; সেখানে জলের কল পাতা এবং ধারা-স্নানের ঝাঁঝরি বসানো। কোনো অবকাশে বাক্স থেকে যুগল-রূপের ফ্রেমে-বাঁধানো পটখানি বের করে স্নানের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করল। সাদা পাথরের জলচৌকির উপর পট রেখে সামনে মাটিতে বসে নিজের মনে বারবার করে বললে, "আমি তোমারই, আজ তুমিই আমাকে নাও। সে আর কেউ নয়, সে তুমিই, সে তুমিই, সে তুমিই। তোমারই যুগল-রূপ প্রকাশ হোক আমার জীবনে।"

ডাক্তাররা বলছে বিপ্রদাসের ইনফ্লুয়েঞ্জা ন্যুমোনিয়ায় এসে দাঁড়িয়েছে। নবগোপাল একলা কলকাতায় এল ফুলশয্যার সওগাত পাঠাবার ব্যবস্থা

করতে। খুব ঘটা করেই সওগাত পাঠানো হল। বিপ্রদাস নিজে থাকলে এত আড়ম্বর করত না।

কুমুর বিবাহ উপলক্ষ্যে ওর বড়ো বোন চারজনকেই আনতে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু খবর রটে গেছে—ঘোষালরা সদ্‌ব্রাহ্মণ নয়। বাড়ির লোক এ-বিয়েতে কিছুতে তাদের পাঠাতে রাজি হল না। কুমুর তৃতীয় বোন যদি বা স্বামীর সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করে বিয়ের পরদিন কলকাতায় এসে পৌঁছল, নবগোপাল বললে, "ও বাড়িতে তুমি গেলে আমাদের মান থাকবে না।" বিবাহরাত্রির কথা আজও সে ভুলতে পারে নি। তাই প্রায়-অসম্পর্কীয় গুটিকয়েক ছোটো ছোটো মেয়ে এক বুড়ী দাসীর সঙ্গে পাঠিয়ে দিলে নিমন্ত্রণ রাখতে। কুমু বুঝলে, সন্ধি এখনও হল না, হয়তো কোনো কালে হবে না।

কুমুর সাজসজ্জা হল। ঠাট্টার সম্পর্কীয়দের ঠাট্টার পালা শেষ হয়েছে— নিমন্ত্রিতদের খাওয়ানো শুরু হবে। মধুসূদন আগে থাকতেই বলে রেখেছিল, বেশি রাত করলে চলবে না, কাল ওর কাজ আছে। ন-টা বাজবামাত্রই হুকুম-মতো নিচের উঠোন থেকে সশব্দে ঘণ্টা বেজে উঠল। আর এক মুহূর্ত না। সময় অতিক্রম করবার সাধ্য কারও নেই। সভা ভঙ্গ হল। আকাশ থেকে বাজপাখির ছায়া দেখতে পেয়ে কপোতীর যেমন করে, কুমুব বুকটা তেমনি কাঁপতে লাগল। তার ঠাণ্ডা হাত ঘামছে, তার মুখ বিবর্ণ। ঘর থেকে বেরিয়ে এসেই মোতির মার হাত ধরে বললে, "আমাকে একটুখানির জন্যে কোথাও নিয়ে যাও আড়ালে। দশ মিনিটের জন্যে একলা থাকতে দাও।" মোতির মা তাড়াতাড়ি নিজের শোবার ঘরে নিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলে। বাইরে দাঁড়িয়ে চোখ মুছতে মুছতে বললে, "এমন কপালও করেছিলি।"

দশ মিনিট যায়, পনেরো মিনিট যায়। লোক এল,— বর শোবার ঘরে গেছে, বউ কোথায়? মোতির মা বললে, "অত ব্যস্ত হলে চলবে কেন?

বউ গায়ের জামা গয়নাগুলো খুলবে না ?” মোতির মা যতক্ষণ পারে ওকে সময় দিতে চায়। অবশেষে যখন বুঝলে আর চলবে না তখন দরজা খুলে দেখে, বউ মূর্ছিত হয়ে মেজের উপর পড়ে আছে।

গোলমাল পড়ে গেল। ধরাধরি করে বিছানার উপর তুলে দিয়ে কেউ জলের ছিটে দেয়, কেউ বাতাস করে। কিছুক্ষণ পরে যখন চেতনা হল, কুমু বুঝতে পারলে না কোথায় সে আছে— ডেকে উঠল, “দাদা”। মোতির মা তাড়াতাড়ি তার মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে বললে, “ভয় নেই দিদি, এই যে আমি আছি।” বলে ওর মুখটা বুকের উপর তুলে নিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরল। সবাইকে বললে, “তোমরা ভিড় ক'রো না আমি এখনই ওঁকে নিয়ে যাচ্ছি।” কানে-কানে বলতে লাগল, “ভয় করিস নে ভাই, ভয় করিস নে।” কুমু ধীরে ধীরে উঠল। মনে-মনে ঠাকুরের নাম করে প্রণাম করলে। ঘরের অন্য পাশে একটা তক্তাপোশের উপর হাবলু গভীর ঘুমে মগ্ন— তার পাশে গিয়ে তার কপালে চুমো খেলে। মোতির মা তাকে শোবার ঘর পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, “এখনও ভয় করছে দিদি ?”

কুমু হাতের মুঠো শক্ত করে একটু হেসে বললে, “না, আমার কিচ্ছু ভয় করছে না।” মনে-মনে বলছে, “এই আমার অভিসার, বাইরে অন্ধকার ভিতরে আলো।”

মেরে গিরিধর গোপাল ঔর নাহি কোহি।

২৫

ইতিমধ্যে শ্যামাসুন্দরী হাঁপাতে হাঁপাতে মধুকে এসে জানালে, “বউ মূর্ছো গেছে।” মধুসূদনের মনটা দপ করে জ্বলে উঠল; বললে, “কেন, তাঁর হয়েছে কী ?”

"তা তো বলতে পারি নে, দাদা দাদা করেই বউ হেদিয়ে গেল। তা একবার কি দেখতে যাবে ?"

"কী হবে! আমি তো ওর দাদা নই।"

"মিছে রাগ করছ ঠাকুরপো, ওরা বড়োঘরের মেয়ে, পোষ মানতে সময় লাগবে।"

"রোজ রোজ উনি মূর্ছো যাবেন আর আমি ওঁর মাথায় কবিরাজি তেল মালিস করব এই জন্যেই কি ওঁকে বিয়ে করেছিলুম ?"

"ঠাকুরপো তোমার কথা শুনে হাসি পায়। তা দোষ হয়েছে কী, আমাদের কালে কথায় কথায় মানিনীর মান ভাঙাতে হত, এখন না হয় মূর্ছো ভাঙাতে হবে।"

মধুসূদন গোঁ হয়ে বসে রইল। শ্যামাসুন্দরী বিগলিত করুণায় কাছে এসে হাত ধরে বললে, "ঠাকুরপো অমন মন খারাপ ক'রো না, দেখে সইতে পারি নে।"

মধুসূদনের এত কাছে গিয়ে ওকে সান্ত্বনা দেয় ইতিপূর্বে এমন সাহস শ্যামার ছিল না। প্রগল্‌ভা শ্যামা ওর কাছে ভারি চুপ করে থাকত; জানত মধুসূদন বেশি কথা সইতে পারে না। মেয়েদের সহজ বুদ্ধি থেকে শ্যামা বুঝেছে মধুসূদন আজ সে-মধুসূদন নেই। আজ ও দুর্বল, নিজের মর্যাদা সম্বন্ধে সতর্কতা ওর নেই। মধুর হাতে হাত দিয়ে বুঝল এটা ওর খারাপ লাগে নি। নববধূ ওর অভিমানে যে ঘা দিয়েছে, কোনো একটা জায়গা থেকে চিকিৎসা পেয়ে ভিতরে ভিতরে একটু আরাম বোধ হয়েছে। শ্যামা অন্তত ওকে অনাদর করে না এটা তো নিতান্ত তুচ্ছ কথা নয়। শ্যামা কি কুমুর চেয়ে কম সুন্দরী, না হয় ওর রং একটু কালো,—কিন্তু ওর চোখ, ওর চুল, ওর রসালো ঠোঁট !

শ্যামা বলে উঠল, "ওই আসছে বউ, আমি যাই ভাই। কিন্তু দেখো ওর সঙ্গে রাগারাগি ক'রো না, আহা, ও ছেলেমানুষ!"

কুমু ঘরে ঢুকতেই মধুসূদন আর থাকতে পারলে না, বলে উঠল, "বাপের বাড়ি থেকে মূর্ছো অভ্যেস করে এসেছ বুঝি? কিন্তু আমাদের এখানে ওটা চলতি নেই। তোমাদের ওই নুরনগরি চাল ছাড়তে হবে।"

কুমু নির্নিমেষ চোখ মেলে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, একটি কথাও বললে না।

মধুসূদন ওর মৌন দেখে আরও রেগে গেল। মনের গভীর তলায় এই মেয়েটির মন পাবার জন্যে একটা আকাঙ্ক্ষা জেগেছে বলেই ওর এই তীব্র নিষ্ফল রাগ। বলে উঠল, "আমি কাজের লোক, সময় কম, হিসটিরিয়া-ওআলী মেয়ের খেদমদগারি করবার ফুরসত আমার নেই, এই স্পষ্ট বলে দিচ্ছি।"

কুমু ধীরে ধীরে বললে, "তুমি আমাকে অপমান করতে চাও? হার মানতে হবে। তোমার অপমান মনের মধ্যে নেব না।"

কুমু কাকে এ-সব কথা বলছে? ওর বিস্ফারিত চোখের সামনে কে দাঁড়িয়ে আছে? মধুসূদন অবাক হয়ে গেল, ভাবলে এ-মেয়ে ঝগড়া করে না কেন? এর ভাবখানা কী?

মধুসূদন বক্রোক্তি করে বললে, "তুমি তোমার দাদার চেলা, কিন্তু জেনে রেখো, আমি তোমার সেই দাদার মহাজন, তাকে এক হাটে কিনে আর-এক হাটে বেচতে পারি।"

ও যে কুমুর দাদার চেয়ে শ্রেষ্ঠ এ-কথা কুমুর মনে দেগে দেবার জন্যে মূঢ় আর কোনো কথা খুঁজে পেলে না।

কুমু বললে, "দেখো, নিষ্ঠুর হও তো হ'য়ো, কিন্তু ছোটো হ'য়ো না।" বলে সোফার উপর বসে পড়ল।

কর্কশস্বরে মধুসূদন বলে উঠল, "কী! আমি ছোটো! আর তোমার দাদা আমার চেয়ে বড়ো?"

কুমু বললে, "তোমাকে বড়ো জেনেই তোমার ঘরে এসেছি।"

মধুসূদন ব্যঙ্গ করে বললে, "বড়ো জেনেই এসেছ, না, টাকার লোভে?"

তখন কুমু সোফা থেকে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরে খোলা ছাদে মেজের উপর গিয়ে বসল।

কলকাতায় শীতকালের কৃপণ রাত্রি, ধোঁয়ায় কুয়াশায় ঘোলা, আকাশ অপ্রসন্ন, তারার আলো যেন ভাঙা গলার কথার মতো। কুমুর মন তখন অসাড়, কোনো ভাবনা নেই, কোনো বেদনা নেই। একটা ঘন কুয়াশার মধ্যে সে যেন লুপ্ত হয়ে গেছে।

কুমু যে এমন করে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে যাবে মধুসূদন এ একেবারে ভাবতেই পারে নি। নিজের এই পরাভবের জন্যে সকলের চেয়ে রাগ হচ্ছে কুমুর দাদার উপর। শোবার ঘরে চৌকির উপরে বসে পড়ে শূন্য আকাশের দিকে সে একটা ঘুষি নিক্ষেপ করলে। খানিকক্ষণ বসে থেকে ধৈর্য আর রাখতে পারলে না। ধড়ফড় করে উঠে ছাদে বেরিয়ে ওর পিছনে গিয়ে ডাকলে, "বড়োবউ।"

কুমু চমকে উঠে পিছন ফিরে দাঁড়ালে।

"ঠাণ্ডায় হিমে বাইরে এখানে দাঁড়িয়ে কী করছ? চলো ঘরে।"

কুমু অসংকোচে মধুসূদনের মুখের দিকে চেয়ে রইল। মধুসূদনের মধ্যে যেটুকু প্রভুত্বের জোর ছিল তা গেল উড়ে। কুমুর বাঁ হাত ধরে আস্তে আস্তে বললে, "এস ঘরে।"

কুমুর ডানহাতে তার দাদার আশীর্বাদের সেই টেলিগ্রাম ছিন্ন সোট সে বুকে চেপে ধরল। স্বামীর হাত থেকে হাত টেনে নিলে না, নীরবে ধীরে ধীরে শোবার ঘরে ফিরে গেল।

২৬

পরদিন ভোরে যখন কুমু বিছানায় উঠে বসেছে তখন ওর স্বামী ঘুমোচ্ছে। কুমু তার মুখের দিকে চাইলে না, পাছে মন বিগড়ে যায়। অতি সাবধানে উঠে পায়ের কাছে প্রণাম করলে, তার পরে স্নান করবার ঘরে গেল। স্নান সারা হলে পর পিছন দিকের দরজা খুলে গিয়ে বসল ছাদে, কুয়াশার ভিতর দিয়ে পূর্ব-আকাশে একটা মলিন সোনার রেখা তখন দেখা দিয়েছে।

বেলা হল, রোদ্দুর উঠল যখন, কুমু আস্তে আস্তে শোবার ঘরে ফিরে এসে দেখলে তার স্বামী তখন চলে গেছে। আয়নার দেরাজের উপর তার পুঁতির কাজ-করা থলিটি ছিল। তার মধ্যে দাদার টেলিগ্রামের কাগজটি রাখবার জন্যে সেটা খুলেই দেখতে পেলে সেই নীলার আংটি নেই।

সকালবেলাকার মানসপূজার পর তার মুখে যে একটি শান্তির ভাব এসেছিল সেটা মিলিয়ে গিয়ে চোখে আগুন জ্বলে উঠল। কিছু মিষ্টি ও দুধ খাওয়াবে বলে ডাকতে এল মোতির মা। কুমুর মুখে জবাব নেই, যেন কঠিন পাথরের মূর্তি।

মোতির মা ভয় পেয়ে পাশে এসে বসল— জিজ্ঞাসা করলে, "কী হয়েছে, ভাই ?" কুমুর মুখে কথা বেরোল না, ঠোঁট কাঁপতে লাগল।

"বলো, দিদি, আমাকে বলো, কোথায় তোমার বেজেছে ?"

কুমু রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে বললে, "নিয়ে গেছে চুরি করে !"

"কী নিয়ে গেছে দিদি ?"

"আমার আংটি, আমার দাদার আশীর্বাদী আংটি।"

"কে নিয়ে গেছে ?"

কুমু উঠে দাঁড়িয়ে কারও নাম না করে বাইরের অভিমুখে ইঙ্গিত করলে।

"শান্ত হও ভাই, ঠাট্টা করেছে তোমার সঙ্গে, আবার ফিরিয়ে দেবে।"

"নেব না ফিরিয়ে— দেখব কত অত্যাচার করতে পারে ও!"

"আচ্ছা, সে হবে পরে, এখন মুখে কিছু দেবে এস।"

"না, পারব না; এখানকার খাবার গলা দিয়ে নাববে না।"

"লক্ষ্মীটি ভাই, আমার খাতিরে খাও।"

"একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আজ থেকে আমার নিজের বলে কিছুই রইল না?"

"না, রইল না। যা-কিছু রইল তা স্বামীর মর্জির উপরে। জান না চিঠিতে দাসী বলে দস্তখত করতে হবে।"

দাসী! মনে পড়ল, রঘুবংশের ইন্দুমতীর কথা—

গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ
প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ—

ফর্দের মধ্যে দাসী তো কোথাও নেই। সত্যবানের সাবিত্রী কি দাসী? কিংবা উত্তররামচরিতের সীতা?

কুমু বললে, "স্ত্রী যাদের দাসী তারা কোন্ জাতের লোক?"

"ও-মানুষকে এখনও চেন নি। ও যে কেবল অন্যকে গোলামি করায় তা নয়, নিজের গোলামি নিজে করে। যেদিন আপিসে যেতে পারে না নিজের বরাদ্দ থেকে সেদিনকার টাকা কাটা পড়ে। একবার ব্যামো হয়ে এক মাসের বরাদ্দ বন্ধ ছিল, তার পরের দু-তিন মাস খাইখরচ পর্যন্ত কমিয়ে লোকসান পুষিয়ে নিয়েছে। এতদিন আমি ঘরকন্নার কাজ চালিয়ে আসছি সেই অনুসারে আমারও মাসহারা বরাদ্দ। আত্মীয় বলে ও কাউকে মানে না। এ-বাড়িতে কর্তা থেকে চাকর-চাকরানী পর্যন্ত সবাই গোলাম।"

কুমু একটু চুপ করে থেকে বললে, "আমি সেই গোলামিই করব। আমার রোজকার খোরপোশ হিসেবমতো রোজ রোজ শোধ করব। আমি এ-বাড়িতে বিনা মাইনের স্ত্রী বাঁদী হয়ে থাকব না। চলো, আমাকে কাজে ভরতি করে নেবে। ঘরকন্নার ভার তোমার উপরেই তো,—আমাকে তুমি তোমার অধীনে খাটিয়ে নিয়ো, আমাকে রানী বলে কেউ যেন ঠাট্টা না করে।"

মোতির মা হেসে কুমুর চিবুক ধরে বললে, "তাহলে তো আমার কথা মানতে হবে। আমি হুকুম করছি ; চলো এখন খেতে।"

ঘর থেকে বেরোতে বেরোতে কুমু বললে, "দেখো ভাই, নিজেকে দেব বলেই তৈরি হয়ে এসেছিলুম, কিন্তু ও কিছুতেই দিতে দিলে না। এখন দাসী নিয়েই থাকুক। আমাকে পাবে না।"

মোতির মা বললে, "কাঠুরে গাছকে কাটতেই জানে, সে গাছ পায় না কাঠ পায়। মালী গাছকে রাখতে জানে, সে পায় ফুল, পায় ফল। তুমি পড়েছ কাঠুরের হাতে, ও যে ব্যবসাদার। ওর মনে দরদ নেই কোথাও।"

এক সময়ে শোবার ঘরে ফিরে এসে কুমু দেখলে, তার টিপাইয়ের উপর একশিশি লজেঞ্জস। হাবলু তার ত্যাগের অর্ঘ্য গোপনে নিবেদন করে নিজে কোথায় লুকিয়েছে। এখানে পাষাণের ফাঁক দিয়েও ফুল ফোটে। বালকের এই লজেঞ্জসের ভাষায় একসঙ্গে ওকে কাঁদালে হাসালে। তাকে খুঁজতে বেরিয়ে দেখে বাইরে সে দরজার আড়ালে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। মা তাকে এ ঘরে যাতায়াত করতে বারণ করেছিল। তার ভয় ছিল পাছে কোনো কিছু উপলক্ষ্যে কর্তার বিরক্তি ঘটে। মোটের উপরে, মধুসূদনের নিজের কাজ ছাড়া অন্য বাবদে তার কাছ থেকে সম্পূর্ণ দূরে থাকাই নিরাপদ, এ-কথা এ-বাড়ির সবাই জানে।

কুমু হাবলুকে ধরে ঘরে নিয়ে এসে কোলে বসালে। ওর গৃহসজ্জার মধ্যে পুতুল-জাতীয় যা-কিছু জিনিস ছিল সেইগুলো দুজনে নাড়াচাড়া করতে লাগল। কুমু বুঝতে পারলে একটা কাগজচাপা হাবলুর ভারি পছন্দ— কাঁচের ভিতর দিয়ে রঙিন ফুল যে কী করে দেখা যাচ্ছে সেইটে বুঝতে না পেরে ওর ভারি তাক লেগেছে।

কুমু বললে, "এটা নেবে গোপাল?"

এতবড়ো অভাবনীয় প্রস্তাব ওর বয়সে কখনো শোনে নি। এমন জিনিসও কি ও কখনো আশা করতে পারে? বিস্ময়ে সংকোচে কুমুর মুখের দিকে নীরবে চেয়ে রইল।

কুমু বললে, "এটা তুমি নিয়ে যাও।"

হাবলু আহ্লাদ রাখতে পারলে না— সেটা হাতে নিয়েই লাফাতে লাফাতে ছুটে চলে গেল।

সেইদিন বিকেলে হাবলুর মা এসে বললে, "তুমি করেছ কী ভাই? হাবলুর হাতে কাঁচের কাগজচাপা দেখে বড়ঠাকুর হুলস্থূল বাধিয়ে দিয়েছে। কেড়ে তো নিয়েইছে— তার পর তাকে চোর বলে মার। ছেলেটাও এমনি, তোমার নামও করে নি। হাবলুকে আমিই যে জিনিসপত্র চুরি করতে শেখাচ্ছি এ-কথাও ক্রমে উঠবে!"

কুমু কাঠের মূর্তির মতো শক্ত হয়ে বসে রইল।

এমন সময়ে বাইরে মচ মচ শব্দে মধুসূদন আসছে। মোতির মা তাড়াতাড়ি পালিয়ে গেল। মধুসূদন কাঁচের কাগজচাপা হাতে করে যথাস্থানে ধীরে ধীরে সেটা গুছিয়ে রাখলে। তার পরে নিশ্চিতপ্রত্যয়ের কণ্ঠে শান্ত গম্ভীর স্বরে বললে, "হাবলু তোমার ঘর থেকে এটা চুরি করে নিয়েছিল। জিনিসপত্র সাবধান করে রাখতে শিখো।"

কুমু তীক্ষ্ণ স্বরে বললে, "ও চুরি করে নি।"

"আচ্ছা, বেশ, তাহলে সরিয়ে নিয়েছে।"

"না, আমিই ওকে দিয়েছি।"

"এমনি করে ওর মাথা খেতে বসেছ বুঝি? একটা কথা মনে রেখো, আমার হুকুম ছাড়া জিনিসপত্র কাউকে দেওয়া চলবে না। আমি এলো-মেলো কিছুই ভালোবাসি নে।"

কুমু দাঁড়িয়ে উঠে বললে, "তুমি নাও নি আমার নীলার আংটি?"

মধুসূদন বললে, "হাঁ নিয়েছি।"

"তাতেও তোমার ওই কাঁচের ঢেলাটার দাম শোধ হল না?"

"আমি তো বলেছিলুম, ওটা তুমি রাখতে পারবে না।"

"তোমার জিনিস তুমি রাখতে পারবে, আর আমার জিনিস আমি রাখতে পারব না?"

"এ-বাড়িতে তোমার স্বতন্ত্র জিনিস বলে কিছু নেই।"

"কিছু নেই? তবে রইল তোমার এই ঘর পড়ে।"

কুমু যেই গেছে, ব্যস্তসমস্ত হয়ে শ্যামা ঘরে প্রবেশ করে বললে, "বউ কোথায় গেল?"

"কেন?"

"সকাল থেকে ওর খাবার নিয়ে বসে আছি, এ-বাড়িতে এসে বউ কি খাওয়াও বন্ধ করবে?"

"তা হয়েছে কী? নুরনগরের রাজকন্যা না হয় নাই খেলেন? তোমরা কি ওঁর বাঁদী নাকি।"

"ছি ঠাকুরপো, ছেলেমানুষের উপর অমন রাগ করতে নেই। ও যে এমন না খেয়ে খেয়ে কাটাবে এ আমরা সহ্য করতে পারি নে। সাধে সেদিন মূর্ছো গিয়েছিল?"

মধুসূদন গর্জন করে উঠল, "কিছু করতে হবে না, যাও চলে! খিদে পেলে আপনিই খাবে।"

শ্যামা যেন অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে চলে গেল।

মধুসূদনের মাথায় রক্ত চড়তে লাগল। দ্রুতবেগে নাবার ঘরে জলের ঝাঁঝরি খুলে দিয়ে তার নিচে মাথা পেতে দিলে।

২৭

সন্ধ্যে হয়ে এল, সেদিন কুমুকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। শেষকালে দেখা গেল, ভাঁড়ারঘরের পাশে একটা ছোটো কোণের ঘরে যেখানে প্রদীপ পিলসুজ তেলের ল্যাম্প প্রভৃতি জমা করা হয় সেইখানে মেজের উপর মাদুর বিছিয়ে বসে আছে।

মোতির মা এসে জিজ্ঞাসা করলে, "এ কী কাণ্ড দিদি?"

কুমু বললে, "এ-বাড়িতে আমি সেজবাতি সাফ করব, আর এইখানে আমার স্থান।"

মোতির মা বললে, "ভালো কাজ নিয়েছ ভাই, এ-বাড়ি তুমি আলো করতেই তো এসেছ, কিন্তু সে-জন্যে তোমাকে সেজবাতির তদারক করতে হবে না। এখন চলো।"

কুমু কিছুতে নড়ল না।

মোতির মা বললে, "তবে আমি তোমার কাছে শুই।"

কুমু দৃঢ়স্বরে বললে, "না।" মোতির মা দেখলে এই ভালোমানুষ-মেয়ের মধ্যে হুকুম করবার জোর আছে। তাকে চলে যেতে হল।

মধুসূদন রাত্রে শুতে এসে কুমুর খবর নিলে। যখন খবর শুনলে, প্রথমটা ভাবলে, "বেশ তো ওই ঘরেই থাক্ না, দেখি কতদিন থাকতে পারে। সাধ্যসাধনা করতে গেলেই জেদ বেড়ে যাবে।"

এই বলে আলো নিবিয়ে দিয়ে শুতে গেল। কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসে না। প্রত্যেক শব্দেই মনে হচ্ছে ওই বুঝি আসছে। একবার মনে হল, যেন দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। বিছানা ছেড়ে বেরিয়ে এসে দেখে কেউ কোথাও নেই। যতই রাত হয় মনের মধ্যে ছটফট করতে থাকে। কুমুকে যে অবজ্ঞা করবে কিছুতেই সে-শক্তি পাচ্ছে না। অথচ নিজে এগিয়ে গিয়ে তার কাছে হার মানবে এটা ওর পলিসি-বিরুদ্ধ। ঠাণ্ডা জল দিয়ে মুখ ধুয়ে এসে শুল, কিন্তু ঘুম আসে না। ছটফট করতে করতে উঠে পড়ল, কোনোমতেই কৌতূহল সামলাতে পারলে না। একটা লণ্ঠন হাতে করে নিদ্রিত কক্ষশ্রেণী নিঃশব্দপদে পার হয়ে অন্তঃপুরের সেই ফরাশখানার সামনে এসে একটুক্ষণ কান পেতে রইল, ভিতরে কোনো সাড়াশব্দ নেই। সাবধানে দরজা খুলে দেখে, কুমু মেজের উপর একটা মাদুর পেতে শুয়ে, সেই মাদুরের এক প্রান্ত গুটিয়ে সেইটেকে বালিশ করেছে। মধুসূদনের যেমন ঘুম নেই, কুমুরও তেমনি ঘুম না থাকাই উচিত ছিল, কিন্তু দেখলে সে অকাতরে ঘুমোচ্ছে; এমন কি তার মুখের উপর যখন লণ্ঠনের আলো ফেললে তাতেও ঘুম ভাঙল না। এমন সময় কুমু একটুখানি উসখুস করে পাশ ফিরলে। গৃহস্থের জাগার লক্ষণ দেখে চোর যেমন করে পালায় মধুসূদন তেমনি তাড়াতাড়ি পালাল। ভয় হল পাছে কুমু ওর পরাভব দেখতে পায়, পাছে মনে-মনে হাসে।

বাতির ঘর থেকে মধুসূদন বেরিয়ে এসে বারান্দা বেয়ে খানিকটা যেতেই সামনে দেখে শ্যামা। তার হাতে একটি প্রদীপ।

"একি ঠাকুরপো, এখানে কোথা থেকে এলে?"

মধুসূদন তার কোনো উত্তর না করে বললে, "তুমি কোথায় যাচ্ছ বউ?"

"কাল যে আমার ব্রত, ব্রাহ্মণভোজন করাতে হবে তারই জোগাড়ে

চলেছি— তোমারও নেমন্তন্ন রইল। কিন্তু তোমাকে দক্ষিণে দেবার মতো শক্তি নেই ভাই।"

মধুসূদনের মুখে একটা জবাব আসছিল, সেটা চেপে গেল।

সেই শেষরাত্রের অন্ধকারে প্রদীপের আলোয় শ্যামাকে সুন্দর দেখাচ্ছিল। শ্যামা একটু হেসে বললে, "আজ ঘুম থেকে উঠেই তোমার মতো ভাগ্যবান পুরুষের মুখ দেখলুম, আমার দিন ভালোই যাবে। ব্রত সফল হবে।"

ভাগ্যবান শব্দটার উপর একটু জোর দিলে— মধুসূদনের কানে কথাটা বিড়ম্বনার মতো শোনাল। কুমুর সম্বন্ধে কোনো কথা স্পষ্ট করে জিজ্ঞাসা করতে শ্যামার সাহস হল না। "কাল কিন্তু আমার ঘরে খেতে এসো, মাথা খাও," বলে সে চলে গেল।

ঘরে এসে মধুসূদন বিছানায় শুয়ে পড়ল। বাইরে লণ্ঠনটা রাখলে, যদি কুমু আসে। কুমুদিনীর সেই সুপ্ত মুখ কিছুতে মন থেকে নড়তে চায় না; আর কেবলই মনে পড়ে কুমুর অতুলনীয় সেই হাতখানি শালের বাইরে এলিয়ে। বিবাহকালে এই হাত যখন নিজের হাতে নিয়েছিল তখন একে সম্পূর্ণ দেখতে পায় নি— আজ দেখে-দেখে চোখের আর আশ মিটতে চায় না। এই হাতের অধিকারটি সে কবে পাবে? বিছানায় আর টিঁকতে পারে না; উঠে পড়ল। আলো জ্বালিয়ে কুমুর ডেস্কের দেরাজ খুললে। দেখলে সেই পুঁতি-গাঁথা থলিটি। প্রথমেই বেরোল বিপ্রদাসের টেলিগ্রামখানি— "ঈশ্বর তোমাকে আশীর্বাদ করুন"— তার পরে একখানি ফটোগ্রাফ, ওর দুই দাদার ছবি— আর একখানি কাগজের টুকরো, বিপ্রদাসের হাতে-লেখা গীতার এই শ্লোক—

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ,
যৎ তপস্যসি, কৌন্তেয়, তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্।

ঈর্ষায় মধুসূদনের মন ক্ষতবিক্ষত হতে লাগল। দাঁতে দাঁতে লাগিয়ে বিপ্রদাসকে মনে-মনে লোপ করে দিলে। সেই লুপ্তির দিন একদা আসবে ও নিশ্চয় জানে— অল্প অল্প করে স্ক্রু আঁটতে হবে; কিন্তু কুমুদিনীর যে-উনিশটা বছর মধুসূদনের আয়ত্তের বাইরে, সেইটে বিপ্রদাসের হাত থেকে এই মুহূর্তেই ছিনিয়ে নিতে পারলে তবেই ও মনে শান্তি পায়। আর-কোনো রাস্তা জানে না জবরদস্তি ছাড়া। পুঁতির থলিটি আজ সাহস করে ফেলে দিতে পারলে না— যেদিন আংটি হরণ করে নিয়েছিল সেদিন ওর সাহস আরও বেশি ছিল। তখনও জানত কুমুদিনী সাধারণ মেয়েরই মতো সহজেই শাসনের অধীন, এমন কি, শাসনই পছন্দ করে। আজ বুঝেছে কুমুদিনী যে কী করতে পারে এবং পারে না কিচ্ছু বলবার জো নেই।

কুমুদিনীকে নিজের জীবনের সঙ্গে শক্ত বাঁধনে জড়াবার একটি মাত্র রাস্তা অছে সে কেবল সন্তানের মায়ের রাস্তা। সেই কল্পনাতেই ওর সান্ত্বনা।

এমনি করে ঘড়িতে পাঁচটা বাজল। কিন্তু শীতরাত্রির অন্ধকার তখনও যায় নি। আর কিছুক্ষণ পরেই আলো উঠবে, আজকের রাত্ত হবে ব্যর্থ। মধুসূদন তাড়াতাড়ি ঘর ছেড়ে চলল— ফরাশখানার সামনে পায়ের শব্দটা বেশ একটু স্পষ্টই ধ্বনিত করলে— দরজাটা শব্দ করেই খুললে— দেখলে ভিতরে কুমু নেই। কোথায় সে?

উঠোনের কলে জল-পড়ার শব্দ কানে এল। বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখলে, যত রাজ্যের পুরানো অব্যবহার্য মরচে-পড়া পিলসুজগুলো নিয়ে কুমু তেঁতুল দিয়ে মাজছে। এ কেবল ইচ্ছা করে কাজের ভার বাড়াবার চেষ্টা, শীতের ভোরবেলার নিদ্রাহীন দুঃখকে বিস্তারিত করে তোলা।

মধুসূদন উপরের বারান্দা থেকে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। অবলার বলকে কী করে পরাস্ত করতে হয় এই তার ভাবনা। সকালে উঠে বাড়ির লোকে যখন দেখবে কুমু পিলসুজ মাজছে কী ভাববে। যে চাকরের উপরে মাজাঘষার ভার, সেই বা কী মনে করবে? বিশ্বসুদ্ধ লোকের কাছে তাকে হাস্যাস্পদ করবার এমন তো উপায় আর নেই।

একবার মধুসূদনের মনে হল কলতলায় গিয়ে কুমুর সঙ্গে বোঝাপড়া করে নেয়। কিন্তু সকালবেলায় সেই উঠানের মাঝখানে দুজনে বচসা করবে আর বাড়িসুদ্ধ লোকে তামাশা দেখতে বিছানা ছেড়ে বেরিয়ে আসবে এই প্রহসনটা কল্পনা করে পিছিয়ে গেল। মেজো ভাই নবীনকে ডাকিয়ে বললে, "বাড়িতে কী সব ব্যাপার হচ্ছে চোখ রাখ কি?"

নবীন ছিল বাড়ির ম্যানেজার। সে ভয় পেয়ে বললে, "কেন দাদা, কী হয়েছে?"

নবীন জানে, দাদার যখন রাগ করবার একটা কারণ ঘটে তখন শাসন করবার একটা মানুষ চাই। দোষী যদি ফসকে যায় তো নির্দোষী হলেও চলে,— নইলে ডিসিপ্লিন থাকে না, নইলে সংসারে ওর রাষ্ট্রতন্ত্রের প্রেস্‌টীজ চলে যায়।

মধুসূদন বললে, "বড়োবউ যে পাগলের মতো কাণ্ডটা করতে বসেছে, তার কারণটা কী সে কি আমি জানি নে মনে কর?"

বড়োবউ কী পাগলামি করছে সে-প্রশ্ন করতে নবীন সাহস করলে না পাছে খবর না-জানাটাই একটা অপরাধ বলে গণ্য হয়।

মধুসূদন বললে, "মেজোবউ ওর মাথা বিগড়োতে বসেছেন সন্দেহ নেই।"

বহু সংকোচে নবীন বলতে চেষ্টা করলে, "না, মেজোবউ তো—"

মধুসূদন বললে, "আমি স্বচক্ষে দেখেছি।"

এর উপরে আর কথা খাটে না। স্বচক্ষে দেখার মধ্যে সেই কাগজ-চাপার ইতিহাসটা নিহিত ছিল।

২৮

মোতির মা যখনই কুমুকে অকৃত্রিম ভালোবাসার সঙ্গে আদরযত্ন করতে প্রবৃত্ত হয়েছিল তখনই নবীন বুঝেছিল এটা সইবে না; বাড়ির মেয়েরা এই নিয়ে লাগালাগি করবে। নবীন ভাবলে সেই রকমের একটা কিছু ঘটেছে। কিন্তু মধুসূদনের আন্দাজি অভিযোগ সম্বন্ধে প্রতিবাদ করে কোনো লাভ নেই; তাতে জেদ বাড়িয়ে দেওয়া হয়।

ব্যাপারটা কী হয়েছে মধুসূদন তা স্পষ্ট করে বললে না— বোধ করি বলতে লজ্জা করছিল; কী করতে হবে তাও রইল অস্পষ্ট, কেবল ওর মধ্যে যেটুকু স্পষ্ট সে হচ্ছে এই যে, সমস্ত দায়িত্বটা মেজোবউয়েরই, সুতরাং দাম্পত্যের আপেক্ষিক মর্যাদা অনুসারে জবাবদিহির ল্যাজামুড়োর মধ্যে মুড়োর দিকটাই নবীনের ভাগ্যে।

নবীন গিয়ে মোতির মাকে বললে, "একটা ফ্যাসাদ বেধেছে।"

"কেন, কী হয়েছে?"

"সে জানেন অন্তর্যামী, আর দাদা, আর সম্ভবত তুমি; কিন্তু তাড়া আরম্ভ হয়েছে আমার উপরেই।"

"কেন বলো দেখি?"

"যাতে আমার দ্বারা তোমার সংশোধন হয়, আর তোমার দ্বারা সংশোধন হয় ওঁর নতুন ব্যবসায়ের নতুন আমদানির।"

"তা আমার উপরে তোমার সংশোধনের কাজটা শুরু করো— দেখি দাদার চেয়ে তোমার হাতযশ আছে কি না।"

নবীন কাতর হয়ে বললে, "দাদার উড়ে চাকরটা ওঁর জার্মান ডিনার-সেটের একটা পিরিচ ভেঙেছিল, তার জরিমানার প্রধান অংশ আমাকে দিতে হয়েছে, জান তো,— কেন না জিনিসগুলো আমারই জিম্মে। কিন্তু এবারে যে-জিনিসটা ঘরে এল সেও কি আমারই জিম্মে? তবু জরিমানাটা তোমাতে-আমাতেই বাঁটোয়ারা করে দিতে হবে। অতএব যা করতে হয় করো, আমাকে আর দুঃখ দিও না মেজোবউ।"

"জরিমানা বলতে কী বোঝায় শুনি।"

"রজবপুরে চালান করে দেবেন। মাঝে মাঝে তো সেইরকম ভয় দেখান।"

"ভয় পাও বলেই ভয় দেখান! একবার তো পাঠিয়েছিলেন, আবার রেলভাড়া দিয়ে ফিরিয়ে আনতে হয় নি? তোমার দাদা রেগেও হিসেবে ভুল করেন না। জানেন আমাকে ঘরকন্না থেকে বরখাস্ত করলে সেটা একটুও সস্তা হবে না। আর যদি কোথাও এক পয়সাও লোকসান হয় সে-ঠকা ওঁর সইবে না।"

"বুঝলুম, এখন কী করতে হবে বলো না।"

"তোমার দাদাকে ব'লো, যতবড়ো রাজাই হন না, মাইনে করে লোক রেখে রানীর মান ভাঙাতে পারবেন না— মানের বোঝা নিজেকেই মাথায় করে নামাতে হবে। বাসরঘরের ব্যাপারে মুটে ডাকতে বারণ কোরো।"

"মেজোবউ, উপদেশ তাঁকে দেবার জন্যে আমার দরকার হবে না, দুদিন বাদে নিজেরই হুঁশ হবে। ইতিমধ্যে দূতীগিরির কাজটা করো, ফল হোক বা না হোক। দেখাতে পারব নিমক খেয়ে সেটা চুপচাপ হজম করছি নে।"

মোতির মা কুমুকে গেল খুঁজতে। জানত সকালবেলা তাকে পাওয়া যাবে ছাদের উপরে। উঁচু প্রাচীর-দেওয়া ছাদ, তার মাঝে মাঝে ঘুলঘুলি।

এলোমেলো গোটাকতক টব, তাতে গাছ নেই। এক কোণে লোহার জাল-দেওয়া একটা বড়ো ভাঙা চৌকো খাঁচা; তার কাঠের তলাটা প্রায় সবটা জীর্ণ। কোনো এক সময় খরগোশ কিংবা পায়রা এতে রাখা হত,— এখন আচার-আমসত্ত্ব প্রভৃতিকে কাকের চৌর্যবৃত্তি থেকে বাঁচিয়ে রোদ্দুরে দেবার কাজে লাগে। এই ছাদ থেকে মাথার উপরকার আকাশ দেখতে পাওয়া যায়, দিগন্ত দেখা যায় না। পশ্চিম-আকাশে একটা লোহার কারখানার চিমনি। যে-তুদিন কুমু এই ছাদে বসেছে ওই চিমনি থেকে উৎসারিত ধূমকুণ্ডলটাই তার একমাত্র দেখবার জিনিস ছিল— সমস্ত আকাশের মধ্যে ওই কেবল একটি যেন সজীব পদার্থ, কোন্ একটা আবেগে ফুলে ফুলে পাক দিয়ে দিয়ে উঠছে।

পিলসুজ প্রভৃতি মাজা সেরে অন্ধকার থাকতেই স্নান করে পুবদিকে মুখ করে কুমু ছাদে এসে বসেছে। ভিজে চুল পিঠের উপর এলিয়ে দেওয়া,— সাজসজ্জার কোনো আভাসমাত্র নেই। একখানি মোটা সুতোর সাদা শাড়ি, সরু কালো পাড়, আর শীতনিবারণের জন্য একটা মোটা এণ্ডি-রেশমের ওড়না।

কিছুদিন থেকে প্রত্যাশিত প্রিয়তমের কাল্পনিক আদর্শকে অন্তরের মাঝখানে রেখে এই যুবতী আপন হৃদয়ের ক্ষুধা মেটাতে বসেছিল। তার যত পূজা যত ব্রত যত পুরাণকাহিনী সমস্তই এই কল্পমূর্তিকে সজীব করে রেখেছিল। সে ছিল অভিসারিণী তার মানস-বৃন্দাবনে,— ভোরে উঠে সে গান গেয়েছে রামকেলী রাগিণীতে—

> হমারে তুমারে সম্প্রীতি লগী হৈ
> শুন মনমোহন প্যারে—

যে-অনাগত মানুষটির উদ্দেশে উঠছে তার আত্মনিবেদনের অর্ঘ্য, সমুখে এসে পৌঁছবার আগেই সে যেন ওর কাছে প্রতিদিন তার

পেয়ালা পাঠিয়ে দিয়েছে। বর্ষার রাত্রে খিড়কির বাগানের গাছগুলি অবিশ্রাম ধারাপতনের আঘাতে আপন পল্লবগুলিকে যখন উতরোল করেছে তখন কানাড়ার সুরে মনে পড়েছে তার ওই গান—

বাজে ঝননন মেরে পায়েরিয়া
কৈস করো যাউঁ ঘরোয়ারে।

আপন উদাস মনটার পায়ে পায়ে নূপুর বাজছে ঝননন— উদ্দেশ-হারা পথে বেরিয়ে পড়েছে, কোনোকালে ফিরবে কেমন করে ঘরে। যাকে রূপে দেখবে এমনি করে কতদিন থেকে তাকে সুরে দেখতে পাচ্ছিল। নিগূঢ় আনন্দ-বেদনার পরিপূর্ণতার দিনে যদি মনের মতো কাউকে দৈবাৎ সে কাছে পেত তাহলে অন্তরের সমস্ত গুঞ্জরিত গান-গুলি তখনই প্রাণ পেত রূপে। কোনো পথিক ওর দ্বারে এসে দাঁড়াল না। কল্পনার নিভৃত নিকুঞ্জগৃহে ও একেবারেই ছিল একলা। এমন কি, ওর সমবয়সী সঙ্গিনীও বিশেষ কেউ ছিল না। তাই এতদিন শ্যামসুন্দরের পায়ের কাছে ওর নিরুদ্ধ ভালোবাসা পূজার ফুল আকারে আপন নিরুদ্দিষ্ট দয়িতের উদ্দেশ খুঁজেছে। সেই জন্যেই ঘটক যখন বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে এল কুমু তখন তার ঠাকুরেরই হুকুম চাইলে— জিজ্ঞাসা করলে, "এইবার তোমাকেই তো পাব?" অপরাজিতার ফুল বললে, "এই তো পেয়েইছ।"

অন্তরের এতদিনের এত আয়োজন ব্যর্থ হল— একেবারে ঠন করে উঠল পাথরটা, ভরাডুবি হল এক মুহূর্তেই। ব্যথিত যৌবন আজ আবার খুঁজতে বেরিয়েছে, কোথায় দেবে তার ফুল! থালিতে যা ছিল তার অর্ঘ্য, সে যে আজ বিষম বোঝা হয়ে উঠল। তাই আজ এমন করে প্রাণপণে গাইছে, "মেরে গিরিধর গোপাল ঔর নাহি কোহী।"

কিন্তু আজ এ-গান শূন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে, পৌঁছল না কোথাও। এই শূন্যতায় কুমুর মন ভয়ে ভরে উঠল। আজ থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মনের গভীর আকাঙ্ক্ষা কি ওই ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মতোই কেবল সঙ্গিহীন নিঃশ্বসিত হয়ে উঠবে?

মোতির মা দূরে পিছনে বসে রইল। সকালের নির্মল আলোয় নির্জন ছাদে এই অসজ্জিতা সুন্দরীর মহিমা ওকে বিস্মিত করে দিয়েছে। ভাবছে, এ-বাড়িতে ওকে কেমন করে মানাবে? এখানে যে-সব মেয়ে আছে এর তুলনায় তারা কোন্ জাতের? তারা আপনি ওর থেকে পৃথক হয়ে পড়েছে, ওর উপরে রাগ করছে কিন্তু ওর সঙ্গে ভাব করতে সাহস করছে না।

বসে থাকতে থাকতে মোতির মা হঠাৎ দেখলে কুমু দুই হাতে তার ওড়নার আঁচল মুখে চেপে ধরে কেঁদে উঠেছে। ও আর থাকতে পারলে না, কাছে এসে গলা জড়িয়ে ধরে বলে উঠল, "দিদি আমার, লক্ষ্মী আমার, কী হয়েছে বলো আমাকে।"

কুমু অনেকক্ষণ কথা কইতে পারলে না। একটু সামলে নিয়ে বললে, "আজও দাদার চিঠি পেলুম না, কী হয়েছে তাঁর বুঝতে পারছি নে।"

"চিঠি পাবার কি সময় হয়েছে ভাই?"

"নিশ্চয় হয়েছে। আমি তাঁর অসুখ দেখে এসেছি। তিনি জানেন, খবর পাবার জন্যে আমার মনটা কী রকম করছে।"

মোতির মা বললে, "তুমি ভেবো না, খবর নেবার আমি একটা-কিছু উপায় করব।"

কুমু টেলিগ্রাফ করবার কথা অনেকবার ভেবেছে, কিন্তু কাকে দিয়ে করাবে। যেদিন মধুসূদন নিজেকে ওর দাদার মহাজন

বলে বড়াই করেছিল সেইদিন থেকে মধুসূদনের কাছে ওর দাদার উল্লেখমাত্র করতে ওর মুখে বেধে যায়। আজ মোতির মাকে বললে, "তুমি যদি দাদাকে আমার নামে টেলিগ্রাফ করতে পার তো আমি বাঁচি।"

মোতির মা বললে, "তাই করব, ভয় কী?"

কুমু বললে, "তুমি জান, আমার কাছে একটিও টাকা নেই।"

"কী বল, দিদি, তার ঠিক নেই। সংসারখরচের যে-টাকা আমার কাছে থাকে, সে তো তোমারই টাকা। আজ থেকে আমি যে তোমারই নিমক খাচ্ছি।"

কুমু জোর করে বলে উঠল, "না না না, এ-বাড়ির কিছুই আমার নয়, সিকি পয়সাও না।"

"আচ্ছা ভাই, তোমার জন্যে না হয়, আমার নিজের টাকা থেকে কিছু খরচ করব। চুপ করে রইলে কেন? তাতে দোষ কী? টাকাটা আমি যদি অহংকার করে দিতুম, তুমি অহংকার করে না নিতে পারতে। ভালোবেসে যদি দিই, তাহলে ভালোবেসেই নেবে না কেন?"

কুমু বললে, "নেব।"

মোতির মা জিজ্ঞাসা করলে, "দিদি, ! মার শোবার ঘর কি আজও শূন্য থাকবে?"

কুমু বললে, "ওখানে আমার জায়গা নেই।"

মোতির মা পীড়াপীড়ি করলে না। তার মনের ভাবখানা এই যে, পীড়াপীড়ি করবার ভার আমার নয়; যার কাজ সে করুক। কেবল আস্তে আস্তে সে বললে, "একটু দুধ এনে দেব তোমার জন্যে?"

কুমু বললে, "এখন না, আর একটু পরে।" তার ঠাকুরের সঙ্গে

বোঝাপড়া করতে এখনও বাকি আছে। এখনও মনের মধ্যে কোনো জবাব প্যাচ্ছে না।

মোতির মা আপন ঘরে গিয়ে নবীনকে ডেকে বললে, "শোনো একটি কথা। বড়ঠাকুরের বাইরের ঘরে তাঁর ডেস্কের উপর খোঁজ করে এস গে, দিদির কোনো চিঠি এসেছে কি না— দেরাজ খুলেও দেখো।"

নবীন বললে, "সর্বনাশ!"

"তুমি যদি না যাও তো আমি যাব।"

"এ যে ঝোপের ভিতর থেকে ভালুকের ছানা ধরতে পাঠানো।"

"কর্তা গেছেন আপিসে, তাঁর কাজ সেরে আসতে বেলা একটা হবে— এর মধ্যে—"

"দেখো মেজোবউ, দিনের বেলায় এ-কাজ কিছুতেই আমার দ্বারা হবে না, এখন চারিদিকে লোকজন। আজ রাত্রে তোমাকে খবর দিতে পারব।"

মোতির মা বললে, "আচ্ছা, তাই সই। কিন্তু নুরনগরে এখনই তার করে জানতে হবে বিপ্রদাসবাবু কেমন আছেন।"

"বেশ কথা, তা দাদাকে জানিয়ে করতে হবে তো?"

"না।"

"মেজোবউ, তুমি যে দেখি মরিয়া হয়ে উঠেছ? এ-বাড়িতে টিকটিকি মাছি ধরতে পারে না কর্তার হুকুম ছাড়া, আর আমি—"

"দিদির নামে তার যাবে তোমার তাতে কী?"

"আমার হাত দিয়ে তো যাবে।"

"বড়ঠাকুরের আপিসে ঢের তার তো রোজ দরোয়ানকে দিয়ে পাঠানো হয়, তার সঙ্গে এটা চালান দিয়ো। এই নাও টাকা, দিদি দিয়েছেন।"

কুমুর সম্বন্ধে নবীনের মনও যদি করুণায় ব্যথিত হয়ে না থাকত তাহলে এতবড়ো দুঃসাহসিক কাজের ভার সে কিছুতেই নিতে পারত না।

২৯

যথানিয়মে মধুসূদন বেলা একটার পরে অন্তঃপুরে খেতে এল। যথানিয়মে আত্মীয়-স্ত্রীলোকেরা তাকে ঘিরে বসে কেউ বা পাখা দিয়ে মাছি তাড়াচ্ছে, কেউ বা পরিবেষণ করছে। পূর্বেই বলেছি, মধুসূদনের অন্তঃপুরের ব্যবস্থায় ঐশ্বর্যের আড়ম্বর ছিল না। তার আহারের আয়োজন পুরানো অভ্যাসমতোই। মোটা চালের ভাত না হলে না মুখে রোচে, না পেট ভরে। কিন্তু পাত্রগুলি দামি। রুপোর থালা, রুপোর বাটি, রুপোর গ্লাস। সাধারণত কলাইয়ের ডাল, মাছের ঝোল, তেঁতুলের অম্বল, কাঁটাচচ্চড়ি হচ্ছে খাদ্যসামগ্রী; তার পরে সব-শেষে বড়ো একবাটি দুধ চিনি দিয়ে শেষ বিন্দু পর্যন্ত সমাধা করে পানের বাটায় মোটা এক ফোঁটা চুন সহযোগে একটা পান্ মুখে ও দুটো পান ডিবেয় ভরে পনেরো মিনিট কাল তামাক টানতে টানতে বিশ্রাম করে তৎক্ষণাৎ আপিসে প্রস্থান। অপেক্ষাকৃত দৈন্যদশা থেকে আজ পর্যন্ত সুদীর্ঘকাল এর আর ব্যতিক্রম হয় নি। আহারে মধুসূদনের ক্ষুধা আছে, লোভ নেই।

শ্যামাসুন্দরী দুধের বাটিতে চিনি ঘেঁটে দিচ্ছিল। অনুজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, মোটা বললে যা বোঝায় তা নয়, কিন্তু পরিপুষ্ট শরীর নিজেকে বেশ একটু যেন ঘোষণা করছে। একখানি সাদা শাড়ির বেশি গায়ে কাপড় নেই, কিন্তু দেখে মনে হয়, সর্বদাই পরিচ্ছন্ন। বয়স যৌবনের প্রায় প্রান্তে এসেছে, কিন্তু যেন জ্যৈষ্ঠের অপরাহ্ণের মতো, বেলা

যোগাযোগ

যায়-যায় তবু গোধূলির ছায়া পড়ে নি। ঘন ভুরুর নিচে তীক্ষ্ণ কালো চোখ কাউকে যেন সামনে থেকে দেখে না, অল্প একটু দেখে সমস্তটা দেখে নেয়। তার টসটসে ঠোঁটদুটির মধ্যে একটা ভাব আছে যেন অনেক কথাই সে চেপে রেখেছে। সংসার তাকে বেশি কিছু রস দেয় নি, তবু সে ভরা। সে নিজেকে দামি বলেই জানে, সে কৃপণও নয়, কিন্তু তার মহার্ঘ্যতা ব্যবহারে লাগল না বলে নিজের আশপাশের উপর তার একটা অহংকৃত অশ্রদ্ধা। মধুসূদনের ঐশ্বর্যের জোয়ারের মুখেই শ্যামা এ-সংসারে প্রবেশ করেছে। যৌবনের জাদুমন্ত্রে এই সংসারের চূড়ায় সে স্থান করে নেবে এমনও সংকল্প ছিল। মধুসূদনের মন যে কোনো দিন টলে নি তাও বলা যায় না। কিন্তু মধুসূদন কিছুতেই হার মানল না; তার কারণ, মধুসূদনের বিষয়বুদ্ধি কেবলমাত্র যে বুদ্ধি তা নয়, সে হচ্ছে প্রতিভা। এই প্রতিভার জোরে সম্পদ সে সৃষ্টি করেছে, আর সেই সৃষ্টির পরমানন্দে গভীর করে সে মগ্ন। এই প্রতিভার জোরেই সে নিশ্চয় জানত ধনসৃষ্টির যে-তপস্যায় সে নিযুক্ত ইন্দ্রদেব সেটা ভাঙবার জন্যে প্রবল বিঘ্ন পাঠিয়েছেন— ক্ষণে ক্ষণে তপোভঙ্গের ধাক্কা লেগেছে, বার বারই সে সামলে নিয়েছে। সুবিধা ছিল এই যে, ব্যবসায়ের ভরা মধ্যাহ্নে তার অবকাশমাত্র ছিল না। এই কঠিন পরিশ্রমের মাঝখানে চোখের দেখায় কানের শোনায় শ্যামার যে-সঙ্গটুকু নিঃসঙ্গভাবে পেত তাতে যেন মধুসূদনের ক্লান্তি দূর করত। ক্রিয়াকর্মের পার্বণী উপলক্ষ্যে শ্যামাসুন্দরীর দিকে তার পক্ষপাতের ভারটা একটু যেন বেশি করে ঝুঁকত বলে বোঝা যায়। কিন্তু কোনো দিন শ্যামাকে সে এতটুকু প্রশ্রয় দেয় নি অন্তঃপুরে যাতে তার স্পর্ধা বাড়ে। শ্যামা মধুসূদনের মনের ঝোঁকটি ঠিক ধরেছে, তবুও ওর সম্বন্ধে তার ভয় ঘুচল না

মধুসূদনের আহারের সময় শ্যামাসুন্দরী রোজই উপস্থিত থাকে; আজও ছিল। সদ্য স্নান করে এসেছে— তার অসামান্য কালো ঘন লম্বা চুল পিঠের উপর মেলে-দেওয়া— তার উপর দিয়ে অমলশুভ্র শাড়িটি মাথার উপর টেনে-দেওয়া— ভিজে চুল থেকে মাথাঘষা মসলার মৃদু গন্ধ আসছে।

দুধের বাটি থেকে মুখ না তুলে এক সময় আস্তে আস্তে বললে, "ঠাকুরপো, বউকে কি ডেকে দেব ?"

মধুসূদন কোনো কথা না বলে তার ভাজের মুখের দিকে গম্ভীরভাবে চাইলে। তার ভাজ শ্যামাসুন্দরী ভয়ে থতোমতো খেয়ে প্রশ্নটাকে ব্যাখ্যা করে বললে, "তোমার খাবার সময় কাছে বসলে হয় ভালো, তোমাকে একটু সেবা করতে—"

মধুসূদনের মুখের ভাবের কোনো অর্থ বুঝতে না পেরে শ্যামাসুন্দরী বাক্য শেষ না করেই চুপ করে গেল। মধুসূদন আবার মাথা হেঁট করে আহারে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে থালা থেকে মুখ না তুলেই জিজ্ঞাসা করলে, "বড়োবউ এখন কোথায় ?"

শ্যামাসুন্দরী ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল, "আমি দেখে আসছি।"

মধুসূদন ভ্রূকুঞ্চিত করে আঙুল নেড়ে নিষেধ করলে। প্রশ্নের যে-উত্তর পাবার আশা আছে সেটা এর মুখে শুনলে সহ্য হবে না—অথচ মনের মধ্যে যথেষ্ট কৌতূহল। আহার-শেষে তেতলায় যখন তার শোবার ঘরে গেল, মনের কোণে একটা ক্ষীণ প্রত্যাশা ছিল। একবার ছাদ এল ঘুরে। পাশের নাবার ঘরে ঢুকে ক্ষণকালের জন্য স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার পরে বিছানায় শুয়ে গুড়গুড়িতে টান দিতে লাগল। নির্দিষ্ট পনেরো মিনিট যায়— বিশ মিনিট পার হয়ে যখন

আধঘণ্টা পুরো হতে চলল তখন বুকের পকেট থেকে ঘড়ি বের করে একবার সময়টা দেখলে। বৎসরের পর বৎসর গেছে, আপিসে যাবার পূর্বে কখনো পাঁচ মিনিট দেরি হয় নি। আপিসে একটা রেজিস্টারি বই আছে, কে ঠিক কোন্ সময়ে এল এবং গেল সেই বইয়ে তার হিসাব থাকে— সেই হিসাবের সঙ্গে সঙ্গে বেতনের মাত্রারেখা ওঠানামা করে। আপিসের সকল কর্মচারীদের মধ্যে মধুসূদনের জরিমানার অঙ্ক সব চেয়ে সংখ্যায় কম। অথচ এ-সম্বন্ধে নিজের প্রতি তার পক্ষপাত নেই। বস্তুত নিজের কাছ থেকে কর্মচারীদের চেয়ে ডবল হারে জরিমানা আদায় করে। মনে-মনে আজ সে পণ করেছে যে, অপরাহ্ণে আপিসের সময় উত্তীর্ণ হলে অতিরিক্ত সময় কাজ করে ক্ষতিপূরণ করে নেবে। বেলা যতই পড়ে আসছে, কাজে মন দিতে আর পারে না। এমন কি আজ আধঘণ্টা সময় থাকতেই কাজ ফেলে বাড়ি ফিরে এল। কেবলই ইচ্ছে করছিল অসময়ে একবার শোবার ঘরে এসে ঢুকতে। হয়তো কাউকে দেখতে পেতেও পারে। দিন থাকতে সে কখনোই শোবার ঘরে আসে না। আজ আপিসের সাজসুদ্ধ অন্তঃপুরে প্রবেশ করলে।

ঠিক সেই সময়ে মোতির মা ছাদের রোদ্দুরে-মেলা আমসিগুলো ঝুড়িতে তুলছিল। মধুসূদনকে অবেলায় শোবার ঘরে ঢুকতে দেখে একহাত ঘোমটা টেনে তার আড়ালে অনেকখানি হাসলে। মেজো-বউয়ের কাছে তার এই অনিয়ম ধরা পড়াতে মধুসূদন লজ্জিত ও বিরক্ত হল। মনে প্ল্যান ছিল অত্যন্ত নিঃশব্দপদে ঘরে ঢুকবে— পাছে ভীরু হরিণী চকিত হয়ে পালায়। সে আর হল না। কৌতুকদৃষ্টির আঘাত এড়াবার জন্যে সে নিজেই দ্রুত ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলে। দেখলে আপিস পালানো সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। ঘরে কেউ তো নেই-ই, দিনের

বেলা কোনো সময়ে কেউ যে ক্ষণকালের জন্যেও ছিল তার চিহ্নও পাওয়া যায় না। এক মুহূর্তে তার অধৈর্য যেন অসহ্য হয়ে উঠল। যদিও সে ভাশুর, এবং কোনোদিন মেজোবউয়ের সঙ্গে একটা কথাও কয় নি, তবু তাকে ডেকে কুমু সম্বন্ধে যা-হয় কিছু একটা বলবার জন্যে মনটা ছটফট করতে লাগল। একবার বের হয়েও এল কিন্তু মোতির মা তখন নিচে চলে গিয়েছে।

নববধূ কর্তৃক পরিত্যক্ত শোবার ঘরে অকারণে অসময়ে একলা যাপন করবার অসম্মান থেকে রক্ষা পাবার জন্যে বাইরের দিকে বেগে গেল হন হন করে। মস্ত একটা জরুরি কাজ করবার ভান করে ডেস্কের উপরে ঝুঁকে পড়ল। সামনে ছিল একখানা খাতা। সাধারণত সেটা সে প্রায় দেখে না, দেখে তার আপিসের হেডবাবু। আজ লোকচক্ষুকে প্রতারণা করবার উদ্দেশ্যে সেটা খুলে বসল। এই খাতায় তার বাড়ির সমস্ত চিঠি ও টেলিগ্রাম রওনা করবার দিন-ক্ষণ টোকা থাকে। খাতা খুলে প্রথমেই দেখতে পেলে আজকের তারিখের টেলিগ্রামের ফর্দর মধ্যে বিপ্রদাসের নাম ও ঠিকানা। প্রেরক হচ্ছেন স্বয়ং কর্ত্রীঠাকুরানী।

"ডাকো দারোয়ানকে।"

দারোয়ান এল।

"এ টেলিগ্রাম কে দিয়েছিল পাঠাতে?"

"মেজোবাবু।"

"ডাকো মেজোবাবুকে।"

মেজোবাবু পাংশুবর্ণ মুখে এসে হাজির।

"আমার হুকুম না নিয়ে টেলিগ্রাম পাঠাতে কে বললে?" যে বলেছিল শাসনকর্তার সামনে তার নাম মুখে আনা তো সহজ ব্যাপার

নয়; কী বলবে কিছুই ভেবে না পেয়ে নবীন ব্যাকুল হয়ে এই শীতের দিনে ঘেমে উঠল।

নবীনকে নীরব দেখে মধুসূদন আপনিই জিজ্ঞাসা করলে, "মেজোবউ বুঝি?" মুখ হেঁট করে নিরুত্তর থাকাতেই তার উত্তর স্পষ্ট হল। ঝাঁ করে মাথায় রক্ত গেল চড়ে, মুখ হল লাল টকটকে— এত রাগ হল যে, কণ্ঠ দিয়ে কথা বেরোল না। সবেগে হাত নেড়ে নবীনকে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে ইশারা করে ঘরের এক ধার থেকে আর-এক ধার পর্যন্ত পায়চারি করতে লাগল।

৩০

নবীন ঘরে গিয়ে মুখ শুকনো করে মোতির মাকে বললে, "মেজোবউ, আর কেন?"

"হয়েছে কী?"

"এবার জিনিসপত্রগুলো বাক্সয় তোলো।"

"তোমার বুদ্ধিতে যদি তুলি, তাহলে আবার কালই বের করতে হবে। কেন? তোমার দাদার মেজাজ ভালো নেই বুঝি?"

"আমি তো চিনি ওঁকে। এবার বোধ হচ্ছে এখানকার বাসায় হাত পড়বে।"

"তা চলোই না। অত ভাবছ কেন? সেখানে তো জলে পড়বে না।"

"আমাকে চলতে বলছ কিসের জন্যে? এবারে হুকুম হবে মেজোবউকে দেশে পাঠিয়ে দাও।"

"সে হুকুম তুমি মানতে পারবে না জানি।"

"কেমন করে জানলে ?"

"আমি কেবল একাই জানি মনে কর, তা নয়— বাড়িসুদ্ধ সবাই তোমাকে স্ত্রৈণ বলে জানে। পুরুষমানুষ যে কী করে স্ত্রৈণ হতে পারে এতদিন তোমার দাদা সে-কথা বুঝতেই পারত না। এইবার নিজের বোঝবার পালা এসেছে।"

"বল কী ?"

"আমি তো দেখছি তোমাদের বংশে ও-রোগটা আছে। এতদিন বড়োভাইয়ের ধাতটা ধরা পড়ে নি। অনেক কাল জমা হয়ে ছিল বলে তার ঝাঁজটা খুব বেশি হবে, দেখে নিয়ো এই আমি বলে দিলাম। যে-জোরের সঙ্গে জগৎ-সংসার ভুলে টাকার থলে আঁকড়ে বসেছিল, ঠিক সেই জোরটাই পড়বে বউয়ের উপর।"

"তাই পড়ুক। বড়ো স্ত্রৈণটি আসর জমান কিন্তু মেজো স্ত্রৈণটি বাঁচবে কাকে নিয়ে।"

"সে-ভাবনার ভার আমার উপরে। এখন আমি তোমাকে যা বলি তাই করো। ওঁর দেরাজ তোমাকে সন্ধান করতে হবে।"

নবীন হাত জোড় করে বললে, "দোহাই তোমার মেজোবউ— সাপের গর্তে হাত দিতে যদি বলতে আমি দিতুম, কিন্তু দেরাজে না।"

"সাপের গর্তে যদি হাত দিতে হত তবে নিজে দিতুম কিন্তু দেরাজটা সন্ধান তোমাকেই করতে হবে। তুমি তো জান এ-বাড়ির সব চিঠিই প্রথমে ওঁকে না দেখিয়ে কাউকে দেবার হুকুম নেই। আমার মন বলছে ওঁর হাতে চিঠি এসেছে।"

"আমারও মন তাই বলছে, কিন্তু সেই সঙ্গে এ-ও বলছে ও-চিঠিতে যদি আমি হাত ঠেকাই তাহলে দাদা উপযুক্ত দণ্ড খুঁজেই পাবে না। বোধ হয় সাত বছর সশ্রম ফাঁসির হুকুম হবে।"

"কিছু তোমাকে করতে হবে না, চিঠিতে হাত দিয়ো না, কেবল একবার দেখে এস দিদির নামে চিঠি আছে কি না।"

মেজোবউয়ের প্রতি নবীনের ভক্তি সুগভীর, এমন কি, নিজেকে তার স্ত্রীর অযোগ্য বলেই মনে করে। সেইজন্যেই তার জন্যে কোনো একটা দুরূহ কাজ করবার উপলক্ষ্য জুটলে যতই ভয় করুক সেই সঙ্গে খুশিও হয়।

সেই রাত্রেই নবীনের কাছে মেজোবউ খবর পেল যে, কুমুর নামে একটা চিঠি ও একটা টেলিগ্রাম দেরাজে আছে।

যে-উত্তেজনার প্রথম ধাক্কায় কুমু তার শোবার ঘর ছেড়ে দাস্যবৃত্তিতে প্রবৃত্ত হয়েছিল, তার বেগ থেমেছে। অপমানের বিরক্তি কমে এসে বিষাদের ম্লানতায় এখন তার মন ছায়াচ্ছন্ন। বুঝতে পারছে চিরদিনের ব্যবস্থা এ নয়। অথচ সে-রকম একটা ব্যবস্থা না হলে কুমু বাঁচবে কী করে? সংসারে আমৃত্যুকাল দিনরাত্রি জোর করে এ-রকম অসংলগ্নভাবে থাকা তো সম্ভবপর নয়।

এই কথাই সে ভাবছিল তার ঘরের দরজা বন্ধ করে। ঘরটা বারান্দার এক কোণে, কাঠের বেড়া দিয়ে ঘেরা। প্রবেশের দ্বার ছাড়া বাকি সমস্ত কুঠরি অবরুদ্ধ। দেয়ালের গায়ে উপর পর্যন্ত কাঠের থাক বসানো। সেই থাকে আলো জ্বালাবার বিচিত্র সরঞ্জাম। তৈলাক্ত মলিনতায় ঘরটা আগাগোড়া ক্লিন্ন। দেয়ালের যে-অংশে দরজা সেই দিকে বাতির মোড়ক থেকে কাটা ছবিগুলি এঁটে দিয়ে কোনো এক ভৃত্য সৌন্দর্যবোধের তৃপ্তিসাধন করেছিল। এক কোণে টিনের বাক্সে আছে গুঁড়োকরা খড়ি, তার পাশে ঝুড়িতে শুকনো তেঁতুল, এবং কতকগুলো ময়লা ঝাড়ন; আর সারি সারি কেরোসিনের টিন, অধিকাংশই খালি, গুটি দুই-তিন ভরা।

যোগাযোগ

অনিপুণ হস্তে আজ সকাল থেকে কুমু তার কাজে লেগেছিল। ভাঁড়ারের কর্তব্য শেষ করে মোতির মা উঁকি মেরে একবার কুমুর কর্মতপস্যার দুঃসাধ্য সংকটটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলে। বুঝতে পারলে দুই-একটা ক্ষণভঙ্গুর জিনিসের অপঘাত আসন্ন। এ-বাড়িতে জিনিসপত্রের সামান্য ক্ষুণ্ণতাও দৃষ্টি অথবা হিসাব এড়ায় না।

মোতির মা আর থাকতে পারলে না; বললে, "কাজ নেই হাতে, তাই এলুম। ভাবলুম দিদির কাজটাতে একটু হাত লাগাই, পুণ্যি হবে।" এই বলেই কাঁচের গ্লোব ও চিমনির ঝুড়ি নিজের কোলের কাছে টেনে নিয়ে মাজা-মোছায় লেগে গেল।

আপত্তি করতে কুমুর আর তেজ নেই, কেননা ইতিমধ্যে আপন অক্ষমতা সম্বন্ধে আত্ম-আবিষ্কার প্রায় সম্পূর্ণ হয়েছে। মোতির মার সহায়তা পেয়ে বেঁচে গেল। কিন্তু মোতির মারও অশিক্ষিতপটুত্বের সীমা আছে। কেরোসিন ল্যাম্পে হিসাব করে ফিতে যোজনা তার পক্ষে অসাধ্য। কাজটা হয় তারই তত্ত্বাবধানে, বরাদ্দ অনুসারে তেল প্রভৃতির মাপ তারই স্বহস্তে, কিন্তু হাতে-কলমে সলতে কাটা আজ পর্যন্ত তার দ্বারা হয় নি। তাই অগত্যা বুড়ো বঙ্কু ফরাশকে সহযোগিতার জন্যে ডাকবার প্রস্তাব তুললে।

হার মানতে হল। বঙ্কু ফরাশ এল, এবং দ্রুতহস্তে অল্পকালের মধ্যেই কাজ সমাধা করে দিলে। সন্ধ্যার পূর্বেই দীপগুলো ঘরে ঘরে ভাগ করে দিয়ে আসতে হয়। সেই কাজের জন্যে পূর্ব নিয়মমতো তাকে যথাসময়ে আসতে হবে কিনা বঙ্কু জিজ্ঞাসা করলে। লোকটা সরল প্রকৃতির বটে কিন্তু তবু প্রশ্নের মধ্যে একটু শ্লেষ ছিল বা। কুমুর কানের ডগা লাল হয়ে উঠল।

সে কোনো জবাব করবার আগেই মোতির মা বললে, "আসবি না

তো কি ?" কুমুর বুঝতে একটু বাকি রইল না যে, কাজ করতে গিয়ে কেবল সে কাজের ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে।

৩১

দুপুরবেলা আহারের পর দরজা বন্ধ করে কুমু বসে বসে পণ করতে লাগল মনের মধ্যে কিছুতে সে আর ক্রোধের আগুন জ্বলে উঠতে দেবে না। কুমু বললে, আজকের দিনটা লাগবে মনকে স্থির করে নিতে; ঠাকুরের আশীর্বাদ নিয়ে কাল সকাল থেকে সংসারধর্মের সত্যপথে প্রবৃত্ত হব। মধ্যাহ্নে আহারের পর তার কাঠের ঘরে দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিয়ে চলল নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া। এই কাজে সব চেয়ে সহায় ছিল তার দাদার স্মৃতি। সে যে দেখেছে তার দাদার ধৈর্যের আশ্চর্য গভীরতা; তাঁর মুখে সেই বিষাদ, যেটি তাঁর অন্তরের মহত্ত্বের ছায়া,— তার সেই দাদা, তথনকার কালের শিক্ষিতসমাজে প্রচলিত পজিটিভিজ্‌ম যাঁর ধর্ম ছিল, দেবতাকে বাইরে থেকে প্রণাম করা যাঁর অভ্যাস ছিল না, অথচ দেবতা আপনিই যাঁর জীবন পূর্ণ করে আবির্ভূত।

অপরাহ্নে বঙ্কু ফরাশ যখন দরজায় আঘাত করলে, ঘর খুলে কুমু বেরিয়ে গেল। মোতির মাকে বললে, আজ রাত্রে সে খাবে না। মনকে বিশুদ্ধ করে নেবার জন্যেই তার এই উপবাস। মোতির মা কুমুর মুখ দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল। সে মুখে আজ চিত্তজ্বালার রক্তচ্ছটা ছিল না। ললাটে চক্ষুতে ছিল প্রশান্ত স্নিগ্ধ দীপ্তি। এখনই যেন সে পূজা সেরে তীর্থস্নান করে এল। অন্তর্যামী দেবতা যেন তার সব অভিমান হরণ করে নিলেন; হৃদয়ের মাঝখানে যেন সে এনেছে নির্মাল্যের ফুল বহন করে, তারই সুগন্ধ রয়েছে তাকে ঘিরে। তাই কুমু যখন উপবাসী

থাকতে চাইলে তখন মোতির মা বুঝলে, এ অভিমানের আত্মপীড়ন নয়। তাই সে আপত্তি মাত্র করলে না।

কুমু তার ঠাকুরের মূর্তিকে অন্তরের মধ্যে বসিয়ে ছাদের এক কোণে গিয়ে আসন নিল। আজ সে স্পষ্ট বুঝতে পেরেছে দুঃখ যদি তাকে এমন করে ধাক্কা না দিত তাহলে সে আপন দেবতার এত কাছে কখনোই আসতে পারত না। অস্তসূর্যের আভার দিকে তাকিয়ে কুমু হাত জোড় করে বললে, "ঠাকুর, আর কখনো যেন তোমার সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ না ঘটে; তুমি আমাকে কাঁদিয়ে তোমার আপন করে রাখো।"

শীতের দিন দেখতে দেখতে ম্লান হয়ে এল। ধূলি কুয়াশা ও কলের ধোঁয়াতে মিশ্রিত একটা বিবর্ণ আবরণে সন্ধ্যার স্বচ্ছ তিমির-গম্ভীর মহিমা আচ্ছন্ন। ওই আকাশটা যেমন একটা পরিব্যাপ্ত মলিনতার বোঝা নিয়ে মাটির দিকে নেমে পড়েছে, তেমনি দাদার জন্যে একটা দুশ্চিন্তার দুঃসহ ভার কুমুর মনটাকে যেন নিচের দিকে নামিয়ে ধরে রেখে দিলে।

এমনি করে একদিকে কুমু অভিমানের বন্ধন থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে মুক্তির আনন্দ আর একদিকে দাদার জন্যে ভাবনায় পীড়িত হৃদয়ের ভার দুইই এক সঙ্গে নিয়ে আবার তার সেই কোটরের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করল। বড়ো ইচ্ছা, এই নিরুপায় ভাবনার বোঝাটাকেও একান্ত বিশ্বাসে ভগবানের উপর সম্পূর্ণ সমর্পণ করে দেয়। কিন্তু নিজেকে বার বার ধিক্‌কার দিয়েও কিছুতেই সেই নির্ভর পায় না। টেলিগ্রাফ তো করা হয়েছে, তার উত্তর আসে না কেন, এই প্রশ্ন অনবরত মনে লেগেই রইল।

নারীহৃদয়ের আত্মসমর্পণের সূক্ষ্ম বাধায় মধুসূদন কোথাও হাত লাগাতে পারছে না। যে বিবাহিত স্ত্রীর দেহমনের উপর তার সম্পূর্ণ দাবি সেও তার পক্ষে নিরতিশয় দুর্গম। ভাগ্যের এমন অভাবনীয় চক্রান্তকে সে কোন্ দিক থেকে কেমন করে আক্রমণ করবে ভেবে পায়

না। কখনো কোনো কারণেই মধুসূদন নিজের ব্যবসার প্রতি লেশমাত্র অমনোযোগী হয় নি, এখন সেই দুর্লক্ষণও দেখা দিল। নিজের মার পীড়া ও মৃত্যুতেও মধুসূদনের কর্মে কিছুমাত্র ব্যাঘাত ঘটে নি এ-কথা সকলেই জানে। তখন তার অবিচলিত দৃঢ়চিত্ততায় অনেকে তাকে ভক্তি করেছে। মধুসূদন আজ হঠাৎ নিজের একটা নূতন পরিচয় পেয়ে নিজে স্তম্ভিত হয়ে গেছে, বাঁধা-পথের বাইরে যে-শক্তি তাকে এমন করে টানছে সে যে তাকে কোন্ দিকে নিয়ে যাবে ভেবে পাচ্ছে না।

রাত্রের আহার সেরে মধুসূদন ঘরে শুতে এল। যদিও বিশ্বাস করে নি, তবু আশা করেছিল আজ হয়তো কুমুকে শোবার ঘরে দেখতে পাবে। সেইজন্যেই নিয়মিত সময় অতিক্রম করেই মধুসূদন এল। সুস্থ শরীরের চিরাভ্যাসমতো একেবারে ঘড়ি-ধরা সময়ে মধুসূদন ঘুমিয়ে পড়ে, এক মুহূর্ত দেরি হয় না। পাছে আজ তেমনি ঘুমিয়ে পড়ার পর কুমু ঘরে আসে তার পরে চলে যায়, এই ভয়ে বিছানায় শুতে গেল না। সোফায় খানিকটা বসে রইল, ছাদে খানিকটা পায়চারি করতে লাগল। মধুসূদনের ঘুমোবার সময় ন-টা— আজ একসময়ে চমকে উঠে শুনলে তার দেউড়ির ঘণ্টায় এগারোটা বাজছে। লজ্জা বোধ হল। কিন্তু বিছানার সামনে দু-তিনবার এসে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে, কিছুতে শুতে যেতে প্রবৃত্তি হয় না। তখন স্থির করলে বাইরের ঘরে গিয়ে সেই রাত্রেই নবীনের সঙ্গে কিছু বোঝাপড়া করে নেবে।

বাইরের ঘরের সামনের বারান্দায় পৌঁছিয়ে দেখে ঘরে তখনও আলো জ্বলছে। সেও ঘরে ঢুকতে যাচ্ছে এমন সময়ে দেখে নবীন লণ্ঠন হাতে ঘর থেকে বেরিয়ে আসছে। দিনের বেলা হলে দেখতে পেত এক মুহূর্তে নবীনের মুখ কী রকম ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

মধুসূদন জিজ্ঞাসা করলে, "এত রাত্রে তুমি যে এখানে ?"

নবীনের মাথায় বুদ্ধি জোগাল, সে বললে, "শুতে যাবার আগেই তো আমি ঘড়িতে দম দিয়ে যাই, আর তারিখের কার্ড ঠিক করে দিই।"

"আচ্ছা, ঘরে এসে শোনো।"

নবীন ত্রস্ত হয়ে কাঠগড়ার আসামির মতো চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

মধুসূদন বললে, "বড়োবউয়ের কানে মন্ত্র ফোসলাবার কেউ থাকে এটা আমি পছন্দ করি নে। আমার ঘরের বউ আমার ইচ্ছেমতো চলবে, আর-কারও পরামর্শ মতো চলবে না,— এইটে হল নিয়ম।"

নবীন গম্ভীরভাবে বললে, "সে তো ঠিক কথা।"

"তাই আমি বলছি, মেজোবউকে দেশে পাঠিয়ে দিতে হবে।"

নবীন খুব যেন নিশ্চিন্ত হল এমনি ভাবে বললে, "ভালো হল দাদা, আমি আরও ভাবছিলুম পাছে তোমার মত না হয়।"

মধুসূদন বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "তার মানে ?"

নবীন বললে, "ক-দিন ধরে দেশে যাবার জন্যে মেজোবউ অস্থির করে তুলেছে, জিনিসপত্র সব গোছানোই আছে, একটা ভালো দিন দেখলেই বেরিয়ে পড়বে।"

বলা বাহুল্য, কথাটা সম্পূর্ণ বানানো। তার বাড়িতে মধুসূদন যাকে ইচ্ছে বিদায় করে দেবে, তাই বলে কেউ নিজের ইচ্ছায় বিদায় হতে চাইবে এটা সম্পূর্ণ বেদস্তর। বিরক্তির স্বরে বললে, "কেন, যাবার জন্যে তার এত তাড়া কিসের ?"

নবীন বললে, "বাড়ির গিন্নি এ-বাড়িতে এসেছেন, এখন এ-বাড়ির সমস্ত ভার তো তাঁকেই নিতে হবে। মেজোবউ বললে, আমি মাঝে থাকলে কী জানি কখন কী কথা ওঠে।"

মধুসূদন বললে, "এ-সব কথার বিচারভার কি তারই উপরে ?"

নবীন ভালোমানুষের মতো বললে, "কী করব বলো, মেয়েমানুষের জেদ। কী জানি, তার মনে হয়েছে, কোন্ কথা নিয়ে তুমি হয়তো একদিন হঠাৎ তাকে সরিয়ে দেবে, সে অপমান তার সইবে না— তাই সে একেবারে পণ করে বসেছে সে যাবেই। আসছে ত্রয়োদশী তিথিতে দিন পড়েছে— এর মধ্যে কাজকর্ম সব গুছিয়ে দিয়ে হিসাবপত্র চুকিয়ে সে চলে যেতে চায়।"

মধুসূদন বললে, "দেখো নবীন, মেজোবউকে আদর দিয়ে তুমিই বিগড়ে দিয়েছ। তাকে একটু কড়া করেই ব'লো সে কিছুতেই যেতে পারবে না। তুমি পুরুষমানুষ, ঘরে তোমার নিজের শাসন চলবে না, এ আমি দেখতে পারি নে।"

নবীন মাথা চুলকিয়ে বললে, "চেষ্টা করে দেখব দাদা, কিন্তু—"

"আচ্ছা, আমার নাম করে ব'লো, এখন তার যাওয়া চলবে না। যখন সময় বুঝব তখন যাবার দিন আমিই ঠিক করে দেব।"

নবীন বললে, "তুমি বললে কিনা মেজোবউকে দেশে পাঠাতে হবে তাই ভাবছি—"

মধুসূদন উত্তেজিত হয়ে বললে, "আমি কি বলেছি, এই মুহূর্তেই পাঠিয়ে দিতে হবে?"

নবীন ধীরে ধীরে চলে গেল। মধুসূদন একটা গ্যাসের শিখা জ্বালিয়ে দিয়ে লম্বা কেদারায় ঠেসান দিয়ে বসে রইল। বাড়ির চৌকিদার রাত্রে এক-একবার বাড়ির ঘরগুলোর সামনে দিয়ে টহলিয়ে আসে। মধুসূদনের অল্প একটু তন্দ্রার মতো এসেছিল, এমন সময় হঠাৎ চমকিয়ে উঠে দেখে চৌকিদার ঘরে ঢুকে লণ্ঠন তুলে ধরে তার মুখের দিকে চেয়ে আছে। হয়তো সে ভাবছিল, মহারাজ মূর্ছাই গেছে, না মারাই গেছে। মধুসূদন লজ্জিত হয়ে ধড়ফড় করে চৌকি থেকে

উঠে পড়ল। বাইরের আপিসঘরে বসে সদ্যোবিবাহিত রাজাবাহাদুরের রাত্রিযাপনের শোকাবহ দৃশ্যটা চৌকিদারের কাছে যে অসম্মানকর এ-কথাটা মুহূর্তেই তাকে যেন মারলে। উঠেই কিছু রাগের স্বরে চৌকিদারকে বললে, "ঘর বন্ধ করো।" যেন ঘর বন্ধ না থাকাটাতে তারই অপরাধ ছিল। দেউড়ির ঘণ্টাতে বাজল দুটো।

মধুসূদন ঘর ছেড়ে যাবার আগে একবার তার দেরাজ খুললে। ইতস্তত করতে করতে কুমুর নামের টেলিগ্রামটা পকেটে পুরে অন্তঃপুরের দিকে চলে গেল। তেতালায় ওঠবার সিঁড়ির সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল।

গভীর রাত্রে প্রথম ঘুম থেকে জেগে মানুষ আপনার সমস্ত শক্তিকে সম্পূর্ণ পায় না। তাই তার দিনের চরিত্রের সঙ্গে রাতের চরিত্রের অনেকটা প্রভেদ। এই রাত্রি দুটোর সময় চারিদিকে লোকের দৃষ্টি বলে যখন কিছুই নেই, সে যখন বিশ্বসংসারে একমাত্র নিজের কাছে ছাড়া আর কারও কাছেই দায়ী নয়, তখন কুমুর কাছে মনে-মনে হারমানা তার পক্ষে অসম্ভব হল না।

৩২

সিঁড়ির তলা থেকে মধুসূদন ফিরল, বুকের মধ্যে রক্ত তোলপাড় করতে লাগল। একটা কোন্ রুদ্ধ ঘরের সামনে কেরোসিনের লণ্ঠন জ্বলছিল। সেইটে তুলে নিয়ে চুপি চুপি তেলবাতির কুঠরির বাইরে এসে দাঁড়াল। আস্তে আস্তে দরজা ঠেলতে গিয়ে দেখলে দরজা ভেজানো; দরজা খুলে গেল। সেই মাদুরের উপর গায়ে একখানা চাদর দিয়ে কুমু গভীর ঘুমে মগ্ন— বাঁ হাতখানি বুকের উপর তোলা। দেয়ালের কোণে লণ্ঠন রেখে মধুসূদন কুমুর মুখের দিকে মুখ করে বাঁ-পাশে এসে বসল। এই

মুখটি যে মনকে এমন প্রবল শক্তিতে টানে তার কারণ মুখের মধ্যে তার একটি অনির্বচনীয় সম্পূর্ণতা। কুমুর আপনার মধ্যে আপনার কোনো দিন বিরোধ ঘটে নি। দাদার সংসারে অভাবের দুঃখে সে পীড়িত হয়েছে কিন্তু সেটা বাহ্য অবস্থাঘটিত ব্যাপারে, সেটাতে তার প্রকৃতিকে আঘাত করে নি। যে-সংসারে সে ছিল সে-সংসার তার স্বভাবের পক্ষে সব দিকেই অনুকূল। এই জন্যেই তার মুখভাবে এমন একটি অনবচ্ছিন্ন সরলতা, তার চলাফেরায় তার ব্যবহারে এমন একটা অক্ষুণ্ণ মর্যাদা। যে-মধুসূদনকে জীবনের সাধনায় কেবল প্রাণপণ লড়াই করতে হয়েছে, প্রতিদিন উদ্যত সংশয় নিয়ে নিরন্তর যাকে সতর্ক থাকতে হয়, তার কাছে কুমুর এই সর্বাঙ্গীণ সুপরিণতির অপূর্ব গাম্ভীর্য পরম বিস্ময়ের বিষয়। সে নিজে একটুও সহজ নয়, আর কুমু যেন একেবারে দেবতার মতো সহজ। তার সঙ্গে কুমুর এই বৈপরীত্যই তাকে এমন প্রবল বেগে টানছে। বিয়ের পরে বধূ শ্বশুরবাড়িতে প্রথম আসবামাত্রই যে কাণ্ডটি ঘটল তার সমস্ত ছবিটি যখন সে মনের মধ্যে দেখে তখন দেখতে পায় তার নিজের দিকে ব্যর্থ প্রভুত্বের ক্রুদ্ধ অক্ষমতা, অন্যদিকে বধূর মনের মধ্যে অনমনীয় আত্মমর্যাদার সহজ প্রকাশ। সাধারণ মেয়েদের মতো তার ব্যবহারে কোথাও কিছুমাত্র অশোভন প্রগল্‌ভতা দেখা গেল না। এ যদি না হত তাহলে তাকে অপমান করবার যে-স্বামিত্ব তার আছে সেই অধিকার খাটাতে মধুসূদন লেশমাত্র দ্বিধা করত না। কিন্তু কী যে হল তা সে নিজে বুঝতেই পারে না; কী একটা অদ্ভুত কারণে কুমুকে সে আপনার ধরাছোঁয়ার মধ্যে পেলে না।

মধুসূদন মনে স্থির করলে, কুমুকে না জাগিয়ে সমস্ত রাত্রি ওর পাশে এমনি করে জেগে বসে থাকবে। কিছুক্ষণ বসে থেকে থেকে

আর কিছুতেই থাকতে পারলে না,— আস্তে আস্তে কুমুর বুকের উপর থেকে তার হাতটি নিজের হাতের উপর তুলে নিলে। কুমু ঘুমের ঘোরে উসখুস করে হাতটা টেনে নিয়ে মধুসূদনের উলটো দিকে পাশ ফিরে শুল।

মধুসূদন আর থাকতে পারলে না, কুমুর কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বললে, "বড়োবউ, তোমার দাদার টেলিগ্রাম এসেছে।"

অমনি ঘুম ভেঙে কুমু দ্রুত উঠে বসল, বিস্মিত চোখ মেলে মধুসূদনের মুখের দিকে অবাক হয়ে রইল চেয়ে। মধুসূদন টেলিগ্রামটা সামনে ধরে বললে, "তোমার দাদার কাছ থেকে এসেছে।" বলে ঘরের কোণে থেকে লণ্ঠনটা কাছে নিয়ে এল।

কুমু টেলিগ্রামটা পড়ে দেখলে, তাতে ইংরেজিতে লেখা আছে, "আমার জন্যে উদ্বিগ্ন হ'য়ো না; ক্রমশই সেরে উঠছি; তোমাকে আমার আশীর্বাদ।" কঠিন উদ্বেগের নিরতিশয় পীড়নের মধ্যে এই সান্ত্বনার কথা পড়ে এক মুহূর্তে কুমুর চোখ ছল ছল করে উঠল। চোখ মুছে টেলিগ্রামখানি যত্ন করে আঁচলের প্রান্তে বাঁধলে। সেইটেতে মধুসূদনের হৃৎপিণ্ডে যেন মোচড় লাগাল। তার পরে কী যে বলবে কিছুই ভেবে পায় না। কুমুই বলে উঠল, "দাদার কি চিঠি আসে নি?"

এর পরে কিছুতেই মধুসূদন বলতে পারলে না যে চিঠি এসেছে। ধাঁ করে বলে ফেললে, "না, চিঠি তো নেই।"

এই ঘরটার মধ্যে রাত্রে দুজনে এমন করে বসে থাকতে কুমুর সংকোচ বোধ হল। সে যখন উঠব-উঠব করছে, মধুসূদন হঠাৎ বলে উঠল, "বড়োবউ, আমার উপর রাগ ক'রো না।"

এ তো প্রভুর উপরোধ নয়, এ যে প্রণয়ীর মিনতি, আর তার মধ্যে

যেন আছে অপরাধীর আত্মগ্লানি। কুমু বিস্মিত হয়ে গেল, তার মনে হল এ দৈবেরই লীলা। কেননা, সে যে দিনের বেলা বারবার নিজেকে বলেছে, "তুই রাগ করিস নে।" সেই কথাটাই আজ অর্ধরাত্রে অপ্রত্যাশিতভাবে কে মধুসূদনকে দিয়ে বলিয়ে নিলে।

মধুসূদন আবার তাকে বললে, "তুমি কি এখনও আমার উপর রাগ করে আছ?"

কুমু বললে, "না, আমার রাগ নেই, একটুও না।"

মধুসূদন ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য হয়ে গেল। ও যেন মনে-মনে কথা কইছে; অনুদ্দিষ্ট কারও সঙ্গে যেন ওর কথা।

মধুসূদন বললে, "তা হলে এ-ঘর থেকে এস তোমার আপন ঘরে।"

কুমু আজ রাত্রে প্রস্তুত ছিল না। ঘুমের থেকে জেগে উঠেই হঠাৎ মনকে বেঁধে তোলা কঠিন। কাল সকালে স্নান করে দেবতার কাছে তার প্রতিদিনের প্রার্থনা-মন্ত্র পড়ে তবে কাল থেকে সংসারে তার সাধনা আরম্ভ হবে এই সংকল্প সে করেছিল। তখন ওর মনে হল, ঠাকুর আমাকে সময় দিলেন না, আজ এই গভীর রাত্রেই ডাক দিলেন। তাঁকে কেমন করে বলব যে, "না।" মনের ভিতরে যে একটা প্রকাণ্ড অনিচ্ছা হচ্ছিল তাকে অপরাধ বলে কুমু ভয় পেলে। এই অনিচ্ছার বাধা তাকে টেনে রাখছিল বলেই কুমু জোরের সঙ্গে উঠে দাঁড়ালে, বললে, "চলো।"

উপরে উঠে তার শোবার ঘরের সামনে একটু থমকে দাঁড়িয়ে সে বললে, "আমি এখনই আসছি, দেরি করব না।"

বলে ছাদের কোণে গিয়ে বসে পড়ল। কৃষ্ণপক্ষের খণ্ড চাঁদ তখন মধ্য-আকাশে।

নিজের মনে-মনে কুমু বার বার করে বলতে লাগল, "প্রভু তুমি ডেকেছ আমাকে, তুমি ডেকেছ। আমাকে ভোল নি বলেই ডেকেছ। আমাকে কাঁটাপথের উপর দিয়েই নিয়ে যাবে,— সে তুমিই, সে তুমিই, সে আর কেউ নয়।"

আর-সমস্তকেই কুমু লুপ্ত করে দিতে চায়। আর সমস্তই মায়া, আর-সমস্তই যদি কাঁটাও হয় তবু সে পথেরই কাঁটা, আর সে তাঁরই পথের কাঁটা। সঙ্গে পাথেয় আছে, তার দাদার আশীর্বাদ। সেই আশীর্বাদ সে যে আঁচলে বেঁধে নিয়েছে। সেই আঁচলে-বাঁধা আশীর্বাদ বার বার মাথায় ঠেকালে। তার পরে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে অনেকক্ষণ ধরে প্রণাম করলে। এমন সময় হঠাৎ চমকে উঠল, পিছন থেকে মধুসূদন বলে উঠল, "বড়োবউ, ঠাণ্ডা লাগবে, ঘরে এস।" অন্তরের মধ্যে কুমু যে-বাণী শুনতে চায় তার সঙ্গে এ-কণ্ঠের সুর তো মেলে না। এই তো তার পরীক্ষা, ঠাকুর আজ তাকে বাঁশি দিয়েও ডাকবেন না। তিনি রইবেন আজ ছদ্মবেশে।

৩৩

যেখানে কুমু ব্যক্তিগত মানুষ সেখানে যতই তার মন ধিক্‌কারে ঘৃণায় বিতৃষ্ণায় ভরে উঠছে, যতই তার সংসার সেখানে আপন গায়ের জোরের রূঢ় অধিকারে তাকে অপমানিত করছে ততই সে আপনার চারিদিকে একটা আবরণ তৈরি করছে। এমন একটা আবরণ যাতে করে নিজের কাছে তার ভালো-লাগা মন্দ-লাগার সত্যতাকে লুপ্ত করে, অর্থাৎ নিজের সম্বন্ধে নিজের চৈতন্যকে কমিয়ে দেয়। এ হচ্ছে ক্লোরোফরমের বিধান। কিন্তু এ তো দু-তিন ঘণ্টার ব্যবস্থা নয়, সমস্ত দিনরাত্রি বেদনাবোধকে বিতৃষ্ণাবোধকে তাড়িয়ে রাখতে,

হবে। এই অবস্থায় মেয়েরা যদি কোনোমতে একজন গুরুকে পায় তবে তার আত্মবিস্মৃতির চিকিৎসা সহজ হয়; সে তো সম্ভব হল না। তাই মনে-মনে পূজার মন্ত্রকে নিয়তই বাজিয়ে রাখতে চেষ্টা করলে। তার এই দিনরাত্রির মন্ত্রটি ছিল—

তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং
প্রসাদয়ে ত্বাম্ অহমীশমীড্যং
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুম্।

হে আমার পূজনীয়, তোমার কাছে আমার সমস্ত শরীর প্রণত করে এই প্রসাদটি চাই যে, পিতা যেমন করে পুত্রকে, সখা যেমন করে সখাকে, প্রিয় যেমন করে প্রিয়াকে সহ্য করতে পারেন, হে দেব, তুমিও যেন আমাকে তেমনি করে সইতে পার। তুমি যে তোমার ভালোবাসায় আমাকে সহ্য করতে পার তার প্রমাণ এ ছাড়া আর কিছু নয় যে, তোমার ভালোবাসায় আমিও সমস্ত ক্ষমা করতে পারি। কুমু চোখ বুজে মনে-মনে তাঁকে ডেকে বলে, "তুমি তো বলেছ, যে-মানুষ আমাকে সব জায়গায় দেখে, আমার মধ্যে সমস্তকে দেখে সেও আমাকে ত্যাগ করে না, আমিও তাকে ত্যাগ করি নে। এই সাধনায় আমার যেন একটুও শৈথিল্য না হয়।"

আজ সকালে স্নান করে চন্দন-গোলা জল দিয়ে তার শরীরকে অনেকক্ষণ ধরে অভিষিক্ত করে নিলে। দেহকে নির্মল করে সুগন্ধি করে সে তাঁকে উৎসর্গ করে দিলে— মনে-মনে একাগ্রতার সঙ্গে ধ্যান করতে লাগল যে, নিমেষে নিমেষে তার হাতে তাঁর হাত আছে, তার সমস্ত শরীরে তাঁর সর্বব্যাপী স্পর্শ অবিরাম বিরাজমান। এ-দেহকে সত্যরূপে সম্পূর্ণরূপে তিনিই পেয়েছেন, তাঁর পাওয়ার বাইরে যে-শরীরটা

সে তো মিথ্যা, সে তো মায়া, সে তো মাটি, দেখতে দেখতে মাটিতে মিশিয়ে যাবে। যতক্ষণ তাঁর স্পর্শকে অনুভব করি ততক্ষণ এ-দেহ কিছুতেই অপবিত্র হতে পারে না। এই কথা মনে করতে করতে আনন্দে তার চোখের পাতা ভিজে এল— তার দেহটা যেন মুক্তি পেলে মাংসের স্থূল বন্ধন থেকে। পুণ্যসম্মিলনের নিত্যক্ষেত্র বলে আপন দেহের উপর তার যেন ভক্তি এল। যদি কুন্দফুলের মালা হাতের কাছে পেত তাহলে এখনই আজ সে পরত গলায়, বাঁধত কবরীতে। স্নান করে পরল সে একটি শুভ্র শাড়ি, খুব মোটা লাল পাড় দেওয়া। ছাদে যখন বসল তখন মনে হল সূর্যের আলো হয়ে আকাশপূর্ণ একটি পরম স্পর্শ তার দেহকে অভিনন্দিত করলে।

মোতির মার কাছে এসে কুমু বললে, "আমাকে তোমার কাজে লাগিয়ে দাও।"

মোতির মা হেসে বললে, "এস তবে তরকারি কুটবে।"

মস্ত মস্ত বারকোশ, বড়ো বড়ো পিতলের খোরা, ঝুড়ি ঝুড়ি শাকসবজি, দশ পনেরোটা বঁটি পাতা,— আত্মীয়া-আশ্রিতারা গল্প করতে করতে দ্রুত হাত চালিয়ে যাচ্ছে, ক্ষতবিক্ষত খণ্ডবিখণ্ডিত তরকারিগুলো স্তূপাকার হয়ে উঠছে। তারই মধ্যে কুমু এক জায়গায় বসে গেল। সামনে গরাদের ভিতর দিয়ে দেখা যায় পাশের বসতির এক বৃদ্ধ তেঁতুল গাছ তার চিরচঞ্চল পাতাগুলো দিয়ে সূর্যের আলো চূর্ণ চূর্ণ করে ছিটিয়ে ছিটিয়ে দিচ্ছে।

মোতির মা মাঝে মাঝে কুমুর মুখের দিকে চেয়ে দেখে আর ভাবে, ও কি কাজ করছে, না, ওর আঙুলের গতি আশ্রয় করে ওর মন চলে যাচ্ছে কোন্ এক তীর্থের পথে? ওকে দেখে মনে হয় যেন পালের নৌকো; আকাশে-তোলা পালটাতে হাওয়া এসে লাগছে, নৌকোটা যেন

সেই স্পর্শেই ভোর, আর তার খোলের দুধারে যে জল কেটে কেটে পড়্চে সেটা যেন খেয়ালের মধ্যেই নেই। ঘরে অন্য যারা কাজ করছে তারা যে কুমুর সঙ্গে গল্পগুজব করবে এমন যেন একটা সহজ রাস্তা পাচ্ছে না। শ্যামাসুন্দরী একবার বললে, "বউ, সকালেই যদি স্নান কর, গরম জল বলে দাও না কেন। ঠাণ্ডা লাগবে না তো ?"

কুমু বললে, "আমার অভ্যেস আছে।"

আলাপ আর এগোল না। কুমুর মনের মধ্যে তখন একটা নীরব জপের ধারা চলছে—

> পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ
> প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুম্।

তরকারি-কোটা ভাঁড়ার-দেওয়ার কাজ শেষ হয়ে গেল, মেয়েরা স্নানের জন্যে অন্দরের উঠোনে কলতলায় গিয়ে কলরব তুললে।

মোতির মাকে একলা পেয়ে কুমু বললে, "দাদার কাছ থেকে টেলিগ্রাফের জবাব পেয়েছি।"

মোতির মা কিছু আশ্চর্য হয়ে বললে, "কখন পেলে ?"

কুমু বললে, "কাল রাত্তিরে।"

"রাত্তিরে !"

"হাঁ, অনেক রাত। তখন উনি নিজে এসে আমার হাতে দিলেন।"

মোতির মা বললে, "তা হলে চিঠিখানাও নিশ্চয় পেয়েচ।"

"কোন্ চিঠি ?"

"তোমার দাদার চিঠি।"

ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল, "না, আমি তো পাই নি ! দাদার চিঠি এসেছে নাকি ?"

মোতির মা চুপ করে রইল।

কুমু তার হাত চেপে ধরে উৎকণ্ঠিত হয়ে বললে, “কোথায় দাদার চিঠি, আমাকে এনে দাও না।”

মোতির মা চুপি চুপি বললে, “সে-চিঠি আনতে পারব না, সে বড়ঠাকুরের বাইরের ঘরের দেরাজে আছে।”

“আমার চিঠি আমাকে কেন এনে দিতে পারবে না?”

“তাঁর দেরাজ খুলেছি জানতে পারলে প্রলয় কাণ্ড হবে।”

কুমু অস্থির হয়ে বললে, “দাদার চিঠি তাহলে আমি পড়তে পাব না?”

“বড়ঠাকুর যখন আপিসে যাবেন তখন সে চিঠি পড়ে আবার দেরাজে রেখে দিয়ো।”

রাগ তো ঠেকিয়ে রাখা যায় না। মনটা গরম হয়ে উঠল। বললে, “নিজের চিঠিও কি চুরি করে পড়তে হবে?”

“কোন্‌টা নিজের কোন্‌টা নিজের নয়, সে-বিচার এ-বাড়ির কর্তা করে দেন।”

কুমু তার পণ ভুলতে যাচ্ছিল, এমন সময় হঠাৎ মনের ভিতরটা তর্জনী তুলে বলে উঠল, “রাগ কোরো না।” ক্ষণকালের জন্যে কুমু চোখ বুজলে। নিঃশব্দ বাক্যে ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠল, “প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুম্।”

কুমু বললে, “আমার চিঠি কেউ যদি চুরি করেন করুন, আমি তাই বলে চুরি করে চুরির শোধ দিতে চাই নে।”

বলেই কুমুর তখনই মনে হল কথাটা কঠিন হয়েছে। বুঝতে পারলে, ভিতরে যে-রাগ আছে নিজের অগোচরে সে আপনাকে প্রকাশ করে। তাকে উন্মূলিত করতে হবে। তার সঙ্গে লড়াই করতে চাইলে সব সময় তো তার নাগাল পাওয়া যায় না। গুহার মধ্যে সে

দুর্গ তৈরি ক'রে থাকে, বাইরে থেকে সেখানে প্রবেশের পথ কই? তাই এমন একটি প্রেমের বন্যা নামিয়ে আনা চাই যাতে রুদ্ধকে মুক্ত ক'রে বদ্ধকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। অনেক ভুলিয়ে দেবার ওর একটি উপায় হাতে ছিল, সে হচ্ছে সংগীত। কিন্তু এ-বাড়িতে এসরাজ বাজাতে ওর লজ্জা করে। সঙ্গে এসরাজ আনেও নি। কুমু গান গাইতে পারে, কিন্তু কুমুর গলায় তেমন জোর নেই। গানের ধারায় আকাশ ভাসিয়ে দিতে ইচ্ছা করল, অভিমানের গান। যে-গানে ও বলতে পারে, "আমি তো তোমারই ডাকে এসেছি, তবে তুমি কেন লুকোলে? আমি তো নিমেষের জন্যে দ্বিধা করি নি। তবে আজ আমাকে কেন এমন সংশয়ের মধ্যে ফেললে?" এই-সব কথা খুব গলা ছেড়ে গান গেয়ে ওর বলতে ইচ্ছে করে। মনে হয়, তাহলেই যেন সুরে এর উত্তর পাবে।

৩৪

কুমুর পালাবার একটিমাত্র জায়গা আছে—এ-বাড়ির ছাদ। সেইখানে চলে গেল। বেলা হয়েছে, প্রখর রৌদ্রে ছাদ ভরে গেছে, কেবল প্রাচীরের গায়ে এক জায়গায় একটুখানি ছায়া। সেইখানে গিয়ে বসল। একটি গান মনে পড়ল, তার সুরটি আসাবরী। সে গানের আরম্ভটি হচ্ছে, "বাঁশরী হমারি রে"—কিন্তু বাকিটুকু ওস্তাদের মুখে মুখে বিকৃত বাণী— তার মানে বুঝতে পারা যায় না। কুমু ওই অসম্পূর্ণ অংশ আপন ইচ্ছামতো নূতন নূতন তান দিয়ে ভরিয়ে পালটে পালটে গাইতে লাগল। ওই একটুখানি কথা অর্থে ভরে উঠল। ওই বাক্যটি যেন বলছে, "ও আমার বাঁশি, তোমাতে সুর ভরে উঠছে না কেন? অন্ধকার পেরিয়ে পৌঁচচ্ছে না কেন যেখানে দুয়ার রুদ্ধ, যেখানে ঘুম ভাঙল না? বাঁশরী হমারি রে, বাঁশরী হমারি রে!"

মোতির মা যখন এসে বললে "চলো ভাই, খেতে যাবে" তখন সেই ছাদের কোণের একটুখানি ছায়া গেছে লুপ্ত হয়ে, কিন্তু তখন ওর মন সুরে ভরপুর, সংসারে কে ওর 'পরে কী অন্যায় করেছে সে-সমস্ত তুচ্ছ হয়ে গেছে। ওর চিঠি নিয়ে মধুসূদনের যে ক্ষুদ্রতা, যে-ক্ষুদ্রতায় ওর মনে তীব্র অবজ্ঞা উদ্যত হয়ে উঠেছিল, সে যেন এই রোদ-ভরা আকাশে একটা পতঙ্গের মতো কোথায় বিলীন হয়ে গেল, তার ক্রুদ্ধ গুঞ্জন মিলিয়ে গেল অসীম আকাশে। কিন্তু চিঠির মধ্যে দাদার যে স্নেহবাক্য আছে সেটুকু পাবার জন্যে তার মনের আগ্রহ তো যায় না।

ওই ব্যাগ্রতাটা তার মনে লেগে রইল। খাওয়া হয়ে গেলে আর সে থাকতে পারলে না। মোতির মাকে বললে, "আমি যাই বাইরের ঘরে, চিঠি প'ড়ে আসি।"

মোতির মা বললে, "আর একটু দেরি হোক, চাকররা সবাই যখন ছুটি নিয়ে খেতে যাবে তখন যেয়ো।"

কুমু বললে, "না না, সে বড়ো চুরি করে যাওয়ার মতো হবে। আমি সকলের সামনে দিয়ে যেতে চাই, তাতে যে যা মনে করে করুক।"

মোতির মা বললে, "তাহলে চলো আমিও সঙ্গে যাই।"

কুমু বলে উঠল, "না, সে কিছুতেই হবে না। তুমি কেবল বলে দাও কোন্ দিক দিয়ে যেতে হবে।"

মোতির মা অন্তঃপুরের ঝরকা-দেওয়া বারান্দা দিয়ে ঘরটা দেখিয়ে দিলে। কুমু বেরিয়ে এল। ভৃত্যেরা সচকিত হয়ে উঠে তাকে প্রণাম করলে। কুমু ঘরে ঢুকে ডেস্কের দেরাজ খুলে দেখলে তার চিঠি। তুলে নিয়ে দেখলে লেফাফা খোলা। বুকের ভিতরটা ফুলে উঠতে লাগল, একেবারে অসহ্য হয়ে উঠল। যে-বাড়িতে কুমু মানুষ হয়েছে সেখানে এ-রকম অবমাননা কোনোমতেই কল্পনা পর্যন্ত করা যেত না। নিজের

আবেগের এই তীব্র প্রবলতাতেই তাকে ধাক্কা মেরে সচেতন করে তুলল। সে বলে উঠল, "প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুম্"—তবু তুফান থামে না—তাই বার বার বললে। বাইরে যে আরদালি ছিল, আপিস-ঘরে তাদের বউরানীর এই আপন-মনে মন্ত্র-আবৃত্তি শুনে সে অবাক হয়ে গেল। অনেকক্ষণ বলতে বলতে কুমুর মন শান্ত হয়ে এল। তখন চিঠিখানি সামনে রেখে চৌকিতে বসে হাত জোড় করে স্থির হয়ে রইল। চিঠি সে চুরি করে পড়বে না এই তার পণ।

এমন সময় মধুসূদন ঘরে ঢুকেই চমকে উঠে দাঁড়াল—কুমু তার দিকে চাইলেও না। কাছে এসে দেখলে, ডেস্কের উপর সেই চিঠি। জিজ্ঞাসা করলে, "তুমি এখানে যে!"

কুমু নীরবে শান্তদৃষ্টিতে মধুসূদনের মুখের দিকে চাইলে। তার মধ্যে নালিশ ছিল না। মধুসূদন আবার জিজ্ঞাসা করলে, "এ-ঘরে তুমি কেন?"

এই বাহুল্যপ্রশ্নে কুমু অধৈর্যের স্বরেই বললে, "আমার নামে দাদার চিঠি এসেছে কি না তাই দেখতে এসেছিলেম।"

সে-কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করলে না কেন, এমনতরো প্রশ্নের রাস্তা কাল রাত্তিরে মধুসূদন আপনি বন্ধ করে দিয়েছে। তাই বললে, "এ-চিঠি আমিই তোমার কাছে নিয়ে যাচ্ছিলুম, সে-জন্যে তোমার এখানে আসবার তো দরকার ছিল না।"

কুমু একটুখানি চুপ করে রইল, মনকে শান্ত করে তার পরে বললে, "এ-চিঠি তুমি আমাকে পড়তে দিতে ইচ্ছে কর নি, সেইজন্যে এ-চিঠি আমি পড়ব না। এই আমি ছিঁড়ে ফেললুম। কিন্তু এমন কষ্ট আমাকে আর কখনো দিয়ো না। এর চেয়ে কষ্ট আমার আর কিছু হতে পারে না।"

এই বলে সে মুখে কাপড় দিয়ে ছুটে বেরিয়ে চলে গেল।

ইতিপূর্বে আজ মধ্যাহ্নে আহারের পর মধুসূদনের মনটা আলোড়িত হয়ে উঠছিল। আন্দোলন কিছুতে থামাতে পারছিল না। কুমুর খাওয়া হলেই তাকে ডাকিয়ে পাঠাবে বলে ঠিক করে রেখেছে। আজ সে মাথার চুল আঁচড়ানো সম্বন্ধে একটু বিশেষ যত্ন নিলে। আজ সকালেই একটি ইংরেজ নাপিতের দোকান থেকে স্পিরিট-মেশানো সুগন্ধি কেশতৈল ও দামি এসেন্স কিনিয়ে আনিয়েছিল। জীবনে এই প্রথম সেগুলি সে ব্যবহার করেছে। সুগন্ধি ও সুসজ্জিত হয়ে সে প্রস্তুত ছিল। আপিসের সময় আজ অন্তত পঁয়তাল্লিশ মিনিট পেরিয়ে গেল।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পেতেই মধুসূদন চমকে উঠে বসল। হাতের কাছে আর কিছু না পেয়ে একখানা পুরোনো খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনের পাতাটা নিয়ে এমনভাবে সেটাকে দেখতে লাগল যেন তার আপিসেরই কাজের অঙ্গ। এমনকি পকেট থেকে একটা মোটা নীল পেন্সিল বের করে দুটো-একটা দাগও টেনে দিলে।

এমন সময় ঘরে প্রবেশ করলে শ্যামাসুন্দরী। ভ্রূকুঞ্চিত করে মধুসূদন তার মুখের দিকে চাইলে। শ্যামাসুন্দরী বললে, "তুমি এখানে বসে আছ, বউ যে তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।"

"খুঁজে বেড়াচ্ছে! কোথায়?"

"এই যে দেখলুম, বাইরে তোমার আপিস-ঘরে গিয়ে ঢুকল। তা এতে অত আশ্চর্য হচ্ছ কেন ঠাকুরপো—সে ভেবেছে তুমি বুঝি—"

তাড়াতাড়ি মধুসূদন বাইরে চলে গেল। তার পরেই সেই চিঠির ব্যাপার।

পালের নৌকায় হঠাৎ পাল কেটে গেলে তার যে-দশা মধুসূদনের তাই হল। তখন আর দেরি করবার লেশমাত্র অবকাশ ছিল না। আপিসে চলে গেল। কিন্তু সকল কাজের ভিতরে ভিতরে তার অসম্পূর্ণ ভাঙা চিন্তার তীক্ষ্ণ ধারগুলো কেবলই যেন ঠেলে ঠেলে বিঁধে বিঁধে উঠছে। এই মানসিক ভূমিকম্পের মধ্যে মনোযোগ দিয়ে কাজ করা সেদিন তার পক্ষে একেবারে অসম্ভব। আপিসে জানিয়ে দিলে, উৎকট মাথা ধরেছে, কার্যশেষের অনেক আগেই বাড়ি ফিরে এল।

৩৫

এদিকে নবীন ও মোতির মা বুঝেছে, এবারে ভিত গেল ভেঙে, পালিয়ে বাঁচবার আশ্রয় তাদের আর কোথাও রইল না। মোতির মা বললে, "এখানে যে-রকম খেটে খাচ্ছি সে-রকম খেটে খাবার জায়গা সংসারে আমার মিলবে। আমার দুঃখ এই যে, আমি গেলে এ-বাড়িতে দিদিকে দেখবার লোক আর কেউ থাকবে না।"

নবীন বললে, "দেখো মেজোবৌ, এ-সংসারে অনেক লাঞ্ছনা পেয়েছি, এ-বাড়ির অন্নজলে অনেকবার আমার অরুচি হয়েছে। কিন্তু এইবার অসহ্য হচ্ছে যে, এমন বউ ঘরে পেয়েও কি করে তাকে নিতে হয়, রাখতে হয়, তা দাদা বুঝলে না— সমস্ত নষ্ট করে দিলে। ভালো জিনিসের ভাঙা টুকরো দিয়েই অলক্ষ্মী বাসা বাঁধে।"

মোতির মা বললে, "সে-কথা তোমার দাদার বুঝতে দেরি হবে না। কিন্তু তখন ভাঙা আর জোড়া লাগবে না।"

নবীন বললে, "লক্ষ্মণ দেওর হবার ভাগ্য আমার ঘটল না, এইটেই আমার মনে বাজছে। যা হোক, তুমি জিনিসপত্তর এখনই গুছিয়ে ফেলো, এ-বাড়িতে যখন সময় আসে তখন আর তর সয় না।"

মোতির মা চলে গেল। নবীন আর থাকতে পারলে না, আস্তে আস্তে তার বৌদিদির ঘরের বাইরে এসে দেখলে, কুমু তার শোবার-ঘরের মেজের বিছানার উপর পড়ে আছে। যে-চিঠিখানা ছিঁড়ে ফেলেছে তার বেদনা কিছুতেই মন থেকে যাচ্ছে না।

নবীনকে দেখে তাড়াতাড়ি উঠে বসল। নবীন বললে, "বউদিদি, প্রণাম করতে এসেছি, একটু পায়ের ধুলো দাও।"

বউদিদির সঙ্গে নবীনের এই প্রথম কথাবার্তা।

কুমু বললে, "এস, ব'সো।"

নবীন মাটিতে বসে বললে, "তোমাকে সেবা করতে পারব এই খুশিতে বুক ভরে উঠেছিল। কিন্তু নবীনের কপালে এতটা সৌভাগ্য সইবে কেন? কটা দিন মাত্র তোমাকে পেয়েছি, কিছুই করতে পারি নি এই আফসোস মনে রয়ে গেল।"

কুমু জিজ্ঞাসা করলে, "কোথায় যাচ্ছ তোমরা?"

নবীন বললে, "দাদা আমাদের দেশেই পাঠাবে। এর পরে তোমার সঙ্গে বোধ হয় আর দেখা হবার সুবিধা হবে না, তাই প্রণাম করে বিদায় নিতে এসেছি।" বলে যেই সে প্রণাম করলে মোতির মা ছুটে এসে বললে, "শীঘ্র চলে এস। কর্তা তোমার খোঁজ করছেন।"

নবীন তাড়াতাড়ি উঠে চলে গেল। মোতির মাও গেল তার সঙ্গে।

সেই বাইরের ঘরে দাদা তার ডেস্কের কাছে বসে; নবীন এসে দাঁড়াল। অন্যদিনে এমন অবস্থায় তার মুখে যে-রকম আশঙ্কার ভাব থাকত আজ তা কিছুই নেই।

মধুসূদন জিজ্ঞাসা করলে, "ডেস্কের চিঠির কথা বড়োবউকে কে বললে?

নবীন বললে, "আমিই বলেছি।"

"হঠাৎ তোমার এত সাহস বেড়ে উঠল কোথা থেকে ?"

"বড়োবউরানী আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন তাঁর দাদার চিঠি এসেছে কি না। এ-বাড়ির চিঠি তো তোমার কাছে এসে প্রথমটা ওই ডেস্কেই জমা হয়, তাই আমি দেখতে এসেছিলুম।"

"আমাকে জিজ্ঞাসা করতে সবুর সয় নি ?"

"তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন তাই—"

"তাই আমার হুকুম উড়িয়ে দিতে হবে ?"

"তিনি তো এ-বাড়ির কর্ত্রী, কেমন করে জানব তাঁর হুকুম এখানে চলবে না ? তিনি যা বলবেন আমি তা মানব না এতবড়ো আস্পর্ধা আমার নেই। এই আমি তোমার কাছে বলছি, তিনি তো শুধু আমার মনিব নন তিনি আমার গুরুজন, তাঁকে যে মানব সে নিমক খেয়ে নয়, সে আমার ভক্তি থেকে।"

"নবীন, তোমাকে তো এতটুকু বেলা থেকে দেখছি, এ-সব বুদ্ধি তোমার নয়। জানি তোমার বুদ্ধি কে যোগায়। যাই হোক, আজ আর সময় নেই, কাল সকালের ট্রেনে তোমাদের দেশে যেতে হবে।"

"যে আজ্ঞে" বলেই নবীন দ্বিরুক্তি না করেই দ্রুত চলে গেল।

এত সংক্ষেপে "যে আজ্ঞে" মধুসূদনের একটুও ভালো লাগল না। নবীনের কান্নাকাটি করা উচিত ছিল, যদিও তাতে মধুসূদনের সংকল্পের ব্যত্যয় হত না। নবীনকে আবার ফিরে ডেকে বললে, "মাইনে চুকিয়ে নিয়ে যাও, কিন্তু এখন থেকে তোমাদের খরচপত্র যোগাতে পারব না।"

নবীন বললে, "তা জানি, দেশে আমার অংশে যে জমি আছে তাই আমি চাষ করে খাব।"

বলেই অন্য কোনো কথার অপেক্ষা না করেই সে চলে গেল।

মানুষের প্রকৃতি নানা বিরুদ্ধ ধাতু মিশোল করে তৈরি, তার একটা প্রমাণ এই যে, মধুসূদন নবীনকে গভীরভাবে স্নেহ করে। তার অন্য দুই ভাই রজবপুরে বিষয়সম্পত্তির কাজ নিয়ে পাড়াগাঁয়ে পড়ে আছে, মধুসূদন তাদের বড়ো একটা খোঁজ রাখে না। পিতার মৃত্যুর পরে নবীনকে মধুসূদন কলকাতায় আনিয়ে পড়াশুনো করিয়েছে এবং তাকে বরাবর রেখেছে নিজের কাছে। সংসারের কাজে নবীনের স্বাভাবিক পটুতা। তার কারণ সে খুব খাঁটি। আর একটা হচ্ছে, তার কথাবার্তায় ব্যবহারে সকলেই তাকে ভালোবাসে। এ-বাড়িতে যখন কোনো ঝগড়াঝাঁটি বাধে তখন নবীন সেটাকে সহজে মিটিয়ে দিতে পারে। নবীন সব কথায় হাসতে জানে, আর লোকদের শুধু কেবল সুবিচার করে না, এমন ব্যবহার করে যাতে প্রত্যেকেই মনে করে, তারই 'পরে বুঝি ওর বিশেষ পক্ষপাত।

নবীনকে মধুসূদন যে মনের সঙ্গে স্নেহ করে তার একটা প্রমাণ, মোতির মাকে মধুসূদন দেখতে পারে না। যার প্রতি ওর মমতা তার প্রতি ওর একাধিপত্য চাই। সেই কারণে মধুসূদন কেবল কল্পনা করে মোতির মা যেন নবীনের মন ভাঙাতেই আছে। ছোটো ভাইয়ের প্রতি ওর যে পৈতৃক অধিকার, বাইরে থেকে এক মেয়ে এসে সেটাতে কেবলই বাধা ঘটায়। নবীনকে মধুসূদন যদি বিশেষ ভালো না বাসত তাহলে অনেক দিন আগেই মোতির মার নির্বাসনদণ্ড পাকা হত।

মধুসূদন ভেবেছিল, এইটুকু কাজ সেরেই আবার একবার আপিসে চলে যাবে। কিন্তু কোনোমতেই মনের মধ্যে জোর পেলে না। কুমু সেই যে চিঠিখানা ছিঁড়ে দিয়ে চলে গেল সেই ছবিটি তার মনে গভীর করে আঁকা হয়ে গেছে। সে এক আশ্চর্য ছবি, এমনতরো কিছু সে কখনো মনে করতে পারত না। একবার তার চিরকালের সন্দেহ-করা

স্বভাববশত মধুসূদন ভেবেছিল, নিশ্চয় কুমু চিঠিখানা আগেই পড়ে নিয়েছে, কিন্তু কুমুর মুখে এমন একটি নির্মল সত্যের দীপ্তি আছে যে, বেশিক্ষণ তাকে অবিশ্বাস করা মধুসূদনের পক্ষেও অসম্ভব।

কুমুকে কঠিনভাবে শাসন করবার শক্তি মধুসূদন দেখতে দেখতে হারিয়ে ফেলেছে, এখন তার নিজের তরফে যে-সব অপূর্ণতা তাই তাকে পীড়া দিতে আরম্ভ করেছে। তার বয়স বেশি, এ-কথা আজ সে ভুলতে পারছে না। এমনকি তার যে চুলে পাক ধরেছে সেটা সে কোনোমতে গোপন করতে পারলে বাঁচে। তার রঙটা কালো বিধাতার সেই অবিচার এতকাল পরে তাকে তীব্র করে বাজছে। কুমুর মনটা কেবলই তার মুষ্টি থেকে ফসকে যাচ্ছে, তার কারণ মধুসূদনের রূপ ও যৌবনের অভাব এতে তার সন্দেহ নেই। এইখানেই সে নিরস্ত্র, সে দুর্বল। চাটুজ্যেদের ঘরের মেয়েকে বিয়ে করতে চেয়েছিল, কিন্তু সে যে এমন মেয়ে পাবে বিধাতা আগে থাকতেই যার কাছে তার হার মানিয়ে রেখে দিয়েছেন, এ সে মনেও করে নি। অথচ এ-কথা বলবারও জোর মনে নেই যে তার ভাগ্যে একজন সাধারণ মেয়ে হলেই ভালো হত যার উপরে তার শাসন খাটত।

মধুসূদন কেবল একটা বিষয়ে টেক্কা দিতে পারে। সে তার ধনে। তাই আজ সকালেই ঘরে জহরি এসেছিল। তার কাছ থেকে তিনটে আংটি নিয়ে রেখেছে, দেখতে চায় কোন্‌টাতে কুমুর পছন্দ। সেই আংটির কৌটা তিনটি পকেটে নিয়ে সে তার শোবার ঘরে গেল। একটা চুনি, একটা পান্না, একটা হীরের আংটি। মধুসূদন মনে-মনে একটি দৃশ্য কল্পনাযোগে দেখতে পাচ্ছে। প্রথমে সে যেন চুনির আংটির কৌটা অতি ধীরে ধীরে খুললে, কুমুর লুব্ধ চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তার পরে বেরোল পান্না, তাতে চক্ষু আরও প্রসারিত। তার পর হীরে, তার বহুমূল্য

উজ্জ্বলতায় রমণীর বিস্ময়ের সীমা নেই। মধুসূদন রাজকীয় গাম্ভীর্যের সঙ্গে বললে, তোমার যেটা ইচ্ছে পছন্দ করে নাও। হীরেটাই কুমু যখন পছন্দ করলে তখন তার লুব্ধতার ক্ষীণ সাহস দেখে ঈষৎ হাস্য করে মধুসূদন তিনটে আংটিই কুমুর তিন আঙুলে পরিয়ে দিলে। তার পরেই রাত্রে শয়নমঞ্চের যবনিকা উঠল।

মধুসূদনের অভিপ্রায় ছিল এই ব্যাপারটা আজ রাত্রের আহারের পর হবে। কিন্তু দুপুরবেলাকার দুর্যোগের পর মধুসূদন আর সবুর করতে পারলে না। রাত্রের ভূমিকাটা আজ অপরাহ্ণে সেরে নেবার জন্যে অন্তঃপুরে গেল।

গিয়ে দেখে কুমু একটা টিনের তোরঙ্গ খুলে শোবার ঘরের মেজেতে বসে গোছাচ্ছে। পাশে জিনিসপত্র কাপড়চোপড় ছড়ানো।

"এ কী কাণ্ড? কোথাও যাচ্ছ নাকি?"

"হাঁ।"

"কোথায়?"

"রজবপুরে।"

"তার মানে কী হল?"

"তোমার দেরাজ খোলা নিয়ে ঠাকুরপোদের শাস্তি দিয়েছ। সে-শাস্তি আমারই পাওনা।"

"যেয়ো না" বলে অনুরোধ করতে বসা একেবারেই মধুসূদনের স্বভাববিরুদ্ধ। তার মনটা প্রথমেই বলে উঠল—যাক না দেখি কতদিন থাকতে পারে। এক মুহূর্ত দেরি না করে হন হন করে ফিরে চলে গেল।

৩৬

মধুসূদন বাইরে গিয়ে নবীনকে ডেকে পাঠিয়ে বললে, "বড়োবউকে তোরা খেপিয়েছিস।"

"দাদা, কালই তো আমরা যাচ্ছি, তোমার কাছে ভয়ে-ভয়ে আর ঢোঁক গিলে কথা কব না। আমি আজ এই স্পষ্ট বলে যাচ্ছি, বড়োবউরানীকে খেপাবার জন্যে সংসারে আর কারও দরকার হবে না, তুমি একাই পারবে। আমরা থাকলে তবু যদি বা কিছু ঠাণ্ডা রাখতে পারতুম, কিন্তু সে তোমার সইল না।

মধুসূদন গর্জন করে উঠে বললে, "জেঠামি করিস নে। রজবপুরে যাবার কথা তোরাই ওকে শিখিয়েছিস।"

"এ-কথা ভাবতেই পারি নে তো শেখাব কী।"

"দেখ্, এই নিয়ে যদি ওকে নাচাস তোদের ভাল হবে না, স্পষ্টই বলে দিচ্ছি।"

"দাদা, এ-সব কথা বলছ কাকে? যেখানে বললে কাজে লাগে বলো গে।"

"তোরা কিছু বলিস নি?"

"এই তোমার গা ছুঁয়ে বলছি, কল্পনাও করি নি।"

"বড়োবউ যদি জেদ ধরে বসে তাহলে কী করবি তোরা?"

"তোমাকে ডেকে আনব। তোমার পাইক বরকন্দাজ পেয়াদা আছে, তুমি ঠেকাতে পার। তার পরে তোমার শত্রুপক্ষেরা এই যুদ্ধের সংবাদ যদি কাগজে রটায় তাহলে মেজোবউকে সন্দেহ করে বোসো না।"

মধুসূদন আবার তাকে ধমক দিয়ে বললে, "চুপ কর্! বড়োবউ যদি রজবপুরে যেতে চায় তো যাক, আমি ঠেকাব না।"

"আমরা তাঁকে খাওয়াব কী করে ?"

"তোমার স্ত্রীর গহনা বিক্রি করে। যা, যা বলছি। বেরো বলছি ঘর থেকে।"

নবীন বেরিয়ে গেল। মধুসূদন ওডিকলোন-ভিজনো পটি কপালে জড়িয়ে আবার একবার আপিসে যাবার সংকল্প মনে দৃঢ় করতে লাগল।

নবীনের কাছে মোতির মা সব কথা শুনে দৌড়ে গেল কুমুর শোবার ঘরে। দেখলে তখনও সে কাপড়চোপড় পাট করছে তোলবার জন্যে। বললে, "এ কী করছ, বউরানী।"

"তোমাদের সঙ্গে যাব।"

"তোমাকে নিয়ে যাবার সাধ্য কী আমার।"

"কেন ?"

"বড়ঠাকুর তাহলে আমাদের মুখ দেখবেন না।"

"তাহলে আমারও দেখবেন না।"

"তা সে যেন হল, আমরা যে বড়ো গরিব।"

"আমিও কম গরিব না, আমারও চলে যাবে।"

"লোকে যে বড়ঠাকুরকে নিয়ে হাসবে।"

"তা বলে আমার জন্যে তোমরা শাস্তি পাবে, এ আমি সইব না।"

"কিন্তু দিদি, তোমার জন্যে তো শাস্তি নয়, এ আমাদের নিজের পাপের জন্যেই।"

"কিসের পাপ তোমাদের ?"

"আমরাই তো খবর দিয়েছি তোমাকে।"

"আমি যদি খবর জানতে চাই তাহলে খবর দেওয়াটা অপরাধ ?"

"কর্তাকে না জানিয়ে দেওয়াটা অপরাধ।"

"তাই ভালো, অপরাধ তোমরাও করেছ আমিও করেছি। একসঙ্গেই ফল ভোগ করব।"

"আচ্ছা বেশ, তাহলে বলে দেব তোমার জন্যে পালকি। বড়ঠাকুরের হুকুম হয়েছে, তোমাকে বাধা দেওয়া হবে না। এখন তবে তোমার জিনিসগুলি গুছিয়ে দিই। ওগুলো নিয়ে যে যেমে উঠলে।"

দুজনে গোছাতে লেগে গেল।

এমন সময় কানে এল বাইরে জুতোর মচ মচ ধ্বনি। মোতির মা দিল দৌড়।

মধুসূদন ঘরে ঢুকেই বললে, "বড়োবউ, তুমি যেতে পারবে না।"

"কেন যেতে পারব না?"

"আমি হুকুম করছি বলে।"

"আচ্ছা, তাহলে যাব না। তার পরে আর কী হুকুম বলো।"

"বন্ধ করো তোমার জিনিস প্যাক করা।"

"এই বন্ধ করলুম।" বলে কুমু উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মধুসূদন বললে, "শোনো, শোনো।"

তখনই কুমু ফিরে এসে বললে, "কী বলো।"

বিশেষ কিছুই বলবার ছিল না। তবু একটু ভেবে বললে, "তোমার জন্যে আংটি এনেছি।"

"আমার যে-আংটির দরকার ছিল সে তুমি পরতে বারণ করেছ, আর আমার আংটির দরকার নেই।"

"একবার দেখোই-না চেয়ে।"

মধুসূদন একে একে কৌটো খুলে দেখালে। কুমু একটি কথাও বললে না।

"এর যেটা তোমার পছন্দ সেইটেই তুমি পরতে পার।"

"তুমি যেটা হুকুম করবে সেইটেই পরব।"

"আমি তো মনে করি তিনটেই তিন আঙুলে মানাবে।"

"হুকুম কর তিনটেই পরব।"

"আমি পরিয়ে দিই।"

"দাও পরিয়ে।"

মধুসূদন পরিয়ে দিলে। কুমু বললে, "আর কিছু হুকুম আছে?"

"বড়োবউ রাগ করছ কেন?"

"আমি একটুও রাগ করছি নে।" বলে কুমু আবার ঘর থেকে চলে গেল।

মধুসূদন অস্থির হয়ে বলে উঠল, "আহা, যাও কোথায়? শোনো, শোনো।"

কুমু তখনই ফিরে এসে বললে, "কী বলো।"

ভেবে পেলে না কী বলবে। মধুসূদনের মুখ লাল হয়ে উঠল।

ধিক্কার দিয়ে বলে উঠল, "আচ্ছা, যাও।" রেগে বললে, "দাও আংটি-গুলো ফিরিয়ে দাও।"

তখনই কুমু তিনটে আংটি খুলে টিপায়ের উপর রাখলে।

মধুসূদন ধমক দিয়ে বললে, "যাও চলে।"

কুমু তখনই চলে গেল।

এইবার মধুসূদন দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করলে যে, সে আপিসে যাবেই। তখন কাজের সময় প্রায় উত্তীর্ণ। ইংরেজ কর্মচারীরা সকলেই চলে গেছে টেনিস খেলায়। উচ্চতন বড়োবাবুদের দল উঠি-উঠি করছে। এমন সময় মধুসূদন আপিসে উপস্থিত হয়ে একেবারে খুব কষে কাজে লেগে গেল। ছটা বাজল, সাতটা বাজল, আটটা বাজে, তখন খাতাপত্র বন্ধ করে উঠে পড়ল।

৩৭

এতদিন মধুসূদনের জীবনযাত্রায় কখনো কোনো খেই ছিঁড়ে যেত না। প্রতি দিনের প্রতি মুহূর্তই নিশ্চিত নিয়মে বাঁধা ছিল। আজ হঠাৎ একটা অনিশ্চিত এসে সব গোলমাল বাধিয়ে দিয়েছে। এই যে আজ আপিস থেকে বাড়ির দিকে চলেছে, রাত্তিরটা যে ঠিক কী ভাবে প্রকাশ পাবে তা সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। মধুসূদন ভয়ে-ভয়ে বাড়িতে এল, আস্তে আস্তে আহার করলে। আহার করে তখনই সাহস হল না শোবার ঘরে যেতে। প্রথমে কিছুক্ষণ বাইরের দক্ষিণের বারান্দায় পায়চারি করে বেড়াতে লাগল। শোবার সময় ন-টা যখন বাজল তখন গেল অন্তঃপুরে। আজ ছিল দৃঢ় পণ—যথাসময়ে বিছানায় শোবে, কিছুতেই অন্যথা হবে না। শূন্য শোবার ঘরে ঢুকেই মশারি খুলেই একেবারে ঝপ করে বিছানার উপরে পড়ল। ঘুম আসতে চায় না। রাত্রি যতই নিবিড় হয় ততই ভিতরকার উপবাসী জীবটা অন্ধকারে ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসে। তখন তাকে তাড়া করবার কেউ নেই, পাহারাওআলারা সকলেই ক্লান্ত।

ঘড়িতে একটা বাজল, চোখে একটুও ঘুম নেই। আর থাকতে পারল না, বিছানা থেকে উঠে ভাবতে লাগল কুমু কোথায়? বঙ্কু ফরাশের উপর কড়া হুকুম, ফরাশখানা তালাচাবি দিয়ে বন্ধ। ছাদ ঘুরে এল, কেউ নেই। পায়ের জুতো খুলে ফেলে নীচের তলায় বারান্দা বেয়ে ধীরে ধীরে চলতে লাগল। মোতির মার ঘরেব সামনে এসে মনে হল যেন কথা-বার্তার শব্দ। হতে পারে কাল চলে যাবে আজ স্বামীস্ত্রীতে পরামর্শ চলছে। বাইরে চুপ করে দরজায় কান পেতে রইল। দুজনে গুন গুন করে আলাপ চলছে। কথা শোনা যায় না কিন্তু স্পষ্টই বোঝা

গেল দুটিই মেয়ের গলা। তবে তো বিচ্ছেদের পূর্বরাত্রে মোতির মায়ের সঙ্গে কুমুরই মনের কথা হচ্ছে। রাগে ক্ষোভে ইচ্ছে করতে লাগল, লাথি মেরে দরজা খুলে ফেলে একটা কাণ্ড করে। কিন্তু নবীনটা তাহলে কোথায়? নিশ্চয় বাইরে।

অন্তঃপুর থেকে বাইরে যাবার ঝিলমিল-দেওয়া রাস্তাটাতে লণ্ঠনে একটা টিম্‌টিমে আলো জ্বলছে, সেইখানে এসেই মধুসূদন দেখলে একখানা লাল শাল গায়ে জড়িয়ে শ্যামা দাঁড়িয়ে। তার কাছে লজ্জিত হয়ে মধুসূদন রেগে উঠল। বললে, "কী করছ এত রাত্রে এখানে?"

শ্যামা উত্তর করলে "শুয়ে ছিলুম। বাইরে পায়ের শব্দ শুনে ভয় হল, ভাবলুম বুঝি—

মধুসূদন তর্জন করে বলে উঠল, "আস্পর্ধা বাড়ছে দেখছি। আমার সঙ্গে চালাকি করতে চেয়ো না, সাবধান করে দিচ্ছি। যাও শুতে।"

শ্যামাসুন্দরী কয়দিন থেকে একটু একটু করে তার সাহসের ক্ষেত্র বাড়িয়ে বাড়িয়ে চলছিল। আজ বুঝলে, অসময়ে অজায়গায় পা পড়েছে। অত্যন্ত করুণ মুখ করে একবার সে মধুসূদনের দিকে চাইলে— তার পরে মুখ ফিরিয়ে আঁচলটা টেনে চোখ মুছলে। চলে যাবার উপক্রম করে আবার সে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে ডেকে বলে উঠল, "চালাকি করব না ঠাকুরপো। যা দেখতে পাচ্ছি তাতে চোখে ঘুম আসে না। আমরা তো আজ আসি নি, কতকালের সম্বন্ধ, আমরা সইব কী করে?" বলে শ্যামা দ্রুতপদে চলে গেল।

মধুসূদন একটুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, তার পরে চলল বাইরের ঘরে। ঠিক একেবারে পড়ল চৌকিদারের সামনে, সে তখন টহল দিতে বেরিয়েছে। এমনি নিয়মের কঠিন জাল যে, নিজের

বাড়িতে যে চুপি চুপি সঞ্চরণ করবে তার জো নেই। চারি দিকেই সতর্ক দৃষ্টির ব্যূহ। রাজাবাহাদুর এই রাত্রে বিছানা ছেড়ে খালি পায়ে অন্ধকারে বাইরের বারান্দায় ভূতের মতো বেরিয়েছে এ যে একেবারে অভূতপূর্ব। প্রথমে দূর থেকে যখন চিনতে পারে নি, চৌকিদার বলে উঠেছিল, "কোন্ হ্যায়?" কাছে এসে জিভ কেটে মস্ত প্রণাম করলে; বললে, "রাজাবাহাদুর, কিছু হুকুম আছে?"

মধুসূদন বললে, "দেখতে এলুম ঠিকমতো চলছে কি না।" কথাটা মধুসূদনের পক্ষে অসংগত নয়।

তার পরে মধুসূদন বৈঠকখানাঘরে গিয়ে দেখে, যা ভেবেছিল তাই, নবীন বসবার ঘরে গদির উপর তাকিয়া আঁকড়ে নিদ্রা দিচ্ছে। মধুসূদন ঘরে একটা গ্যাসের আলো জ্বেলে দিলে, তাতেও নবীনের ঘুম ভাঙল না। তাকে ঠেলা দিতেই ধড়ফড় করে জেগে সে উঠে বসল। মধুসূদন তার কোনোরকম কৈফিয়ত তলব না করেই বললে, "এখনই যা, বড়োবউকে বল্ গে আমি তাকে শোবার ঘরে ডেকে পাঠিয়েছি।" বলে তখনই সে অন্তঃপুরে চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরেই কুমু শোবার ঘরে এসে প্রবেশ করলে। মধুসূদন তার মুখের দিকে চাইলে। সাদাসিধে একখানি লালপেড়ে শাড়ি পরা। শাড়ির প্রান্তটি মাথার উপরে টানা। এই নির্জন ঘরের অল্প আলোয় এ কী অপরূপ আবির্ভাব। কুমু ঘরের প্রান্তের সোফাটির উপরে বসল।

মধুসূদন তখনই এসে বসল মেজের উপরে তার পায়ের কাছে। কুমু সংকুচিত হয়ে তাড়াতাড়ি ওঠবার চেষ্টা করবামাত্র মধুসূদন হাতে ধরে তাকে টেনে বসালে; বললে, "উঠো না, শোনো আমার কথা। আমাকে মাপ করো, আমি দোষ করেছি।"

মধুসূদনের এই অপ্রত্যাশিত বিনতি দেখে কুমু অবাক হয়ে রইল। মধুসূদন আবার বললে, "নবীনকে মেজোবউকে রজবপুরে যেতে আমি বারণ করে দেব। তারা তোমার সেবাতেই থাকবে।"

কুমু কী যে বলবে কিছুই ভেবে পেলে না। মধুসূদন ভাবলে, নিজের মান খর্ব করে আমি বড়োবউয়ের মান ভাঙব। হাত ধরে মিনতি করে বললে, "আমি এখনই আসছি, বলো তুমি চলে যাবে না।"

কুমু বললে, "না, যাব না।"

মধুসূদন নীচে চলে গেল। মধুসূদন যখন ক্ষুদ্র হয়, কঠোর হয়, তখন সেটা কুমুদিনীর পক্ষে তেমন কঠিন নয়। কিন্তু আজ তার এই নম্রতা, এই তার নিজেকে খর্ব করা, এর সম্বন্ধে কুমুর যে কী উত্তর তা সে ভেবে পায় না। হৃদয়ের যে-দান নিয়ে সে এসেছিল সে তো সব স্খলিত হয়ে পড়ে গেছে, আর তো তা ধুলো থেকে কুড়িয়ে নিয়ে কাজ চলবে না। আবার সে ঠাকুরকে ডাকতে লাগল, "প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুম্।"

খানিক বাদে মধুসূদন নবীন ও মোতির মাকে সঙ্গে নিয়ে কুমুর সামনে উপস্থিত করলে। তাদের সম্বোধন করে বললে, "কাল তোমাদের রজবপুরে যেতে বলেছিলাম, কিন্তু তার দরকার নেই। কাল থেকে বড়োবউয়ের সেবায় আমি তোমাদের নিযুক্ত করে দিচ্ছি।"

শুনে ওরা দুজনে অবাক হয়ে গেল। একে তো এমন হুকুম প্রত্যাশা করে নি, তার পরে এত রাত্তিরে ওদের ডেকে এনে এ কথা বলবার জরুরি দরকার কী ছিল।

মধুসূদনের ধৈর্য সবুর মানছিল না। আজ রাত্তিরেই কুমুর মনকে ফেরাবার জন্যে উপায় প্রয়োগ করতে কার্পণ্য বা সংকোচ করতে পারলে না। এমন করে নিজের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ সে জীবনে কখনো করে নি। সে

যা চেয়েছিল তা পাবার জন্যে তার পক্ষে সব চেয়ে দুঃসাধ্য মূল্য সে দিলে। তার ভাষায় সে কুমুকে বুঝিয়ে দিলে, তোমার কাছে আমি অসংকোচে হার মানছি।

এইবার কুমুর মনে বড়ো একটা সংকোচ এল, সে ভাবতে লাগল এই জিনিসটাকে কেমন করে সে গ্রহণ করবে? এর বদলে কী আছে তার দেবার? বাইরে থেকে জীবনে যখন বাধা আসে তখন লড়াই করবার জোর পাওয়া যায়, তখন স্বয়ং দেবতাই হন সহায়। হঠাৎ সেই বাইরের বিরুদ্ধতা একেবারে নিরস্ত হলে যুদ্ধ থামে কিন্তু সন্ধি হতে চায় না। তখন বেরিয়ে পড়ে নিজের ভিতরের প্রতিকূলতা। কুমু হঠাৎ দেখতে পেলে, মধুসূদন যখন উদ্ধত ছিল তখন তার সঙ্গে ব্যবহার অপ্রিয় হোক তবুও তা সহজ ছিল; কিন্তু মধুসূদন যখন নম্র হয়েছে তখন তার সঙ্গে ব্যবহার কুমুর পক্ষে বড়ো শক্ত হয়ে উঠল। এখন তার ক্ষুব্ধ অভিমানের আড়াল থাকে না, তার সেই ফরাশখানার আশ্রয় চলে যায়, এখন দেবতার কাছে হাত জোড় করবার কোনো মানে নেই।

মোতির মাকে কোনো ছুতোয় কুমু যদি রাখতে পারত তা হলে সে বেঁচে যেত। কিন্তু নবীন গেল চলে, হতবুদ্ধি মোতির মাও আস্তে আস্তে চলল তার পিছনে; দরজার কাছে এসে একবার মুখ আড় করে উদ্বিগ্নভাবে কুমুদিনীর মুখের দিকে চেয়ে গেল। স্বামীর প্রসন্নতার হাত থেকে এই মেয়েটিকে এখন কে বাঁচাবে?

মধুসূদন বললে, "বড়োবউ, কাপড় ছেড়ে শুতে আসবে না?"

কুমু ধীরে ধীরে উঠে পাশের নাবার ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করলে— মুক্তির মেয়াদ যতটুকু পারে বাড়িয়ে নিতে চায়। সে-ঘরে দেওয়ালের কাছে একটা চৌকি ছিল সেইটেতে বসে রইল। তার ব্যাকুল দেহটা

যেন নিজের মধ্যে নিজের অন্তরাল খুঁজছে। মধুসূদন মাঝে মাঝে দেওয়ালের ঘড়িটার দিকে তাকায় আর হিসেব করতে থাকে, কাপড় ছাড়বার জন্যে কতটা সময় দরকার। ইতিমধ্যে আয়নাতে নিজের মুখটা দেখলে, মাথার তেলোর যে-জায়গাটাতে কড়া চুলগুলো বেমানান-রকম খাড়া হয়ে থাকে বৃথা তার উপরে কয়েকবার বুরুশের চাপ লাগালে, আর গায়ের কাপড়ে অনেকখানি দিলে ল্যাভেণ্ডার ঢেলে।

পনেরো মিনিট গেল; বেশ-বদলের পক্ষে সে-সময়টা যথেষ্ট। মধুসূদন চুপি চুপি একবার নাবার ঘরের দরজার কাছে কান দিয়ে দাঁড়াল, ভিতরে নড়াচড়ার কোনো শব্দ নেই—মনে ভাবলে কুমু হয়তো চুলটার বাহার করছে, খোঁপাটা নিয়ে ব্যস্ত। মেয়েরা সাজ করতে ভালোবাসে মধুসূদনেরও এ-আন্দাজটা ছিল, অতএব সবুর করতেই হবে। আধঘণ্টা হল—মধুসূদন আর-একবার দরজার উপর কান লাগালে, এখনও কোনো শব্দ নেই। ফিরে এসে কেদারায় বসে পড়ে খাটের সামনের দেয়ালে বিলিতি যে-ছবিটা ঝোলানো ছিল তার দিকে তাকিয়ে রইল। হঠাৎ এক সময়ে ধড়ফড় করে উঠে রুদ্ধ দ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে ডাক দিলে, "বড়োবউ, এখনও হয় নি?"

একটু পরেই আস্তে আস্তে দরজা খুলে গেল। কুমুদিনী বেরিয়ে এল, যেন সে স্বপ্নে-পাওয়া। যে-কাপড় পরা ছিল তাই আছে; এ তো রাত্রে শোবার সাজ নয়। গায়ে একখানা প্রায় পুরো হাতা-ওয়ালা ব্রাউন রঙের সার্জের জামা, একটা লালপেড়ে বাদামি রঙের আলোয়ানের আঁচল মাথার উপর টেনে-দেওয়া। দরজার একটা পাল্লায় বাঁ হাত রেখে যেন কী দ্বিধার ভাবে দাঁড়িয়ে রইল—একখানি অপরূপ ছবি। নিটোল গৌরবর্ণ হাতে মকরমুখো প্লেন সোনার বালা—সেকেলে ছাঁদের—বোধ হয় এককালে তার মায়ের ছিল। এই মোটা ভারী বালা

তার সুকুমার হাতকে যে-ঐশ্বর্যের মর্যাদা দিয়েছে সেটি ওর পক্ষে এত সহজ যে, ওই অলংকারটা ওর শরীরে একটুমাত্র আড়ম্বরের সুর দেয় নি। মধুসূদন ওকে আবার যেন নতুন করে দেখলে। ওর মহিমায় আবার সে বিস্মিত হল। মধুসূদনের চিরার্জিত সমস্ত সম্পদ এতদিন পরে শ্রীলাভ করেছে এ-কথা না মনে করে সে থাকতে পারলে না। সংসারে যে-সব লোকের সঙ্গে মধুসূদনের সর্বদা দেখাসাক্ষাৎ তাদের অধিকাংশের চেয়ে নিজেকে ধনগৌরবে অনেক বড়ো মনে করা তার অভ্যাস। আজ গ্যাসের আলোতে শোবার ঘরের দরজার পাশে ওই যে মেয়েটি স্তব্ধ দাঁড়িয়ে তাকে দেখে মধুসূদনের মনে হল, আমার যথেষ্ট ধন নেই; মনে হল, যদি রাজচক্রবর্তী সম্রাট হতুম তা হলেই ওকে এ-ঘরে মানাত। যেন প্রত্যক্ষ দেখতে পেলে, এর স্বভাবটি জন্মাবধি লালিত একটি বিশুদ্ধ বংশমর্যাদার মধ্যে—অর্থাৎ এ যেন এর জন্মের পূর্ববর্তী বহু দীর্ঘকালকে অধিকার করে দাঁড়িয়ে। সেখানে বাইরে থেকে যে-সে প্রবেশ করতেই পারে না—সেখানেই আপন স্বাভাবিক স্বত্ব নিয়ে বিরাজ করছে বিপ্রদাস—তাকেও ওই কুমুর মতোই একটি আত্মবিস্মৃত সহজ গৌরব সর্বদা ঘিরে রয়েছে।

মধুসূদন এই কথাটাই কিছুতে সহ্য করতে পারে না। বিপ্রদাসের মধ্যে ঔদ্ধত্য একটুও নেই, আছে একটা দূরত্ব। অতিবড়ো আত্মীয়ও যে হঠাৎ এসে তার পিঠ চাপড়িয়ে বলতে পারে "কী হে, কেমন?" এ যেন অসম্ভব। বিপ্রদাসের কাছে মধুসূদন মনে মনে কী-রকম খাটো হয়ে থাকে সেইটেতে তার রাগ ধরে। সেই একই সূক্ষ্ম কারণে কুমুর উপরে মধুসূদন জোর করতে পারছে না—আপন সংসারে যেখানে সব চেয়ে তার কর্তৃত্ব করবার অধিকার সেইখানেই সে যেন সব চেয়ে হটে গিয়েছে। কিন্তু এখানে তার রাগ হয় না—

কুমুর প্রতি আকর্ষণ দুর্নিবার বেগে প্রবল হয়ে ওঠে। আজ কুমুকে দেখে মধুসূদন স্পষ্টই বুঝলে, কুমু তৈরি হয়ে আসে নি—একটা অদৃশ্য আড়ালের পিছনে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু, কী সুন্দর। কী একটা দীপ্যমান শুচিতা, শুভ্রতা। যেন নির্জন তুষারশিখরের উপরে নির্মল উষা দেখা দিয়েছে।

মধুসূদন একটু কাছে এগিয়ে এসে ধীর স্বরে বলল, "শুতে আসবে না বড়োবউ?"

কুমু আশ্চর্য হয়ে গেল। সে নিশ্চয় মনে করেছিল, মধুসূদন রাগ করবে, তাকে অপমানের কথা বলবে। হঠাৎ একটা চিরপরিচিত স্বর তার মনে পড়ে গেল—তার বাবা স্নিগ্ধ গলায় কেমন করে তার মাকে বড়োবউ বলে ডাকতেন। সেই সঙ্গেই মনে পড়ল, মা তার বাবাকে কাছে আসতে বাধা দিয়ে কেমন করে চলে গিয়েছিলেন। এক মুহূর্তে তার চোখ ছলছলিয়ে এল—মাটিতে মধুসূদনের পায়ের কাছে বসে পড়ে বলে উঠল, "আমাকে মাপ করো।"

মধুসূদন তাড়াতাড়ি তার হাত ধরে তুলে চৌকির উপরে বসিয়ে বললে, "কী দোষ করেছ যে তোমাকে মাপ করব?"

কুমু বললে, "এখনও আমার মন তৈরি হয় নি। আমাকে একটুখানি সময় দাও।"

মধুসূদনের মনটা শক্ত হয়ে উঠল; বললে, "কিসের জন্যে সময় দিতে হবে বুঝিয়ে বলো।"

"ঠিক বলতে পারছি নে, কাউকে বুঝিয়ে বলা শক্ত—"

মধুসূদনের কণ্ঠে আর রস রইল না। সে বললে, "কিছুই শক্ত না। তুমি বলতে চাও, আমাকে তোমার ভালো লাগছে না।"

কুমুর পক্ষে মুশকিল হল। কথাটা সত্যি অথচ সত্যি নয়। হৃদয়

ভরে নৈবেদ্য দেবার জন্যেই সে পণ করে আছে, কিন্তু সে নৈবেদ্য এখনও এসে পৌঁছল না। মন বলছে, একটু সবুর করলেই, পথে বাধা না দিলে, এসে পৌঁছবে; দেরি যে আছে তাও না। তবুও এখনও ডালা যে শূন্য সে-কথা মানতেই হবে।

কুমু বললে, "তোমাকে ফাঁকি দিতে চাই নে বলেই বলছি, একটু আমাকে সময় দাও!"

মধুসূদন ক্রমেই অসহিষ্ণু হতে লাগল—কড়া করেই বললে, "সময় দিলে কী সুবিধে হবে! তোমার দাদার সঙ্গে পরামর্শ করে স্বামীর ঘর করতে চাও!"

মধুসূদনের তাই বিশ্বাস। সে ভেবেছে বিপ্রদাসের অপেক্ষাতেই কুমুর সমস্ত ঠেকে আছে। দাদা যেমনটি চালাবে, ও তেমনি চলবে। বিদ্রূপের সুরে বললে, "তোমার দাদা তোমার গুরু!"

কুমুদিনী তখনই মাটি থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "হ্যাঁ, আমার দাদা আমার গুরু।"

"তাঁর হুকুম না হলে আজ কাপড় ছাড়বে না, বিছানায় শুতে আসবে না! তাই নাকি?"

কুমুদিনী হাতের মুঠো শক্ত করে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

"তাহলে টেলিগ্রাফ করে হুকুম আনাই,— রাত অনেক হল।"

কুমু কোনো জবাব না দিয়ে ছাতে যাবার দরজার দিকে চলল।

মধুসূদন গর্জন করে ধমকে উঠে বললে, "যেয়ো না বলছি।"

কুমু তখনই ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, "কী চাও, বলো।"

"এখনই কাপড় ছেড়ে এস।" ঘড়ি খুলে বললে, "পাঁচ মিনিট সময় দিচ্ছি।"

কুমু তখনই নাবার ঘরে গিয়ে কাপড় ছেড়ে শাড়ির উপর একখানা মোটা চাদর জড়িয়ে চলে এল। এখন দ্বিতীয় হুকুমের জন্যে তার অপেক্ষা। মধুসূদন দেখে বেশ বুঝলে এও রণসাজ; রাগ বেড়ে উঠল, কিন্তু কী করতে হবে ভেবে পায় না। প্রবল ক্রোধের মুখেও মধুসূদনের মনে ব্যবস্থাবুদ্ধি থাকে; তাই সে থমকে গেল। বললে, "এখন কী করতে চাও আমাকে বলো।"

"তুমি যা বলবে তাই করব।"

মধুসূদন হতাশ হয়ে বসে পড়ল চৌকিতে। ওই চাদরে-জড়ানো মেয়েটিকে দেখে মনে হল, এ যেন বিধবার মূর্তি—ওর স্বামী আর ওর মাঝখানে যেন একটা নিস্তব্ধ মৃত্যুর সমুদ্র। তর্জন করে এ সমুদ্র পার হওয়া যায় না। পালে কোন্ হাওয়া লাগলে তরী ভাসবে? কোনো দিন কি ভাসবে?

চুপ করে বসে রইল। ঘড়ির টিক টিক শব্দ ছাড়া ঘরে একটুও শব্দ নেই। কুমুদিনী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল না—আবার ফিরে বাইরে ছাতের অন্ধকারের দিকে চোখ মেলে ছবির মতো দাঁড়িয়ে রইল। রাস্তার মোড় থেকে একটা মাতালের গদ্‌গদ কণ্ঠের গানের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে, আর প্রতিবেশীর আস্তাবলের একটা কুকুরের বাচ্ছাকে বেঁধে রেখেছে, রাত্রির শান্তি ঘুলিয়ে দিয়ে উঠছে তারই অশ্রান্ত আর্তনাদ।

সময় একটা অতলস্পর্শ গর্তের মতো শূন্য হয়ে যেন হাঁ করে আছে। মধুসূদনের সংসারের কলের সমস্ত চাকাই যেন বন্ধ। কাল তার আপিসের অনেক কাজ, ডাইরেক্টারদের মীটিং,—কতকগুলো কঠিন প্রস্তাব অনেকের বাধা সত্ত্বেও কৌশলে পাস করিয়ে নিতে হবে। সে-সমস্ত জরুরি ব্যাপার আজ তার কাছে একেবারে ছায়ার মতো। আগে

হলে কালকের দিনের কার্যপ্রণালী আজ রাত্রে নোটবইয়ে টুকে রাখত। সব চিন্তা দূরে গেল, জগতে যে কঠিন সত্য সুনিশ্চিত সে হচ্ছে চাদর দিয়ে ঢাকা ওই মেয়ে, ঘরের থেকে বেরিয়ে যাবার পথে স্তব্ধ দাঁড়িয়ে। খানিক বাদে মধুসূদন একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে, ঘরটা যেন ধ্যান ভেঙে চমকে উঠল। দ্রুত চৌকি থেকে উঠে কুমুর কাছে গিয়ে বললে, "বড়োবউ, তোমার মন কি পাথরে-গড়া ?"

ওই বড়োবউ শব্দটা কুমুর মনে মন্ত্রের মতো কাজ করে। নিজের মধ্যে তার মায়ের জীবনের অনুবৃত্তি হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এই ডাকে তার মা কতদিন কত সহজে সাড়া দিয়েছিলেন, তারই অভ্যাসটা যেন কুমুরও রক্তের মধ্যে। তাই চকিতে সে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াল। মধুসূদন গভীর কাতরতার সঙ্গে বললে, "আমি তোমার অযোগ্য, কিন্তু আমাকে কি দয়া করবে না ?"

কুমুদিনী ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল, "ছি ছি, অমন করে ব'লো না।" মাটিতে পড়ে মধুসূদনের পায়ের ধুলো নিয়ে বললে, "আমি তোমার দাসী, আমাকে তুমি আদেশ করো।"

মধুসূদন তাকে হাত ধরে তুলে নিয়ে বুকে চেপে ধরলে, বললে, "না, তোমাকে আদেশ করব না, তুমি আপন ইচ্ছাতে আমার কাছে এস।"

কুমুদিনী মধুসূদনের বাহুবন্ধনে হাঁপিয়ে উঠল। কিন্তু নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করলে না। মধুসূদন রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে বললে, "না, তোমাকে আদেশ করব না, তবু তুমি আমার কাছে এস।" এই বলে কুমুদিনীকে ছেড়ে দিলে।

কুমুদিনীর গৌরবর্ণ মুখ লাল হয়ে উঠেছে। সে চোখ নিচু করে বললে, "তুমি আদেশ করলে আমার কর্তব্য সহজ হয়। আমি নিজে ভেবে কিছু করতে পারি নে।"

"আচ্ছা, তুমি তোমার ওই গায়ের চাদরখানা খুলে ফেলো—ওটাকে আমি দেখতে পারছি নে।"

সসংকোচে কুমুদিনী চাদরখানা খুলে ফেললে। গায়ে ছিল একখানি ডুরে শাড়ি, সরু পাড়ের। কালো ডোরার ধারাগুলি কুমুদিনীর তনুদেহটিকে ঘিরে, যেন তারা রেখার ঝরনা—থেমে আছে মনে হয় না, কেবলই যেন চলছে—যেন কোনো একটি কালো দৃষ্টি আপন অশ্রান্ত গতির চিহ্ন রেখে রেখে ওর অঙ্গকে ঘিরে ঘিরে প্রদক্ষিণ করছে, কিছুতে শেষ করতে পারছে না। মুগ্ধ হয়ে গেল মধুসূদন, অথচ সেই মুহূর্তে একটু লক্ষ্য না করে থাকতে পারলে না যে, ওই শাড়িটি এখানকার দেওয়া নয়। কুমুদিনীকে যতই মানাক না কেন, এর দাম তুচ্ছ এবং এটা ওর বাপের বাড়ির। ওই নাবার ঘরের সংলগ্ন কাপড় ছাড়বার ঘরে আছে দেরাজওয়ালা মেহগিনি কাঠের মস্ত আলমারি, তার আয়না-দেওয়া পাল্লা—বিবাহের পূর্ব হতেই নানা রকমের দামি কাপড়ে ঠাসা। সেগুলির উপরে লোভ নেই—মেয়ের এত গর্ব! মনে পড়ে গেল সেই তিনটে আংটির কথা, অসহ্য ঔদাসীন্যে তাকে কুমু গ্রহণ করে নি, অথচ একটা লক্ষ্মীছাড়া নীলার আংটির জন্যে কত আগ্রহ। বিপ্রদাস আর মধুসূদনের মধ্যে কুমুর মমতার কত মূল্যভেদ। চাদর খোলবামাত্র এই সমস্ত কথা দমকা ঝড়ের মতো মধুসূদনকে প্রকাণ্ড ধাক্কা দিলে। কিন্তু হায় রে, কী সুন্দর, কী আশ্চর্য সুন্দর। আর এই দৃপ্ত অবজ্ঞা, সেও যেন ওর অলংকার। এই মেয়েই তো পারে ঐশ্বর্যকে অবজ্ঞা করতে। সহজ সম্পদে মহীয়সী হয়ে জন্মেছে—ওকে ধনের দাম কষতে হয় না, হিসেব রাখতে হয় না—মধুসূদন ওকে কী দিয়ে লোভ দেখাতে পারে।

মধুসূদন বললে, "যাও তুমি শুতে যাও।"

কুমু ওর মুখের দিকে চেয়ে রইল—নীরব প্রশ্ন এই যে, তুমি আগে বিছানায় যাবে না?

মধুসূদন দৃঢ়স্বরে পুনরায় বললে, "যাও আর দেরি কোরো না।" কুমু বিছানায় যখন প্রবেশ করলে মধুসূদন সোফার উপরে বসে বললে, "এইখানেই বসে রইলুম, যদি আমাকে ডাক তবেই যাব। বৎসরের পর বৎসর অপেক্ষা করতে রাজি আছি।"

কুমুর সমস্ত গা এল ঝিম ঝিম করে—এ কী পরীক্ষা তার! কার দরজায় সে আজ মাথা কুটবে? দেবতা তো তাকে সাড়া দিলেন না। যে-পথ দিয়ে সে এখানে এল সে তো একেবারেই ভুল পথ। বিছানায় বসে বসে মনে-মনে সে বললে, "ঠাকুর, তুমি আমাকে কখনও ভোলাতে পার না, এখনও তোমাকে বিশ্বাস করব। ধ্রুবকে তুমিই বনে এনেছিলে, বনের মধ্যে তাকে দেখা দেবে বলে।"

সেই নিস্তব্ধ ঘরে আর শব্দ নেই; রাস্তার মোড়ে সেই মাতালটার গলা শোনা যায় না; কেবল সেই বন্দী কুকুরটা যদিও শ্রান্ত তবু মাঝে মাঝে আর্তনাদ করে উঠছে।

অল্প সময়কেও অনেক সময় বলে মনে হল, স্তব্ধতার ভারগ্রস্ত প্রহর যেন নড়তে পারছে না। এই কি তার দাম্পত্যের অনন্তকালের ছবি? দু পারে দুজনে নীরবে বসে—রাত্রির শেষ নেই—মাঝখানে একটা অলঙ্ঘনীয় নিস্তব্ধতা! অবশেষে এক সময়ে কুমু তার সমস্ত শক্তিকে সংহত করে নিয়ে বিছানা থেকে বেরিয়ে এসে বললে, "আমাকে অপরাধিনী কোরো না।"

মধুসূদন গম্ভীরকণ্ঠে বললে, "কী চাও বলো, কী করতে হবে?" শেষ কথাটুকু পর্যন্ত একেবারে নিংড়ে বের করে নিতে চায়।

কুমু বললে, "শুতে এস।"

কিন্তু একেই কি বলে জিত?

৩৮

পরের দিন সকালে মোতির মা যখন কুমুর জন্যে এক বাটি দুধ নিয়ে এল, দেখলে কুমুর দুই চোখ লাল, ফুলে আছে, মুখের রঙ হয়েছে পাঁশের মতো। সকালে ছাদের যে-কোণে আসন পেতে পুব দিকে মুখ করে সে মানসিক পূজায় বসে, ভেবেছিল সেইখানেই কুমুকে দেখতে পাবে। কিন্তু আজ সেখানে নেই, সিঁড়ি দিয়ে উঠেই যে একটুখানি ঢাকা ছাদ, সেইখানেই দেয়ালের গায়ে অবসন্নভাবে ঠেসান দিয়ে সে মাটিতে ব'সে। আজ বুঝি ঠাকুরের উপর রাগ করেছে। নিরপরাধ ছেলেকে নিষ্ঠুর বাপ যখন অকারণ মারে তখন সে যেমন কিছুই বুঝতে পারে না, অভিমান ক'রে আঘাত গায়ে পেতে নেয়, প্রতিবাদ করবারও চেষ্টা করতে মুখে বাধে, ঠাকুরের 'পরে কুমুর আজ সেই রকম ভাব। যে-আহ্বানকে সে দৈব বলে মেনেছিল, সে কি এই অশুচিতার মধ্যে, এই আন্তরিক অসতীত্বে? ঠাকুর নারীবলি চান বলেই শিকার ভুলিয়ে এনেছেন নাকি;—যে-শরীরটার মধ্যে মন নেই সেই মাংসপিণ্ডকে করবেন তাঁর নৈবেদ্য? আজ কিছুতে ভক্তি জাগল না। এতদিন কুমু বার বার করে বলেছে, আমাকে তুমি সহ্য করো—আজ বিদ্রোহিণীর মন বলছে, তোমাকে আমি সহ্য করব কী করে? কোন্ লজ্জায় আনব তোমার পূজা? তোমার ভক্তকে নিজে না গ্রহণ করে তাকে বিক্রি করে দিলে কোন্ দাসীর হাটে—যে হাটে মাছমাংসের দরে মেয়ে বিক্রি হয়, যেখানে নির্মাল্য নেবার জন্যে কেউ শ্রদ্ধার সঙ্গে পূজার অপেক্ষা করে না, ছাগলকে দিয়ে ফুলের বন মুড়িয়ে খাইয়ে দেয়।

মোতির মা যখন দুধ খাবার জন্যে অনুরোধ করলে, কুমু বললে, 'থাক্।"

মোতির মা বললে, "কেন, থাকবে কেন? আমার দুধের বাটির অপরাধ কী?"

কুমু বললে, "এখনও স্নান করি নি, পূজা করি নি।"

মোতির মা বললে, "যাও তুমি স্নান করতে, আমি অপেক্ষা করে থাকব।"

কুমু স্নান সেরে এল। মোতির মা ভাবলে, এইবার সে খোলা ছাদের কোণটাতে গিয়ে বসবে। কুমু মুহূর্তের জন্যে অভ্যাসের টানে ছাদের দিকে যেতে পা বাড়িয়েছিল, গেল না, ফিরে আবার সেই মাটিতে এসে বসল। তার মন তৈরি ছিল না।

মোতির মাকে কুমু জিজ্ঞাসা করলে, "দাদার চিঠি কি আসে নি?"

চিঠি খুব সম্ভব এসেছে মনে করেই আজ খুব ভোরে মোতির মা নিজে লুকিয়ে আপিস-ঘরে গিয়ে চিঠির দেরাজটা টানতে গিয়ে দেখলে সেটা চাবি দিয়ে বন্ধ। অতএব এখন থেকে চুরির উপর বাটপাড়ি করবার রাস্তা আটক রইল।

মোতির মা বললে, "ঠিক বলতে তো পারি নে, খবর নিয়ে দেখব।"

এমন সময় হঠাৎ শ্যামা এসে উপস্থিত; বললে, "বউ, তোমাকে এমন শুকনো দেখি যে, অসুখ করে নি তো?"

কুমু বললে, "না।"

"বাড়ির জন্যে মনটা কেমন করছে। আহা, তা তো হতেই পারে। তা তোমার দাদা তো আসছেন, দেখা হবে।"

কুমু চমকে উঠে শ্যামার মুখের দিকে উৎসুক দৃষ্টিতে চাইলে।

মোতির মা জিজ্ঞাসা করলে, "এ খবর তুমি কোথায় পেলে বকুলফুল?"

"ওই শোনো! এ তো সবাই জানে। আমাদের রান্নাঘরের পার্বতী যে বললে, ওঁর বাপের বাড়ির সরকার এসেছিল রাজাবাহাদুরের কাছে,

বউয়ের খবর নিতে; তার কাছে শুনেছে, চিকিৎসার জন্যে বউয়ের দাদা আজকালের মধ্যেই কলকাতায় আসছেন।"

কুমু উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "তাঁর ব্যামো কি বেড়েছে?"

"তা বলতে পারিনে। তবে এমন কিছু ভাবনার কথা নেই, তাহলে শুনতুম।"

শ্যামা বুঝেছিল, ওর দাদার খবর মধুসূদন কুমুকে দেয় নি, যে-বউয়ের মন পায় নি, পাছে সে বাড়িমুখো হয়ে আরও অন্যমনস্ক হয়ে যায়। কুমুর মনটাকে উসকিয়ে দিয়ে বললে, "তোমার দাদার মতো মানুষ হয় না, এই কথা সবার কাছেই শুনি। বকুলফুল, চলো, দেরি হয়ে যাচ্ছে, ভাঁড়ার দিতে হবে। আপিসের রান্না চড়াতে দেরি হলে মুশকিল বাধবে।"

মোতির মা দুধের বাটিটা আর-একবার কুমুর কাছে এগিয়ে নিয়ে বললে, "দিদি, দুধ ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, খেয়ে ফেলো লক্ষ্মীটি।"

এবার কুমু দুধ খেতে আপত্তি করলে না।

মোতির মা কানে-কানে জিজ্ঞাসা করলে, "ভাঁড়ার-ঘরে যাবে আজ?"

কুমু বললে, "আজ থাক্; গোপালকে আমার কাছে একবার পাঠিয়ে দাও।"

একটা কালো কঠোর ক্ষুধিত জরা বাহির থেকে কুমুকে গ্রাস করেছে রাহুর মতো। যে পরিণত বয়স শান্ত স্নিগ্ধ শুভ্র সুগম্ভীর, এ তো তা নয়; যা লালায়িত, যার সংযমের শক্তি শিথিল, যার প্রেম বিষয়াসক্তিরই স্বজাতীয়, তারই স্বেদাক্ত স্পর্শে কুমুর এত বিতৃষ্ণা। ওর স্বামীর বয়স বেশি বলে কুমুর কোনো আক্ষেপ ছিল না, কিন্তু সেই বয়স নিজের মর্যাদা ভুলেছে বলে তার এত পীড়া। সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন একটা ফলের মতো, আলো-হাওয়ায় মুক্তির মধ্যে সে পাকে, কাঁচা ফলকে জাঁতায় পিষলেই

তো পাকে না। সময় পেল না বলেই আজ ওদের সম্বন্ধ কুমুকে এমন করে মারছে, এত অপমান করছে। কোথায় পালাবে। মোতির মাকে ওই যে বললে, গোপালকে ডেকে দাও, সে এই পালাবার পথ খোঁজা—বৃদ্ধ অশুচিতার কাছ থেকে নবীন নির্মলতার মধ্যে, দূষিত নিশ্বাসবাষ্প থেকে ফুলের বাগানের হাওয়ায়।

... একটা পাতলা তুলো-ভরা ছিটের জামা গায়ে দিয়ে হাবলু সিঁড়ির দরজার কাছে এসে ভয়ে ভয়ে দাঁড়াল। ওর মায়ের মতোই বড়ো বড়ো কালো চোখ, তেমনিই জল-ভরা মেঘের মতো সরস শামলা রঙ, গাল দুটো ফুলো ফুলো, প্রায় ন্যাড়া করে চুল ছাঁটা।

কুমু উঠে গিয়ে সংকুচিত হাবলুকে টেনে এনে বুকে চেপে ধরলে; বললে, "দুষ্টু ছেলে, এ দুদিন আস নি কেন?"

হাবলু কুমুর গলা জড়িয়ে ধরে কানে-কানে বললে, "জেঠাইমা, তোমার জন্যে কী এনেছি বলো দেখি?"

কুমু তার গালে চুমু খেয়ে বললে, "মানিক এনেছ গোপাল।"

"আমার পকেটে আছে।"

"আচ্ছা, তবে বের করো।"

"তুমি বলতে পারলে না।"

"আমার বুদ্ধি নেই, যা চোখে দেখি তাও বুঝতে পারি নে, যা না দেখি তা আরও ভুল বুঝি।"

তখন হাবলু খুব আস্তে আস্তে পকেট থেকে ব্রাউন কাগজের একটা পুঁটুলি বের করে কুমুর কোলের উপর রেখে দৌড়ে পালাবার উপক্রম করলে।

"না, তোমাকে পালাতে দেব না।"

পুঁটুলিটা হাত দিয়ে চাপা দিয়ে ব্যস্ত হয়ে হাবলু বললে, "তাহলে এখন দেখো না।"

"না, ভয় নেই, তুমি চলে গেলে তখন খুলব।"

"আচ্ছা জেঠাইমা, তুমি জটাইবুড়িকে দেখেছ?"

"কী জানি, হয়তো দেখে থাকব, কিন্তু চিনতে সময় লাগে।"

"একতলায় উঠোনের পাশে কয়লার ঘরে সন্ধ্যের সময় চামচিকের পিঠে চড়ে সে আসে।"

"চামচিকের পিঠে চড়ে সে আসে?"

"ইচ্ছে করলেই সে খুব ছোট্ট হতে পারে, চোখে প্রায় দেখাই যায় না।"

"সেই মন্তরটা তার কাছে শিখে নিতে হবে তো।"

"কেন, জ্যেঠাইমা?"

"আমি যদি পালাবার জন্যে কয়লার ঘরে ঢুকি তবুও যে আমাকে দেখতে পাওয়া যায়।"

হাবলু এ-কথাটার কোনো মানে বুঝতে পারলে না। বললে, "কয়লার মধ্যে সিঁদুরের কৌটো লুকিয়ে রেখেছে। সেই সিঁদুর কোথা থেকে এনেছে জান?"

"বোধ হয় জানি।"

"আচ্ছা, বলো দেখি।"

"ভোরবেলাকার মেঘের ভিতর থেকে।"

হাবুল থমকে গেল। তাকে ভাবিয়ে দিলে। বিশেষ-সংবাদদাতা তাকে সাগরপারের দৈত্যপুরীর কথা বলেছিল। কিন্তু জেঠাইমার কথাটা মনে হল বিশ্বাসযোগ্য, তাই কোনো বিরুদ্ধ তর্ক না তুলে বললে, "যে-মেয়ে সেই কৌটো খুঁজে বের করে সিঁদুরটিপ কপালে পরবে, সে হবে রাজরানী।"

"সর্বনাশ! কোনো হতভাগিনী খবর পেয়েছে নাকি?"

"সেজোপিসিমার মেয়ে খুদি জানে। ঝুড়ি নিয়ে ছন্নু যখন সকালে ডিম বের করতে যায় রোজ খুদি সেইসঙ্গে যায়—ও একটুও ভয় করে না।"

"ও-যে ছেলেমানুষ, তাই রাজরানী হতেও ভয় নেই।"

বাইরে ঠাণ্ডা উত্তরে হাওয়া দিচ্ছিল তাই মোতিকে নিয়ে কুমু ঘরে গেল; সেখানে সোফায় বসে ওকে কোলে তুলে নিলে। পাশের তেপাইয়ে ছোটো রুপোর থালিতে ছিল শীতকালের ফুল—গাঁদা, কুন্দ, দোপাটি, জবা। প্রতিদিনের জোগান-মতো এই ফুলই মালীর তোলা। কুমু ছাদের কোণে বসে সূর্যোদয়ের দিকে মুখ করে দেবতাকে উৎসর্গ করে দেবে বলে এরা অপেক্ষা করে আছে। আজ তার সেই অনিবেদিত ফুল থালাসুদ্ধ নিয়ে সে হাবলুর কাছে ধরল; বললে, "নেবে ফুল?"

"হাঁ নেব।"

"কী করবে বলো তো?"

"পুজো-পুজো খেলব!"

কুমুর কোমরে একটা সিল্কের রুমাল গোঁজা ছিল, সেইটেতে ফুলগুলি বেঁধে দিয়ে ওকে চুমো খেয়ে বললে, "এই নাও।" মনে-মনে ভাবলে, "আমারও পুজো-পুজো খেলা হল।" বললে, "গোপাল, এর মধ্যে কোন্ ফুল তোমার সবচেয়ে ভালো লাগে, বলো তো?"

হাবলু বললে, "জবা।"

"কেন জবা ভালো লাগে বলব?"

"বলো দেখি।"

"ও যে ভোর না হতেই জটাইবুড়ির সিঁদুরের কৌটো থেকে রঙ চুরি করেছে।"

হাবলু খানিকক্ষণ গম্ভীর হয়ে বসে ভাবলে। হঠাৎ বলে উঠল, "জেঠাইমা, জবাফুলের রঙ ঠিক তোমার শাড়ির এই লাল পাড়ের মতো।" এইটুকুতে ওর মনের সব কথা বলা হয়ে গেল।

এমন সময় হঠাৎ পিছনে দেখে মধুসূদন। পায়ের শব্দ পাওয়া যায় নি। এখন অন্তঃপুরে আসবার সময় নয়। এই সময়টাতে বাইরের আপিস-ঘরে ব্যাবসা-ঘটিত কর্মের যত উচ্ছিষ্ট পরিশিষ্ট এসে জোটে; এই সময় দালাল আসে, উমেদার আসে, যত রকম খুচরো খবর ও কাগজপত্র নিয়ে সেক্রেটারি আসে। আসল কাজের চেয়ে এই-সব উপরি-কাজের ভিড় কম নয়।

৩৯

যে-ভিক্ষুকের ঝুলিতে কেবল তুষ জমেছে, চাল জোটে নি, তারই মতো মন নিয়ে আজ সকালে মধুসূদন খুব রুক্ষভাবেই বাইরে চলে গিয়েছিল। কিন্তু অতৃপ্তির আকর্ষণ বড়ো প্রচণ্ড। বাধাতেই বাধার উপর টেনে আনে।

ওকে দেখেই হাবলুর মুখ শুকিয়ে গেল, বুক উঠল কেঁপে, পালাবার উপক্রম করলে। কুমু জোর করে চেপে ধরলে, উঠতে দিলে না।

সেটা মধুসূদন বুঝতে পারলে। হাবলুকে খুব একটা ধমক দিয়ে বললে, "এখানে কী করছিস? পড়তে যাবি নে?"

গুরুমশায়ের আসবার সময় হয় নি, এ-কথা বলবার সাহস হাবলুর ছিল না—ধমকটাকে নিঃশব্দে স্বীকার করে নিয়ে মাথা হেঁট করে আস্তে আস্তে উঠে চলল।

তাকে বাধা দেবার জন্য উদ্যত হয়েই কুমু থেমে গেল। বললে, "তোমার ফুল ফেলে গেলে যে, নেবে না?" বলে সেই রুমালের

পুঁটুলিটা ওর সামনে তুলে ধরলে। হাবলু না নিয়ে ভয়ে ভয়ে তার জেঠামশায়ের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

মধুসূদন ফস্ করে পুঁটুলিটা কুমুর হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "এ রুমালটা কার?"

মুহূর্তের মধ্যে কুমুর মুখ লাল হয়ে উঠল ; বললে, "আমার।"

এ রুমালটা যে সম্পূর্ণই কুমুর, তাতে সন্দেহ নেই—অর্থাৎ বিবাহের পূর্বের সম্পত্তি। এতে রেশমের কাজ করা যে-পাড়টা সেও কুমুর নিজের রচনা।

ফুলগুলো বের করে মাটিতে ফেলে মধুসূদন রুমালটা পকেটে পুরলে; বললে, "এটা আমিই নিলুম—ছেলেমানুষ এ নিয়ে কী করবে? যা তুই।"

মধুসূদনের এই রূঢ়তায় কুমু একেবারে স্তম্ভিত। ব্যথিতমুখে হাবলু চলে গেল, কুমু কিছুই বললে না।

তার মুখের ভাব দেখে মধুসূদন বললে, "তুমি তো দানসত্র খুলে বসেছ, ফাঁকি কি আমারই বেলায়? এ-রুমাল রইল আমারই মনে থাকবে কিছু পেয়েছি তোমার কাছ থেকে।"

মধুসূদন যা চায় তা পাবার বিরুদ্ধে ওর স্বভাবের মধ্যেই বাধা।

কুমু চোখ নিচু করে সোফার প্রান্তে নীরবে বসে রইল। শাড়ির লাল পাড় তার মাথা ঘিরে মুখটিকে বেষ্টন করে নেমে এসেছে, তারই সঙ্গে সঙ্গে নেমেছে তার ভিজে এলো চুল। কণ্ঠের নিটোল কোমলতাকে বেষ্টন করে আছে একগাছি সোনার হার। এই হারটি ওর মায়ের, তাই সর্বদা পরে থাকে। তখনও জামা পরে নি, ভিতরে কেবল একটি শেমিজ, হাত দুখানি খোলা, কোলের উপরে স্তব্ধ। অতি সুকুমার শুভ্র হাত, সমস্ত দেহের বাণী ওইখানে যেন উদ্বেল। মধুসূদন নতনেত্রে অভিমানিনীকে

চেয়ে-চেয়ে দেখলে, আর চোখ ফেরাতে পারলে না মোটা সোনার কাঁকন-পরা ওই দুখানি হাতের থেকে। সোফায় ওর পাশে বসে একখানি হাত টেনে নিতে চেষ্টা করলে—অনুভব করলে বিশেষ একটা বাধা। কুমু হাত সরাতে চায় না— ওর হাত দিয়ে চাপা আছে একটা কাগজের মোড়ক।

মধুসূদন জিজ্ঞাসা করলে, "ওই কাগজে কী মোড়া আছে?"

"জানি নে।"

"জান না, তার মানে কী?"

"তার মানে আমি জানি নে।"

মধুসূদন কথাটা বিশ্বাস করলে না; বললে, "আমাকে দাও, আমি দেখি।"

কুমু বললে, "ও আমার গোপন জিনিস, দেখাতে পারব না।"

তীরের মতো তীক্ষ্ণ একটা রাগ এক মুহূর্তে মধুসূদনের মাথায় চড়ে উঠল। বললে, "কী! আস্পর্ধা তো কম নয়।" বলে জোর করে সেই কাগজের মোড়ক কেড়ে নিয়ে খুলে ফেললে—দেখে যে কিছুই নয়, কতকগুলি এলাচদানা। মাতার সস্তা ব্যবস্থায় হাবলুর জন্যে যে জলখাবার বরাদ্দ তার মধ্যে এইটেই বোধ করি সবচেয়ে হাবলুর পক্ষে লোভনীয়—তাই সে যত্ন করে মুড়ে এনেছিল।

মধুসূদন অবাক! ব্যাপারখানা কী! ভাবলে, বাপের বাড়িতে এই রকম জলখাবারই কুমুর অভ্যস্ত—তাই লুকিয়ে আনিয়ে নিয়েছে, লজ্জায় প্রকাশ করতে চায় না। মনে-মনে হাসলে; ভাবলে, লক্ষ্মীর দান গ্রহণ করতে সময় লাগে। ধাঁ করে একটা প্ল্যান মাথায় এল। দ্রুত উঠে বাইরে গেল চলে।

কুমু তখন দেরাজ খুলে বের করলে তার একটি ছোটো চৌকো চন্দন-কাঠের বাক্স, তার মধ্যে এলাচদানাগুলি রেখে তার দাদাকে চিঠি লিখতে

বসল। দু-চার লাইন লেখা হতেই মধুসূদন ঘরে এসে উপস্থিত। তাড়াতাড়ি চিঠি চাপা দিয়ে কুমু শক্ত হয়ে বসল। মধুসূদনের হাতে রুপোয় সোনায় মিনের-কাজ-করা হাতল-দেওয়া একটি ফলদানি, তার উপরে ফুলকাটা সুগন্ধি একটি রেশমের রুমাল। হাসিমুখে ডেস্কে সেটি কুমুর সামনে রাখলে। বললে, "খুলে দেখো তো।"

কুমু রুমালটা তুলে নিয়ে দেখে, সেই দামি ফলদানিতে কানায়-কানায় ভরা এলাচদানা। যদি একলা থাকত হেসে উঠত। কোনো কথা না বলে কুমু গম্ভীর হয়ে চুপ করে রইল। এর চেয়ে হাসা ভালো ছিল।

মধুসূদন বললে, "এলাচদানা লুকিয়ে খাবার কী দরকার? এতে লজ্জা কী বলো। রোজ আনিয়ে দেব—কত চাও? আমাকে আগে বললে না কেন?"

কুমু বললে, "তুমি পারবে না আনিয়ে দিতে।"

"পারব না? অবাক করলে তুমি।"

"না, পারবে না।"

"অসম্ভব দাম নাকি এর!"

"হাঁ, টাকায় মেলে না।"

শুনেই মধুর মাথায় চট্ করে একটা সন্দেহ জাগল—বললে, "তোমার দাদা পার্সেল করে পাঠিয়েছেন বুঝি।"

এ-প্রশ্নের জবাব দিতে কুমুর ইচ্ছে হল না। ফলদানিটা ঠেলে দিয়ে চলে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়াল। মধুসূদন হাত ধরে আবার জোর করে তাকে বসিয়ে দিলে।

মধুসূদনকে কোনো কথা বলতে না দিয়েই কুমু তাকে প্রশ্ন করলে, "দাদার বাড়ি থেকে তোমার কাছে লোক এসেছিল তাঁর খবর নিয়ে?"

এ-কথাটা কুমু আগেই শুনে ফেলেছে জেনে মধুর মন ভারি বিরক্ত

হয়ে উঠল। বললে, "সেই খবর দেবার জন্যেই তো আজ সকালে তোমার কাছে এসেছি।" বলা বাহুল্য, এটা মিথ্যে কথা।

"দাদা কবে আসবেন ?"

"হপ্তাখানেকের মধ্যে।"

মধু নিশ্চিত জানত, কালই বিপ্রদাস আসবে, 'হপ্তাখানেক' কথাটা ব্যবহার করে খবরটাকে অনির্দ্দিষ্ট করে রেখে দিলে।

"দাদার শরীর কি আরও খারাপ হয়েছে ?"

"না, তেমন কিছু তো শুনলুম না।"

এ-কথাটার মধ্যেও একটুখানি পাশ-কাটানো ছিল। বিপ্রদাস চিকিৎসার জন্যই কলকাতায় আসছে—তার অর্থ, শরীর অন্তত ভালো নেই।

"দাদার চিঠি কি এসেছে ?"

"চিঠির বাক্স তো এখনও খুলি নি, যদি থাকে তোমাকে পাঠিয়ে দেব।"

কুমু মধুসূদনের কথা অবিশ্বাস করতে আরম্ভ করে নি, সুতরাং এ-কথাটাও মেনে নিলে।

"দাদার চিঠি এসেছে কি না একবার খোঁজ করবে কি ?"

"যদি এসে থাকে, খাওয়ার পরে দুপুরবেলা নিজেই নিয়ে আসব।"

কুমু অধৈর্য দমন করে নীরবে সম্মত হল। তখন আর-একবার মধুসূদন কুমুর হাতখানা টেনে নেবার উপক্রম করছে এমন সময় শ্যামা হঠাৎ ঘরের মধ্যে ঢুকেই বলে উঠল, "ওমা, ঠাকুরপো যে!" বলেই বেরিয়ে যেতে উদ্যত।

মধুসূদন বললে, "কেন, কী চাই তোমার ?"

"বউকে ভাঁড়ারে ডাকতে এসেছি। রাজরানী হলেও ঘরের লক্ষ্মী তো বটে। তা আজ না-হয় থাক্।" মধুসূদন সোফা থেকে উঠে কোনো কথা না বলে দ্রুত বাইরে চলে গেল।

আহারের পর যথারীতি শোবার ঘরে খাটে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে পান চিবোতে চিবোতে মধুসূদন কুমুকে ডেকে পাঠালে। তাড়াতাড়ি কুমু চলে এল। সে জানে আজ দাদার চিঠি পাবে। শোবার ঘরে ঢুকে খাটের পাশে দাঁড়িয়ে রইল।

মধুসূদন গুড়গুড়ির নলটা রেখে পাশে দেখিয়ে দিয়ে বললে, "ব'সো।"

কুমু বসল। মধুসূদন তাকে যে-চিঠি দিলে তাতে কেবল এই কয়টি কথা আছে—

প্রাণপ্রতিমাসু

শুভাশীর্বাদরাশয়ঃ সন্তু

চিকিৎসার জন্য শীঘ্রই কলিকাতায় যাইতেছি। সুস্থ হইলে তোমাকে দেখিতে যাইব। গৃহকর্মের অবকাশমতো মাঝে মাঝে কুশল-সংবাদ দিলে নিরুদ্বিগ্ন হই।

এই ছোটো চিঠিটুকু মাত্র পেয়ে কুমুর মনে প্রথমে একটা ধাক্কা লাগল। মনে মনে বললে, "পর হয়ে গেছি।" অভিমানটা প্রবল হতে না হতেই মনে এল, "দাদার হয়তো শরীর ভালো নেই, আমার কী ছোটো মন। নিজের কথাটাই সব-আগে মনে পড়ে।"

মধুসূদন বুঝতে পারলে কুমু উঠি-উঠি করছে; বললে, "যাচ্ছ কোথায়, একটু ব'সো।"

কুমুকে তো বসতে বললে, কিন্তু কী কথা বলবে মাথায় আসে না। অবিলম্বে কিছু বলতেই হবে, তাই সকাল থেকে যে-কথাটা নিয়ে ওর মনে খটকা রয়েছে সেইটেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল। বললে, "সেই এলাচদানার ব্যাপারটা নিয়ে এত হাঙ্গামা করলে কেন? ওতে লজ্জার কথা কী ছিল।"

"ও আমার গোপন কথা।"

"গোপন কথা! আমার কাছেও বলা চলে না?"

"না।"

মধুসূদনের গলা কড়া হয়ে এল, বললে, "এ তোমাদের নূরনগরি চাল, দাদার ইস্কুলে শেখা।"

কুমু কোনো জবাব করলে না। মধুসূদন তাকিয়া ছেড়ে উঠে বসল, "ওই চাল তোমার না যদি ছাড়াতে পারি তাহলে আমার নাম মধুসূদন না।"

"কী তোমার হুকুম, বলো।"

"সেই মোড়ক কে তোমাকে দিয়েছিল বলো।"

"হাবলু।"

"হাবলু! তা নিয়ে এত ঢাকাঢাকি কেন।"

"ঠিক বলতে পারি নে।"

"আর কেউ তার হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে?"

"না।"

"তবে?"

"ওই পর্যন্তই, আর কোনো কথা নেই।"

"তবে এত লুকোচুরি কেন?"

"তুমি বুঝতে পারবে না।"

কুমুর হাত চেপে ধরে ঝাঁকানি দিয়ে মধু বললে, "অসহ্য তোমার বাড়াবাড়ি।"

কুমুর মুখ লাল হয়ে উঠল, শান্তস্বরে বললে, "কী চাও তুমি, বুঝিয়ে বলো। তোমাদের চাল আমার অভ্যেস নেই সে-কথা মানি।"

মধুসূদনের কপালের শিরদুটো ফুলে উঠল। কোনো জবাব ভেবে না পেয়ে ইচ্ছে হল ওকে মারে। এমন সময় বাইরে থেকে গলা-খাঁকারি

শোনা গেল, সেই সঙ্গে আওয়াজ এল, "আপিসের সায়েব এসে বসে আছে।" মনে পড়ল আজ ডাইরেক্টরদের মিটিং। লজ্জিত হল যে সে এজন্যে প্রস্তুত হয় নি—সকালটা প্রায় সম্পূর্ণ ব্যর্থ গেছে। এতবড়ো শৈথিল্য এতই ওর স্বভাব ও অভ্যাস -বিরুদ্ধ যে, এটা সম্ভব হল দেখে ও স্তম্ভিত।

৪০

মধুসূদন চলে যেতেই কুমু খাট থেকে নেমে মেজের উপর বসে পড়ল। চিরজীবন ধরে এমন সমুদ্রে কি তাকে সাঁতার কাটতে হবে যার কূল কোথাও নেই? মধুসূদন ঠিকই বলেছে ওদের সঙ্গে তার চাল তফাত। আর সকল রকম তফাতের চেয়ে এইটেই দুঃসহ। কী উপায় আছে এর?

এক সময় হঠাৎ কী মনে পড়ল, কুমু চলল নীচের তলায় মোতির মার ঘরের দিকে। সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় দেখে, শ্যামাসুন্দরী উপরে উঠে আসছে।

"কী বউ, চলেছ কোথায়? আমি যাচ্ছিলুম তোমার ঘরেই।"

"কোনো কথা আছে?"

"এমন কিছু নয়। দেখলুম ঠাকুরপোর মেজাজ কিছু চড়া, ভাবলুম তোমাকে একবার জিজ্ঞাসা করে জানি, নতুন প্রণয়ে খটকা বাধল কোন্‌খানটাতে। মনে রেখো বউ, ওর সঙ্গে কী রকম করে বনিয়ে চলতে হয় সে-পরামর্শ আমরাই দিতে পারি। বকুলফুলের ঘরে চলেছ বুঝি? তা যাও, মনটা খোলসা করে এস গে।"

আঁজ হঠাৎ কুমুর মনে হল, শ্যামাসুন্দরী আর মধুসূদন একই মাটিতে গড়া এক কুমোরের চাকে। কেন এ-কথা মাথায় এল বলা শক্ত। চরিত্র বিশ্লেষণ করে কিছু বুঝেছে তা নয়, আকারে-প্রকারে বিশেষ যে মিল তাও

নয়, তবু দুজনের ভাবগতিকের একটা অনুপ্রাস আছে, যেন শ্যামাসুন্দরীর জগতে আর মধুসূদনের জগতে একই হাওয়া। শ্যামাসুন্দরী যখন বন্ধুত্ব করতে আসে তাও কুমুকে উলটো দিকে ঠেলা দেয়, গা কেমন করে ওঠে।

মোতির মার শোবার ঘরে ঢুকেই কুমু দেখলে, নবীনে তাতে মিলে কী একটা নিয়ে হাত-কাড়াকাড়ি চলছে। ফিরে যাবে-যাবে মনে করছে, এমন সময় নবীন বলে উঠল, "বৌদিদি, যেয়ো না যেয়ো না। তোমার কাছেই যাচ্ছিলুম; নালিশ আছে।"

"কিসের নালিশ?"

"একটু ব'সো, দুঃখের কথা বলি।"

তক্তপোশের উপর কুমু বসল।

নবীন বললে, "বড়ো অত্যাচার! এই ভদ্রমহিলা আমার বই রেখেছেন লুকিয়ে।"

"এমন শাসন কেন?"

"ঈর্ষা,—যেহেতু নিজে ইংরেজি পড়তে পারেন না। আমি স্ত্রীশিক্ষার পক্ষে, কিন্তু উনি স্বামী-জাতির এডুকেশনের বিরোধী। আমার বুদ্ধির যতই উন্নতি হচ্ছে, ওঁর বুদ্ধির সঙ্গে ততই গরমিল হওয়াতে ওঁর আক্রোশ। অনেক করে বোঝালেম যে, এতবড়ো যে সীতা তিনিও রামচন্দ্রের পিছনে পিছনেই চলতেন; বিদ্যেবুদ্ধিতে আমি যে তোমার চেয়ে অনেক দূরে এগিয়ে এগিয়ে চলছি এতে বাধা দিয়ো না।"

"তোমার বিদ্যের কথা মা সরস্বতী জানেন, কিন্তু বুদ্ধির বড়াই করতে এসো না বলছি।"

নবীনের মহা বিপদের ভান-করা মুখভঙ্গি দেখে কুমু খিল খিল করে হেসে উঠল। এ-বাড়িতে এসে অবধি এমন মন খুলে হাসি এই ওর প্রথম।

এই হাসি নবীনের বড়ো মিষ্টি লাগল। সে মনে-মনে বললে, "এই আমার কাজ হল, আমি বউরানীকে হাসাব।"

কুমু হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলে, "কেন ভাই ঠাকুরপোর বই লুকিয়ে রেখেছ।"

"দেখো তো দিদি। শোবার ঘরে কি ওঁর পাঠশালার গুরুমশায় বসে আছেন? খেটেখুটে রাত্তিরে ঘরে এসে দেখি, একটা পিদ্দিম জ্বলছে, তার সঙ্গে আর-একটা বাতির সেজ, মহাপণ্ডিত পড়তে বসে গেছেন। খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যায়, তাগিদের পর তাগিদ, হুঁশ নেই।"

"সত্যি ঠাকুরপো?"

"বউরানী, খাবার ভালোবাসি নে এতবড়ো তপস্বী নই, কিন্তু তার চেয়ে ভালোবাসি ওঁর মুখের মিষ্টি তাগিদ। সেইজন্যেই ইচ্ছে করে খেতে দেরি হয়ে যায়, বই পড়াটা একটা অছিলে।"

"ওঁর সঙ্গে কথায় হার মানি।"

"আর আমি হার মানি যখন উনি কথা বন্ধ করেন।"

"তাও কখনো ঘটে নাকি ঠাকুরপো?"

"দুটো একটা খুব তাজা দৃষ্টান্ত দিই তা হলে। অশ্রুজলের উজ্জ্বল অক্ষরে মনে লেখা রয়েছে।"

"আচ্ছা আচ্ছা, তোমার আর দৃষ্টান্ত দিতে হবে না। এখন আমার চাবি কোথায় বলো। দেখো তো দিদি, আমার চাবি লুকিয়ে রেখেছেন।"

"ঘরের লোকের নামে তো পুলিস-কেস করতে পারি নে, তাই চোরকে চুরি দিয়ে শাসন করতে হয়। আগে দাও আমার বই।"

"তোমাকে দেব না, দিদিকে দিচ্ছি।" ঘরের কোণে একটা ঝুড়িতে রেশম-পশম, টুকরা কাপড়, ছেঁড়া মোজা জমে ছিল; তারই তলা

থেকে একখানা ইংরেজি সংক্ষিপ্ত এন্সাইক্লোপীডিয়ার দ্বিতীয় খণ্ড বের করে মোতির মা কুমুর কোলের উপর রেখে বললে, "তোমার ঘরে নিয়ে যাও দিদি, ওঁকে দিয়ো না; দেখি তোমার সঙ্গে কী রকম রাগারাগি করেন।"

নবীন মশারির চালের উপর থেকে চাবি তুলে নিয়ে কুমুর হাতে দিয়ে বললে, "আর কাউকে দিয়ো না বউদিদি, দেখব আর কেউ তোমার সঙ্গে কী রকম ব্যবহার করেন।"

কুমু বইয়ের পাতা ওলটাতে ওলটাতে বললে, "এই বইয়ে বুঝি ঠাকুরপোর শখ?"

"ওঁর শখ নেই এমন বই নেই। সেদিন কোথা থেকে একখানা গো-পালন জুটিয়ে নিয়ে পড়তে বসে গেছেন।"

"নিজের দেহরক্ষার জন্যে ওটা পড়ি নে, অতএব এতে লজ্জার কারণ কিছু নেই।"

"দিদি, তোমার কী একটা কথা বলবার আছে। চাও তো, এই বাচালটিকে এখনই বিদায় করে দিই।"

"না, তার দরকার নেই। আমার দাদা দুই-একদিনের মধ্যে আসবেন শুনেছি।"

নবীন বললে, "হাঁ, তিনি কালই আসবেন।"

"কাল!" বিস্মিত হয়ে কুমু খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইল। নিশ্বাস ফেলে বললে, "কী করে তাঁর সঙ্গে দেখা হবে?"

মোতির মা জিজ্ঞাসা করলে, "তুমি বড়ঠাকুরকে কিছু বল নি?"

কুমু মাথা নেড়ে জানালে যে—না।

নবীন বললে, "একবার বলে দেখবে না?"

কুমু চুপ করে রইল। মধুসূদনের কাছে দাদার কথা বলা বড়ো

কঠিন। দাদার প্রতি অপমান ওর ঘরের মধ্যে উদ্যত, তাকে একটুও নাড়া দিতে ওর অসহ্য সংকোচ।

কুমুর মুখের ভাব দেখে নবীনের মন ব্যথিত হয়ে উঠল। বললে, "ভাবনা ক'রো না বউদিদি, আমরা সব ঠিক করে দেব, তোমাকে কিছু বলতে কইতে হবে না।"

দাদার কাছে নবীনের শিশুকাল থেকে অত্যন্ত একটা ভীরুতা আছে। বউদিদি এসে আজ সেই ভয়টা ওর মন থেকে ভাঙালে বুঝি।

কুমু চলে গেলে মোতির মা নবীনকে বললে, "কী উপায় করবে বলো দেখি? সেদিন রাত্রে তোমার দাদা যখন আমাদের ডেকে নিয়ে এসে বউয়ের কাছে নিজেকে খাটো করলেন তখনই বুঝেছিলুম সুবিধে হল না। তার পর থেকে তোমাকে দেখলেই তো মুখ ফিরিয়ে চলে যান।"

"দাদা বুঝেছেন যে, ঠকা হল, ঝোঁকের মাথায় থলি উজাড় করে আগাম দাম দেওয়া হয়ে গেছে, এদিকে ওজনমতো জিনিস মিলল না। আমরা ওঁর বোকামির সাক্ষী ছিলুম তাই আমাদের সইতে পারছেন না।"

মোতির মা বললে, "তা হোক, কিন্তু বিপ্রদাসবাবুর উপরে রাগটা ওঁকে যেন পাগলামির মতো পেয়ে বসেছে, দিনে দিনে বেড়েই চলল। এ কী অনাছিষ্টি বলো দিকি।"

নবীন বললে, "ও মানুষের ভক্তির প্রকাশ ওই রকমই। এই জাতের লোকেরাই ভিতরে ভিতরে যাকে শ্রেষ্ঠ বলে জানে বাইরে তাকে মারে। কেউ কেউ বলে, রামের প্রতি রাবণের অসাধারণ ভক্তি ছিল, তাই বিশ হাত দিয়ে নৈবেদ্য চালাত। আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি, দাদার সঙ্গে বউরানীর দেখাসাক্ষাৎ সহজে হবে না।"

"তা বললে চলবে না, কিছু উপায় করতেই হবে।"

"উপায় মাথায় এসেছে।"

"কী বলো দেখি।"

"বলতে পারব না।"

"কেন বলো তো?"

লজ্জা বোধ করছি।"

"আমাকেও লজ্জা?"

"তোমাকেই লজ্জা।"

"কারণটা শুনি?"

"দাদাকে ঠকাতে হবে। সে তোমার শুনে কাজ নেই।"

"যাকে ভালোবাসি তার জন্যে ঠকাতে একটুও সংকোচ করি নে।"

"ঠকানো বিদ্যের আমার উপর দিয়েই হাত পাকিয়েছ বুঝি?"

"ও-বিদ্যে সহজে খাটাবার উপযুক্ত এমন মানুষ পাব কোথায়!"

"ঠাকুরুণ, রাজিনামা লিখে-পড়ে দিচ্ছি, যখন খুশী ঠকিয়ো।"

"এত ফুর্তি কেন শুনি?"

"বলব? বিধাতা তোমাদের হাতে ঠকাবার যে-সব উপায় দিয়েছেন তাতে মধু দিয়েছেন ঢেলে। সেই মধুময় ঠকানোকেই বলে মায়া।"

"সেটা তো কাটানোই ভালো।"

"সর্বনাশ! মায়া গেলে সংসারে রইল কী? মূর্তির রঙ খসিয়ে ফেললে বাকি থাকে খড় মাটি। দেবী, অবোধকে ভোলাও, ঠকাও, চোখে ঘোর লাগাও, মনে নেশা জাগাও, যা খুশি করো।"

এর পরে যা কথাবার্তা চলল সে একেবারেই কাজের কথা নয়, এ গল্পের সঙ্গে তার কোনো যোগ নেই।

৪১

মীটিঙে এইবার মধুসূদনের প্রথম হার। এ পর্যন্ত ওর কোনো প্রস্তাব, কোনো ব্যবস্থা কেউ কখনো টলায় নি। নিজের 'পরে ওর বিশ্বাস যেমন, ওর প্রতি ওর সহযোগীদেরও তেমনি বিশ্বাস। এই ভরসাতেই মীটিঙে কোনো জরুরি প্রস্তাব পাকা করে নেবার আগেই কাজ অনেকদূর এগিয়ে রাখে। এবারে পুরোনো নীলকুঠিওআলা একটা পত্তনি তালুক ওদের নীলের কারবারের শামিল কিনে নেবার বন্দোবস্ত করছিল। এ নিয়ে খরচপত্রও হয়ে গেছে। প্রায় সমস্তই ঠিকঠাক; দলিল স্ট্যাম্পে চড়িয়ে রেজেস্টারি করে দাম চুকিয়ে দেবার অপেক্ষা; যে-সব লোক নিযুক্ত করা আবশ্যক তাদের আশা দিয়ে রাখা হয়েছে; এমন সময় এই বাধা। সম্প্রতি ওদের কোনো ট্রেজারারের পদ খালি হওয়াতে সম্পর্কীয় একটি জামাতার জন্য উমেদারি চলেছিল, অযোগ্য-উদ্ধারণে উৎসাহ না থাকাতে মধুসূদন কান দেয় নি। সেই ব্যাপারটা বীজের মতো মাটি চাপা থেকে হঠাৎ বিরুদ্ধতার আকারে অঙ্কুরিত হয়ে উঠল। একটু ছিদ্রও ছিল। তালুকের মালেক মধুসূদনের দূরসম্পর্কীয় পিসির ভাশুরপো। পিসি যখন হাতে-পায়ে এসে ধরে তখন ও হিসেব করে দেখলে, নেহাত সস্তায় পাওয়া যাবে, মুনফাও আছে, তার উপরে আত্মীয়দের কাছে মুরুব্বিয়ানা করবার গৌরব। যাঁর অযোগ্য জামাই ট্রেজারার-পদ থেকে বঞ্চিত, তিনিই মধুসূদনের স্বজনবাৎসল্যের প্রমাণ বহু সন্ধানে আবিষ্কার ও যথাস্থানে প্রচার করেছেন। তা ছাড়া কোম্পানির সকল রকম কেনাবেচায় মধুসূদন যে গোপনে কমিশন নিয়ে থাকেন, এই মিথ্যা সন্দেহ কানে-কানে সঞ্চারিত করবার ভারও তিনিই নিয়েছিলেন। এ-সকল নিন্দার প্রমাণ অধিকাংশ লোক দাবি করে না, কারণ তাদের নিজের

ভিতরে যে-লোভ আছে সেই হচ্ছে অন্তরতম ও প্রবলতম সাক্ষী। লোকের মনকে বিগড়িয়ে দেওয়া একটা কারণে সহজ ছিল, সে কারণ হচ্ছে মধুসূদনের অসামান্য শ্রীবৃদ্ধি, এবং তার খাঁটি চরিত্রের অসহ্য সুখ্যাতি। মধুসূদনও ডুবে ডুবে জল খায় এই অপবাদে সেই লোলুপরা পরম শান্তি পেল, গভীর জলে ডুব দেবার আকাঙ্ক্ষায় যাদের মনটা পানকৌড়ি-বিশেষ অথচ হাতের কাছে যাদের জলাশয় নেই।

মালেককে মধুসূদন পাকা কথা দিয়েছিল। ক্ষতির আশঙ্কায় কথা খেলাপ করবার লোক সে নয়। তাই নিজে কিনবে ঠিক করেছে, আর পণ করেছে কোম্পানিকে দেখিয়ে দেবে, না কিনে তারা ঠকল।

মধুসূদন বাড়ি ফিরে এল। নিজের ভাগ্যের প্রতি মধুসূদনের অন্ধ বিশ্বাস জন্মে গয়েছিল, আজ তার ভয় লাগল যে, জীবনযাত্রার গাড়িটাকে অদৃষ্ট এক পর্যায়ের লাইন থেকে আর-এক পর্যায়ের লাইনে চালান করে দিচ্ছে বা। প্রথম ঝাঁকানিতেই বুকটা ধড়াস করে উঠল। মীটিং থেকে ফিরে এসে আপিস-ঘরে কেদারা হেলান দিয়ে গুড়গুড়ির ধূমকুণ্ডলের সঙ্গে নিজের কালো রঙের চিন্তাকে কুণ্ডলায়িত করতে লাগল।

নবীন এসে খবর দিলে, বিপ্রদাসের বাড়ি থেকে লোক এসেছে দেখা করতে। মধুসূদন ঝেঁকে উঠে বললে, "যেতে বলে দাও, আমার এখন সময় নেই।"

নবীন মধুসূদনের ভাবগতিক দেখে বুঝলে, মীটিঙে একটা অপঘাত ঘটেছে। বুঝলে দাদার মন এখন দুর্বল। দৌর্বল্য স্বভাবত অনুদার, দুর্বলের আত্মগরিমা ক্ষমাহীন নিষ্ঠুরতার রূপ ধরে। দাদার আহত মন বউরানীকে কঠিনভাবে আঘাত করতে চাইবে এতে নবীনের সন্দেহমাত্র ছিল না। এ আঘাত যে করেই হোক ঠেকাতেই হবে।

এর পূর্ব পর্যন্ত ওর মনে দ্বিধা ছিল, সে দ্বিধা সম্পূর্ণ গেল কেটে। কিছুক্ষণ ঘুরে ফিরে আবার ঘরে এসে দেখলে, ওর দাদা ঠিকানাওআলা নামের ফর্দর খাতা নিয়ে পাতা ওলটাচ্ছে। নবীন এসে দাঁড়াতেই মধুসূদন মুখ তুলে রুক্ষ স্বরে জিজ্ঞাসা করলে, "আবার কিসের দরকার ? তোমাদের বিপ্রদাসবাবুর মোক্তারি করতে এসেছ বুঝি ?"

নবীন বললে, "না দাদা, সে-ভয় নেই। ওঁদের লোকটা এমন তাড়া খেয়ে গেছে যে, তুমি নিজেও যদি ডেকে পাঠাও তবু সে এ-বাড়িমুখো হবে না।"

এ-কথাটাও মধুসূদনের সহ্য হল না। বলে উঠল, "কড়ে আঙুলটা নাড়লেই পায়ের কাছে এসে পড়তে হবে। লোকটা এসেছিল কী করতে ?"

"তোমাকে খবর দিতে যে, বিপ্রদাসবাবুর কলকাতা আসা দুদিন পিছিয়ে গেল। শরীর আর-একটু সেরে তবে আসবেন।"

"আচ্ছা আচ্ছা, সে-জন্যে আমার তাড়া নেই।"

নবীন বললে, "দাদা, কাল সকালে ঘণ্টা দুয়ের জন্যে ছুটি চাই।"

"কেন ?"

"শুনলে তুমি রাগ করবে।"

"না শুনলে আরও রাগ করব।"

"কুম্ভকোনাম থেকে এক জ্যোতিষী এসেছেন, তাঁকে দিয়ে একবার ভাগ্যপরীক্ষা করাতে চাই।"

মধুসূদনের বুকটা ধড়াস করে উঠল, ইচ্ছে করল এখনই ছুটে তার কাছে যায়। মুখে তর্জন করে বললে, "তুমি বিশ্বাস কর ?"

"সহজ অবস্থায় করি নে, ভয় লাগলেই করি।"

"ভয়টা কিসের শুনি।"

নবীন কোনো জবাব না করে মাথা চুলকোতে লাগল।

"ভয়টা কাকে বলোই না।"

"এ-সংসারে তোমাকে ছাড়া আর কাউকে ভয় করি নে। কিছুদিন থেকে তোমার ভাবগতিক দেখে মন সুস্থির হচ্ছে না।"

সংসারের লোক মধুসূদনকে বাঘের মতো ভয় করে এইটেতে তার ভারি তৃপ্তি। নবীনের মুখের দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে গম্ভীরভাবে সে গুড়গুড়ি টানতে টানতে নিজের মাহাত্ম্য অনুভব করতে লাগল।

নবীন বললে, "তাই একবার স্পষ্ট করে জানতে চাই, গ্রহ কী করতে চান আমাকে নিয়ে। আর তিনি ছুটিই-বা দেবেন কোন্ নাগাত।"

"তোমার মতো নাস্তিক, তুমি কিছু বিশ্বাস কর না, শেষকালে—"

"দেবতার 'পরে বিশ্বাস থাকলে গ্রহকে বিশ্বাস করতুম না দাদা। ডাক্তারকে যে মানে না হাতুড়েকে মানতে তার বাধে না।"

নিজের গ্রহকে যাচাই করে নেবার জন্যে মধুসূদনের যে পরিমাণ আগ্রহ হল, সেই পরিমাণ ঝাঁজের সঙ্গে বললে, "লেখাপড়া শিখে বাঁদর, তোমার এই বিদ্যে? যে যা বলে তাই বিশ্বাস কর?"

"লোকটার কাছে যে ভৃগুসংহিতা রয়েছে—যেখানে যে-কেউ যে-কোনো কালে জন্মেছে, জন্মাবে, সকলের কুষ্ঠি একেবারে তৈরি, সংস্কৃত ভাষায় লেখা, এর উপর তো আর কথা চলে না। হাতে-হাতে পরীক্ষা করে দেখে নাও।"

"বোকা ভুলিয়ে যারা খায়, বিধাতা তাদের পেট ভরাবার জন্যে যথেষ্ট পরিমাণে তোমাদের মতো বোকাও সৃষ্টি করে রাখেন।"

"আবার সেই বোকাদের বাঁচাবার জন্যে তোমাদের মতো বুদ্ধিমানও সৃষ্টি করেন। যে মারে তার উপরে তাঁর যেমন দয়া, যাকে মারে তার

উপরেও তেমনি। ভৃগুসংহিতার উপরে তোমার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি চালিয়ে দেখোই না।"

"আচ্ছা বেশ, কাল সকালেই আমায় নিয়ে যেয়ো, দেখব তোমার কুম্ভকোনামের চালাকি।"

"তোমার যে-রকম জোর অবিশ্বাস দাদা, ওতে গণনায় গোল হয়ে যেতে পারে। সংসারে দেখা যায় মানুষকে বিশ্বাস করলে মানুষ বিশ্বাসী হয়ে ওঠে। গ্রহদেরও ঠিক সেই দশা, দেখো না কেন সাহেবগুলো গ্রহ মানে না বলে গ্রহের ফল ওদের উপর খাটে না। সেদিন তেরোস্পর্শে বেরিয়ে তোমাদের ছোটোসায়েব ঘোড়দৌড়ে বাজি জিতে এল—আমি হলে বাজি জেতা দুরস্তাং ঘোড়াটা ছিটকে এসে আমার পেটে লাথি মেরে যেত। দাদা, এই-সব গ্রহনক্ষত্রের হিসেবের উপর তোমাদের বুদ্ধি খাটাতে যেয়ো না, একটু বিশ্বাস মনে রেখো।"

মধুসূদন খুশি হয়ে স্মিতহাস্যে গুড়গুড়িতে মনোযোগ দিলে।

পরদিন সকাল সাতটার মধ্যে মধুসূদন নবীনের সঙ্গে এক সরু গলির আবর্জনার ভিতর দিয়ে বেঙ্কট শাস্ত্রীর বাসায় গিয়ে উপস্থিত। অন্ধকার একতলার ভাপসা ঘর; লোনা-ধরা দেয়াল ক্ষতবিক্ষত, যেন সাংঘাতিক চর্মরোগে আক্রান্ত, তক্তপোশের উপর ছিন্ন মলিন একখানা শতরঞ্চ, এক প্রান্তে কতকগুলো পুঁথি এলোমেলো জড়ো-করা, দেয়ালের গায়ে শিবপার্বতীর এক পট। নবীন হাঁক দিলে, "শাস্ত্রীজি"। ময়লা ছিটের বালাপোশ গায়ে, সামনের মাথা কামানো, ঝুঁটিওআলা, কালো বেঁটে রোগা এক ব্যক্তি ঘরে এসে ঢুকল; নবীন তাকে ঘটা করে প্রণাম করলে। চেহারা দেখে মধুসূদনের একটুও ভক্তি হয় নি—কিন্তু দৈবের সঙ্গে দৈবজ্ঞের কোনোরকম ঘনিষ্ঠতা আছে জেনে ভয়ে-ভয়ে তাড়াতাড়ি একটা আধাআধি রকম অভিবাদন সেরে নিলে। নবীন মধুসূদনের একটি

ঠিকুজি জ্যোতিষীর সামনে ধরতেই সেটা অগ্রাহ্য করে শাস্ত্রী মধুসূদনের হাত দেখতে চাইল। কাঠের বাক্স থেকে কাগজ-কলম বের করে নিয়ে নিজে একটা চক্র তৈরি করে নিলে। মধুসূদনের মুখের দিকে চেয়ে বললে, "পঞ্চম বর্গ।" মধুসূদন কিছুই বুঝলে না। জ্যোতিষী আঙুলের পর্ব গুনতে গুনতে আউড়ে গেল, কবর্গ, চবর্গ, টবর্গ, তবর্গ, পবর্গ। এতেও মধুসূদনের বুদ্ধি খোলসা হল না। জ্যোতিষী বললে, "পঞ্চম বর্ণ।" মধুসূদন ধৈর্য ধরে চুপ করে রইল। জ্যোতিষী আওড়াল, প ফ ব ভ ম। মধুসূদন এর থেকে এইটুকু বুঝলে যে, ভৃগুমুনি ব্যাকরণের প্রথম অধ্যায় থেকেই তাঁর সংহিতা শুরু করেছেন। এমন সময় বেঙ্কট শাস্ত্রী বলে উঠল, "পঞ্চাক্ষরকং।"

নবীন চকিত হয়ে মধুসূদনের কানের কাছে চুপি চুপি বললে, "বুঝেছি দাদা।"

"কী বুঝলে?"

"পঞ্চম বর্গের পঞ্চম বর্ণ ম, তার পরে পঞ্চ অক্ষর ম-ধু-সূ-দ-ন। জন্ম-গ্রহের অদ্ভুত কৃপায় তিনটে পাঁচ এক জায়গায় মিলেছে।"

মধুসূদন স্তম্ভিত। বাপ-মায়ে নাম রাখবার কত হাজার বছর আগেই নামকরণ ভৃগুমুনির খাতায়! নক্ষত্রদের এ কী কাণ্ড! তার পরে হতবুদ্ধি হয়ে শুনে গেল ওর জীবনের সংক্ষিপ্ত অতীত ইতিহাস, সংস্কৃত ভাষায় রচিত। ভাষা যত কম বুঝলে, ভক্তি ততই বেড়ে উঠল। জীবনটা আগাগোড়া ঋষিবাক্য মূর্তিমান। নিজের বুকের উপর হাত বুলিয়ে দেখলে, দেহটা অনুস্বার-বিসর্গ-তদ্ধিত-প্রত্যয়ের মসলা দিয়ে তৈরি কোন্ তপোবনে লেখা একটা পুঁথির মতো। তার পর দৈবজ্ঞের শেষ কথাটা এই যে, মধুসূদনের ঘরে একদা লক্ষ্মীর আবির্ভাব হবে বলে পূর্ব হতেই ঘরে অভাবনীয় সৌভাগ্যের সূচনা। অল্পদিন হল তিনি এসেছেন নববধূকে আশ্রয় করে।

এখন থেকে সাবধান। কেননা ইনি যদি মনঃপীড়া পান, ভাগ্য কুপিত হবে।

বেঙ্কট শাস্ত্রী বললে, কোপের লক্ষণ দেখা দিয়েছে। জাতক যদি এখনও সতর্ক না হয় বিপদ বেড়ে চলবে। মধুসূদন স্তম্ভিত হয়ে বসে রইল। মনে পড়ে গেল বিবাহের দিনেই প্রকাণ্ড সেই মুনফার খবর; আর তার কয়দিনের মধ্যেই এই পরাভব। লক্ষ্মী স্বয়ং আসেন সেটা সৌভাগ্য, কিন্তু তার দায়িত্বটা কম ভয়ংকর নয়।

ফেরবার সময় মধুসূদন গাড়িতে স্তব্ধ হয়েই বসে রইল। এক সময় নবীন বলে উঠল, "ওই বেঙ্কট শাস্ত্রীর স্বপ একটুও বিশ্বাস করি নে; নিশ্চয় ও কারও কাছ থেকে তোমার সমস্ত খবর পেয়েছে।"

"ভারি বুদ্ধি তোমার! যেখানে যত মানুষ আছে আগেভাগে তার খবর নিয়ে রেখে দিচ্ছে; সোজা কথা কিনা!"

"মানুষ জন্মাবার আগেই তার কোটি কোটি কুষ্ঠি লেখার চেয়ে এটা অনেক সোজা। ভৃগুমুনি এত কাগজ পাবেন কোথায়, আর বেঙ্কট স্বামীর ওই ঘরে এত জায়গা হবে কেমন করে?"

"এক আঁচড়ে হাজারটা কথা লিখতে জানতেন তাঁরা।"

"অসম্ভব।"

"যা তোমার বুদ্ধিতে কুলোয় না তাই অসম্ভব। ভারি তোমার সায়ান্স! এখন তর্ক রেখে দাও, সেদিন ওদের বাড়ি থেকে যে-সরকার এসেছিল, তাকে তুমি নিজে গিয়ে ডেকে এনো। আজই, দেরি ক'রো না।"

দাদাকে ঠকিয়ে নবীনের মনের ভিতরটাতে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ হতে লাগল। ফন্দিটা এত সহজ, এর সফলতাটা দাদার পক্ষে এত হাস্যকর যে, তারই অমর্যাদায় ওকে লজ্জা ও কষ্ট দিলে। দাদাকে

উপস্থিতমতো ছোটো অনেক ফাঁকি অনেকবার দিতে হয়েছে, কিছু মনে হয় নি; কিন্তু এত করে সাজিয়ে এতবড়ো ফাঁকি গড়ে তোলার গ্লানি ওর চিত্তকে অশুচি করে রেখে দিলে।

৪২

মধুসূদনের মন থেকে মস্ত একটা ভার গেল নেমে, আত্মগৌরবের ভার—যে-কঠোরগৌরব-বোধ ওর বিকাশোন্মুখ অনুরক্তিকে কেবলই পাথর-চাপা দিয়েছে। কুমুর প্রতি ওর মন যখন মুগ্ধ তখনও সেই বিহ্বলতার বিরুদ্ধে ভিতরে ভিতরে চলেছিল লড়াই। যতই অনন্যগতি হয়ে কুমুর কাছে ধরা দিয়েছে, ততই নিজের অগোচরে কুমুর 'পরে ওর ক্রোধ জমেছে। এমন সময়ে স্বয়ং নক্ষত্রদের কাছ থেকে যখন আদেশ এল যে লক্ষ্মী এসেছেন ঘরে, তাঁকে খুশি করতে হবে, সকল দ্বন্দ্ব ঘুচে গিয়ে ওর দেহমন যেন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল; বার বার আপন মনে আবৃত্তি করতে লাগল—লক্ষ্মী, আমারই ঘরে লক্ষ্মী, আমার ভাগ্যের পরম দান। ইচ্ছে করতে লাগল, এখনই সমস্ত সংকোচ ভাসিয়ে দিয়ে কুমুর কাছে স্তুতি জানিয়ে আসে, বলে আসে, "যদি কোনো ভুল করে থাকি, অপরাধ নিয়ো না।" কিন্তু আজ আর সময় নেই, ব্যবসায়ের ভাঙন সারবার কাজে এখনই আপিসে ছুটতে হবে, বাড়িতে খেয়ে যাবার অবকাশ পর্যন্ত জুটল না।

এদিকে সমস্তদিন কুমুর মনের মধ্যে তোলপাড় চলেছে। সে জানে কাল দাদা আসবেন, শরীর তাঁর অসুস্থ। তাঁর সঙ্গে দেখাটা সহজ হবে কি না নিশ্চিত জানবার জন্যে মন উদ্বিগ্ন হয়ে আছে। নবীন কোথায় কাজে গেছে, এখনও এল না। সে নিঃসন্দেহ জানত আজ

স্বয়ং মধুসূদন এসে বউরানীকে সকল রকমে প্রসন্ন করবে ; আগেভাগে কোনো আভাস দিয়ে রসভঙ্গ করতে চায় না।

আজ ছাতে বসবার সুবিধা ছিল না। কাল সন্ধ্যা থেকে মেঘ করে আছে, আজ দুপুর থেকে টিপ টিপ করে বৃষ্টি শুরু হল। শীতকালের বাদলা, অনিচ্ছিত অতিথির মতো। মেঘে রঙ নেই, বৃষ্টিতে ধ্বনি নেই, ভিজে বাতাসটা যেন মন-মরা, সূর্যালোকহীন আকাশের দৈন্যে পৃথিবী সংকুচিত। সিঁড়ি থেকে উঠেই শোবার ঘরে ঢোকবার পথে যে-ঢাকা ছাদ আছে সেইখানে কুমু মাটিতে বসে। থেকে-থেকে গায়ে বৃষ্টির ছাঁট আসছে। আজ এই ছায়াম্লান আর্দ্র একঘেয়ে দিনে কুমুর মনে হল, তার নিজের জীবনটা তাকে যেন অজগরের মতো গিলে ফেলেছে, তারই ক্লেদাক্ত জঠরের রুদ্ধতার মধ্যে কোথাও একটুমাত্র ফাঁক নেই। যে-দেবতা ওকে ভুলিয়ে আজ এই নিরুপায় নৈরাশ্যের মধ্যে এনে ফেললে তার উপরে যে-অভিমান ওর মনে ধোঁয়াচ্ছিল আজ সেটা ক্রোধের আগুনে জ্বলে উঠল। হঠাৎ দ্রুত উঠে পড়ল। ডেস্ক খুলে বের করলে সেই যুগল-রূপের পট। রঙিন রেশমের ছিট দিয়ে সেটা মোড়া। সেই পট আজ ও নষ্ট করে ফেলতে চায়। যেন চীৎকার করে বলতে চায়, তোমাকে আমি একটুও বিশ্বাস করি নে। হাত কাঁপছে, তাই গ্রন্থি খুলতে পারছে না ; টানাটানিতে সেটা আঁট হয়ে উঠল, অধীর হয়ে দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে ফেললে। অমনি চিরপরিচিত সেই মূর্তি অনাবৃত হতেই আর সে থাকতে পারলে না! তাকে বুকে চেপে ধরে কেঁদে উঠল। কাঠের ফ্রেম বুকে যত বাজে ততই আরও বেশি চেপে ধরে।

এমন সময়ে শোবার ঘরে এল মুরলী বেহারা বিছানা করতে। শীতে কাঁপছে তার হাত। গায়ে একখানা জীর্ণ ময়লা র‍্যাপার। মাথায়

টাক, রগ টেপা, গাল বসা, কিছুকালের না-কামানো কাঁচাপাকা দাড়ি খোঁচা খোঁচা হয়ে উঠেছে। অনতিকাল পূর্বেই সে ম্যালেরিয়ায় ভুগেছিল, শরীরে রক্ত নেই বললেই হয়, ডাক্তার বলেছিল কাজ ছেড়ে দিয়ে দেশে যেতে, কিন্তু নিষ্ঠুর নিয়তি!

কুমু বললে, "শীত করছে মুরলী?"

"হাঁ মা, বাদল করে ঠাণ্ডা পড়েছে।"

"গরম কাপড় নেই তোমার?"

"খেতাব পাবার দিনে মহারাজা দিয়েছিলেন, নাতির খাঁসির বেমারি হতেই ডাক্তারের কথায় তাকে দিয়েছি মা।"

কুমু একটি পুরোনো ছাই রঙের আলোয়ান পাশের ঘরের আলমারি থেকে বের করে এনে বললে, "আমার এই কাপড়টি তোমাকে দিলুম।"

মুরলী গড় হয়ে বললে, "মাপ করো মা, মহারাজা রাগ করবেন।"

কুমুর মনে পড়ে গেল, এ-বাড়িতে দয়া করবার পথ সংকীর্ণ। কিন্তু ঠাকুরের কাছ থেকে নিজের জন্যেও যে ওর দয়া চাই, পুণ্যকর্ম তারই পথ। কুমু ক্ষোভের সঙ্গে আলোয়ানটা মাটিতে ফেলে দিলে।

মুরলী হাত জোড় করে বললে, "রানীমা, তুমি মা লক্ষ্মী, রাগ ক'রো না। গরম কাপড়ে আমার দরকার হয় না। আমি থাকি হুঁকাবরদারের ঘরে, সেখানে গামলায় গুলের আগুন, আমি বেশ গরম থাকি।"

কুমু বললে, "মুরলী, নবীন ঠাকুরপো যদি বাড়ি এসে থাকেন তাঁকে ডেকে দাও।"

নবীন ঘরে ঢুকতেই কুমু বললে, "ঠাকুরপো, তোমাকে একটি কাজ করতেই হবে। বলো, করবে?"

"নিজের অনিষ্ট যদি হয় এখনই করব, কিন্তু তোমার অনিষ্ট হলে কিছুতেই করব না।"

"আমার আর কত অনিষ্ট হবে? আমি ভয় করি নে।" বলে নিজের হাত থেকে মোটা সোনার বালাজোড়া খুলে বললে, "আমার এই বালা বেচে দাদার জন্যে স্বস্ত্যয়ন করাতে হবে।"

"কিছু দরকার হবে না, বউরানী, তুমি তাঁকে যে ভক্তি কর তারই পুণ্যে প্রতিমুহূর্তে তাঁর জন্যে স্বস্ত্যয়ন হচ্ছে।"

"ঠাকুরপো, দাদার জন্যে আর কিছুই করতে পারব না। কেবল যদি পারি দেবতার দ্বারে তাঁর জন্যে সেবা পৌঁছিয়ে দেব।"

"তোমাকে কিছু করতে হবে না, বউরানী। আমরা সেবক আছি কী করতে?"

"তোমরা কী করতে পার বলো?"

"আমরা পাপিষ্ঠ, পাপ করতে পারি। তাই করেও যদি তোমার কোনো কাজে লাগি তাহলে ধন্য হব।"

"ঠাকুরপো, এ-কথা নিয়ে ঠাট্টা ক'রো না।"

"একটুও ঠাট্টা নয়। পুণ্য করার চেয়ে পাপ করা অনেক শক্ত কাজ, দেবতা যদি তা বুঝতে পারেন তাহলে পুরস্কার দেবেন।"

নবীনের কথার ভাবে দেবতার প্রতি উপেক্ষা কল্পনা করে কুমুর মনে স্বভাবত আঘাত লাগতে পারত, কিন্তু তার দাদাও যে মনে মনে দেবতাকে শ্রদ্ধা করে না, এই অভক্তির 'পরে সে রাগ করতে পারে না যে। ছোটো ছেলের দুষ্টুমির 'পরেও মায়ের যেমন সকৌতুক স্নেহ, এই রকম অপরাধের 'পরে ওরও সেই ভাব।

কুমু একটু ম্লান হাসি হেসে বললে, "ঠাকুরপো, সংসারে তোমরা নিজের জোরে কাজ করতে পার; আমাদের যে সেই নিজের জোর খাটাবার জো নেই। যাদের ভালোবাসি অথচ নাগাল মেলে না, তাদের কাজ করব কী করে? দিন যে কাটে না, কোথাও যে

রাস্তা খুঁজে পাই নে। আমাদের কি দয়া করবার কোথাও কেউ নেই?"

নবীনের চোখ জলে ভেসে উঠল।

"দাদাকে উদ্দেশ করে আমাকে কিছু করতেই হবে ঠাকুরপো, কিছু দিতেই হবে। এই বালা আমার মায়ের, সেই আমার মায়ের হয়েই এ বালা আমার দেবতাকে আমি দেব।"

"দেবতাকে হাতে করে দিতে হয় না বউরানী, তিনি এমনি নিয়েছেন। দুদিন অপেক্ষা করো, যদি দেখ তিনি প্রসন্ন হন নি, তাহলে যা বলবে তাই করব। যে-দেবতা তোমাকে দয়া করেন না তাঁকেও ভোগ দিয়ে আসব।"

রাত্রি অন্ধকার হয়ে এল—বাইরে সিঁড়িতে ওই সেই পরিচিত জুতোর শব্দ। নবীন চমকে উঠল, বুঝলে দাদা আসছে। পালিয়ে গেল না, সাহস করে দাদার জন্যে অপেক্ষা করেই রইল। এদিকে কুমুর মন এক মুহূর্তে নিরতিশয় সংকুচিত হয়ে উঠল। এই অদৃশ্য বিরোধের ধাক্কাটা এমন প্রবল বেগে যখন তার প্রত্যেক নাড়িকে চমকিয়ে তুললে, বড়ো ভয় হল। এ পাপ কেন তাকে এত দুর্জয় বলে পেয়ে বসেছে?

হঠাৎ কুমু নবীনকে জিজ্ঞাসা করলে, "ঠাকুরপো, কাউকে জান যিনি আমাকে গুরুর মতো উপদেশ দিতে পারেন?"

"কী হবে বউরানী?"

"নিজের মনকে নিয়ে যে পেরে উঠছি নে।"

"সে তোমার মনের দোষ নয়।"

"বিপদটা বাইরের, দোষটা মনের, দাদার কাছে এই কথা বার বার শুনেছি।"

"তোমার দাদাই তোমাকে উপদেশ দেবেন—ভয় ক'রো না।"

"সেদিন আমার আর আসবে না।"

মধুসূদনের বিষয়বুদ্ধির সঙ্গে তার ভালোবাসার আপস হয়ে যেতেই সেই ভালোবাসা মধুসূদনের সমস্ত কাজকর্মের উপর দিয়েই যেন উপচে বয়ে যেতে লাগল। কুমুর সুন্দর মুখে তার ভাগ্যের বরাভয় দান। পরাভবটি কেটে যাবে আজই পেল তার আভাস। কাল যারা বিরুদ্ধে মত দিয়েছিল আজ তাদেরই মধ্যে কেউ কেউ সুর ফিরিয়ে ওকে চিঠি লিখেছে। মধুসূদন যেই তালুকটা নিজের নামে কিনে নেবার প্রস্তাব করলে অমনি কারও কারও মনে হল ঠকলুম বুঝি। কেউ কেউ এমনও ভাব প্রকাশ করলে যে, কথাটা আর-একবার বিচার করা উচিত।

গরহাজির অপরাধে আপিসের দরোয়ানের অর্ধেক মাসের মাইনে কাটা গিয়েছিল, আজ টিফিনের সময় মধুসূদনের পা জড়িয়ে ধরবামাত্র মধুসূদন তাকে মাপ করে দিলে। মাপ করবার মানে নিজের পকেট থেকে দরোয়ানের ক্ষতিপূরণ; যদিচ খাতায় জরিমানা রয়ে গেল। নিয়মের ব্যত্যয় হবার জো নেই।

আজকের দিনটা মধুর পক্ষে বড়ো আশ্চর্যের দিন। বাইরে আকাশটা মেঘে ঘোলা, টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে, কিন্তু এতে করে ওর ভিতরের আনন্দ আরও বাড়িয়ে দিলে। আপিস থেকে ফিরে এসে রাত্রে আহারের সময়ের পূর্ব পর্যন্ত মধুসূদন বাইরের ঘরে কাটাত। বিয়ের পরে কয়দিন অসময়ে নিয়মের বিরুদ্ধে অন্তঃপুরে যাবার বেলায় লোকের দৃষ্টি এড়াবার চেষ্টা করেছে। আজ সশব্দ পদক্ষেপে বাড়িসুদ্ধ সবাইকে যেন জানিয়ে দিতে চাইলে যে, সে চলেছে কুমুর সঙ্গে দেখা করতে। আজ বুঝেছে, পৃথিবীর লোকে ওকে ঈর্ষা করতে পারে এতবড়ো ওর সৌভাগ্য।

খানিকক্ষণের জন্যে বৃষ্টি ধরে গেছে। তখনও সব ঘরে আলো জ্বলে নি। আন্দিবুড়ি ধুনুচি হাতে ধুনো দিয়ে বেড়াচ্ছে; একটা চামচিকে

উঠোনের উপরের আকাশ থেকে লণ্ঠনজ্বালা অন্তঃপুরের পথ পর্যন্ত কেবলই চক্রপথে ঘুরছে। বারান্দায় পা মেলে দিয়ে দাসীরা উরুর উপরে প্রদীপের সলতে পাকাচ্ছিল, তাড়াতাড়ি উঠে ঘোমটা টেনে দৌড় দিলে। পায়ের শব্দ পেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল শ্যামাসুন্দরী, হাতে বাটাতে ছিল পান। মধুসূদন আপিস থেকে এলে নিয়মমতো এই পান সে বাইরে পাঠিয়ে দিত। সবাই জানে, ঠিক মধুসূদনের রুচির মতো পান শ্যামাসুন্দরীই সাজতে পারে; এইটে জানার মধ্যে আরও কিছু-একটা জানার ইশারা ছিল। সেই জোরে পথের মধ্যে শ্যামা মধুর সামনে বাটা খুলে ধরে বললে, "ঠাকুরপো, তোমার পান সাজা আছে, নিয়ে যাও।" আগে হলে এই উপলক্ষে দুটো-একটা কথা হত, আর সেই কথায় অল্প একটু মধুর রসের আমেজও লাগত। আজ কী হল কে জানে পাছে দূর থেকেও শ্যামার ছোঁয়াচ লাগে সেইটে এড়িয়ে পান না নিয়ে মধুসূদন দ্রুত চলে গেল। শ্যামার বড়ো বড়ো চোখদুটো অভিমানে জলে উঠল, তার পর ভেসে গেল অশ্রুজলের মোটা মোটা ফোঁটায়। অন্তর্যামী জানেন, শ্যামাসুন্দরী মধুসূদনকে ভালোবাসে।

মধুসূদন ঘরে ঢুকতেই নবীন কুমুর পায়ের ধুলো নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "গুরুর কথা মনে রইল, খোঁজ করে দেখব।" দাদাকে বললে, "বউরানী গুরুর কাছ থেকে শাস্ত্র-উপদেশ শুনতে চান। আমাদের গুরুঠাকুর আছেন, কিন্তু—"

মধুসূদন উত্তেজনার স্বরে বলে উঠল, "শাস্ত্র-উপদেশ! আচ্ছা সে দেখব এখন, তোমাকে কিছু করতে হবে না।"

নবীন চলে গেল।

মধুসূদন আজ সমস্ত পথ মনে মনে আবৃত্তি করতে করতে এসেছিল, "বড়োবউ, তুমি এসেছ, আমার ঘর আলো হয়েছে।" এ-রকম ভাবের

কথা বলবার অভ্যাস ওর একেবারেই নেই। তাই ঠিক করেছিল, ঘরে ঢুকেই দ্বিধা না করে প্রথম ঝোঁকেই সে বলবে। কিন্তু নবীনকে দেখেই কথাটা গেল ঠেকে। তার উপর এল শাস্ত্র-উপদেশের প্রসঙ্গ, ওর মুখ দিলে একেবারে বন্ধ করে। অন্তরে যে আয়োজনটা চলছিল, এই একটুখানি বাধাতেই নিরস্ত হয়ে গেল। তার পরে কুমুর মুখে দেখলে একটা ভয়ের ভাব, দেহমনের একটা সংকোচ। অন্যদিন হলে এটা চোখে পড়ত না। আজ ওর মনে যে একটা আলো জ্বলেছে তাতে দেখবার শক্তি হয়েছে প্রবল, কুমু সম্বন্ধে চিত্তের স্পর্শবোধ হয়েছে সূক্ষ্ম। আজকের দিনেও কুমুর মনে এই বিমুখতা, এটা ওর কাছে নিষ্ঠুর অবিচার বলে ঠেকল। তবু মনে-মনে পণ করলে, বিচলিত হবে না, কিন্তু যা সহজে হতে পারত সে আর সহজ রইল না।

একটু চুপ করে থেকে মধুসূদন বললে, "বড়োবউ, চলে যেতে ইচ্ছে করছ? একটুক্ষণ থাকবে না?"

মধুসূদনের কথা আর তার গলার স্বর শুনে কুমু বিস্মিত। বললে, "না, যাব কেন?"

"তোমার জন্যে একটি জিনিস এনেছি খুলে দেখো।" বলে তার হাতে ছোটো একটি সোনার কৌটো দিলে।

কৌটো খুলে কুমু দেখলে দাদার দেওয়া সেই নীলার আংটি। বুকের মধ্যে ধক করে উঠল, কী করবে ভেবে পেল না।

"এই আংটি তোমায় পরিয়ে দিতে দেবে?"

কুমু হাত বাড়িয়ে দিলে। মধুসূদন কুমুর হাত কোলের উপর ধরে খুব আস্তে আস্তে আংটি পরাতে লাগল। ইচ্ছে করেই সময় নিলে একটু বেশি। তার পরে হাতটি তুলে ধরে চুমো খেলে, বললে, "ভুল করেছিলুম তোমার

হাতের আংটি খুলে নিয়ে। তোমার হাতে কোনো জহরতে কোনো দোষ নেই।”

কুমুকে মারলে এর চেয়ে কম বিস্মিত হত। ছেলেমানুষের মতো কুমুর এই বিস্ময়ের ভাব দেখে মধুসূদনের লাগল ভালো। দানটা যে সামান্য নয় কুমুর মুখভাবে তা সুস্পষ্ট। কিন্তু মধুসূদন আরও কিছু হাতে রেখেছে, সেইটে প্রকাশ করলে, বললে, “তোমাদের বাড়ির কালু মুখুজ্যে এসেছে, তাকে দেখতে চাও?”

কুমুর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললে, “কালুদা?”

“তাকে ডেকে দিই। তোমরা কথাবার্তা কও, ততক্ষণ আমি খেয়ে আসি গে।”

কৃতজ্ঞতায় কুমুর চোখ ছল ছল করে এল।

৪৩

চাটুজ্যে জমিদারদের সঙ্গে কালুর পুরুষানুক্রমিক সম্বন্ধ। সমস্ত বিশ্বাসের কাজ এর হাত দিয়েই সম্পন্ন হয়। এর কোনো এক পূর্বপুরুষ চাটুজ্যেদের জন্যে জেল খেটেছে। কালু আজ বিপ্রদাসের হয়ে এক কিস্তি সুদ দিয়ে রসিদ নিতে মধুসূদনের আপিসে এসেছিল। বেঁটে, গৌরবর্ণ, পরিপুষ্ট চেহারা, ঈষৎ কটা ড্যাবড্যাবা চোখ, তার উপরে ঝুঁকে-পড়া রোমশ কাঁচাপাকা মোটা ভুরু, মস্ত ঘন পাকা গোঁফ, অথচ মাথার চুল প্রায় কাঁচা, সযত্নে কোঁচানো শান্তিপুরে ধুতি পরা এবং প্রভু-পরিবারের মর্যাদা রক্ষার উপযুক্ত পুরানো দামি জামিয়ার গায়ে। আঙুলে একটা আংটি—তার পাথরটা নেহাত কম দামি নয়।

কালু ঘরে প্রবেশ করতে কুমু তাকে প্রণাম করলে। দুজনে বসল

কার্পেটের উপর। কালু বললে "ছোটো খুকী, এইতো সেদিন চলে এলে দিদি, কিন্তু মনে হচ্ছে যেন কত বৎসর দেখি নি।"

"দাদা কেমন আছেন আগে বলো।"

"বড়োবাবুর জন্যে বড়ো ভাবনায় কেটেছে। তুমি যেদিন চলে এলে তার পরের দিনে খুব বাড়াবাড়ি হয়েছিল। কিন্তু অসম্ভব জোরালো শরীর কিনা, দেখতে-দেখতে সামলে নিলেন। ডাক্তাররা আশ্চর্য হয়ে গেছে।"

"দাদা কাল আসছেন?"

"তাই কথা ছিল। কিন্তু আরও দুটো দিন দেরি হবে। পূর্ণিমা পড়েছে, সকলে তাঁকে বারণ করলে, কী জানি যদি আবার জ্বর আসে। সে যেন হল, কিন্তু তুমি কেমন আছ দিদি?"

"আমি বেশ ভালোই আছি।"

কালু কিছু বলতে ইচ্ছে করল না, কিন্তু কুমুর মুখের সে-লাবণ্য গেল কোথায়? চোখের নীচে কালি কেন? অমন চিকন রঙ তার ফ্যাকাশে হয়ে গেল কী জন্যে? কুমুর মনে একটা প্রশ্ন জাগছে, সেটা সে মুখ ফুটে বলতে পারছে না, "দাদা আমাকে মনে করে কি কিছু বলে পাঠান নি?" তার সেই অব্যক্ত প্রশ্নের উত্তরের মতোই যেন কালু বললে, "বড়োবাবু আমার হাত দিয়ে তোমাকে একটি জিনিস পাঠিয়েছেন।"

কুমু ব্যগ্র হয়ে বললে, "কী পাঠিয়েছেন, কই সে?"

"সেটা বাইরে রেখে এসেছি।"

"আনলে না কেন?"

"ব্যস্ত হ'য়ো না দিদি। মহারাজা বললেন, তিনি নিজে নিয়ে আসবেন।"

"কী জিনিস বলো আমাকে।"

"ইনি যে আমাকে বলতে বারণ করলেন।" ঘরের চারি দিকে তাকিয়ে কালু বললে, "বেশ আদরযত্নে তোমাকে রেখেছে—বড়োবাবুকে গিয়ে বলব, কত খুশি হবেন। প্রথম দুদিন তোমার খবর পেতে দেরি হয়ে তিনি বড়ো ছটফট করেছেন। ডাকের গোলমাল হয়েছিল, শেষকালে তিনটে চিঠি একসঙ্গে পেলেন।"

ডাকের গোলমাল হবার কারণটা যে-কোন্‌খানে কুমু তা আন্দাজ করতে পারলে।

কালুদাকে কুমু খেতে বলতে চায়, সাহস করতে পারছে না। একটু সংকোচের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলে, "কালুদা, এখনও তোমার খাওয়া হয় নি?"

"দেখেছি, কলকাতায় সন্ধ্যের পর খেলে আমার সহ্য হয় না দিদি, তাই আমাদের রামসদয় কবিরাজের কাছ থেকে মকরধ্বজ আনিয়ে খাচ্ছি। বিশেষ কিছু তো ফল হল না।"

কালু বুঝেছিল, বাড়ির নূতন বউ, এখনও কর্তৃত্ব হাতে আসে নি, মুখ ফুটে খাওয়াবার কথা বলতে পারবে না, কেবল কষ্ট পাবে।

এমন সময় মোতির মা দরজার আড়াল থেকে হাতছানি দিয়ে কুমুকে ডেকে নিয়ে বললে, "তোমাদের ওখান থেকে মুখুজ্যেমশায় এসেছেন, তাঁর জন্যে খাবার তৈরি। নীচের ঘরে তাঁকে নিয়ে এস, খাইয়ে দেবে।"

কুমু ফিরে এসেই বললে, "কালুদা, তোমার কবিরাজের কথা রেখে দাও, তোমাকে খেয়ে যেতেই হবে।"

"কী বিভ্রাট! এ যে অত্যাচার! আজ থাক্, না-হয় আর-একদিন হবে।"

"না, সে হবে না—চলো।"

শেষকালে আবিষ্কার করা গেল, মকরধ্বজের বিশেষ ফল হয়েছে, ক্ষুধার লেশমাত্র অভাব প্রকাশ পেল না।

কালুদাদাকে খাওয়ানো শেষ হতেই কুমু শোবার ঘরে চলে এল। আজ মনটা বাপের বাড়ির স্মৃতিতে ভরা। এতদিনে নুরনগরে খিড়কির বাগানে আমের বোল ধরেছে। কুসুমিত জামরুল গাছের তলায় পুকুর-ধারের চাতালে কত নিভৃত মধ্যাহ্নে কুমু হাতের উপর মাথা রেখে এলোচুল ছড়িয়ে দিয়ে শুয়ে কাটিয়েছে—মৌমাছির গুঞ্জনে মুখরিত, ছায়ায় আলোয় খচিত সেই দুপুরবেলা। বুকের মধ্যে একটা অকারণ ব্যথা লাগত, জানত না তার অর্থ কী। সেই ব্যথায় সন্ধ্যেবেলাকার ব্রজের পথের গোখুর-ধূলিতে ওর স্বপ্ন রাঙা হয়ে উঠেছে। বুঝতে পারে নি যে, ওর যৌবনের অপ্রাপ্ত দোসর জলে স্থলে দিয়েছে মায়া মেলে, ওর যুগল রূপের উপাসনায় সেই করেছে লুকোচুরি, তাকেই টেনে এনেছে ওর চিত্তের অলক্ষ্যপুরে এসরাজে মুলতানের মিড়ে মূর্ছনায়। ওর প্রথম-যৌবনের সেই না-পাওয়া মনের মানুষের কত আভাস ছিল ওদের সেখানকার বাড়ির কত জায়গায়, সেখানকার চিলেকোঠায়, যেখান থেকে দেখা যেত গ্রামের বাঁকা রাস্তার ধারে ফুলের আগুন-লাগা সরষেখেত, খিড়কির পাঁচিলের ধারের সেই ঢিবিটা, যেখানে বসে পাঁচিলের ছ্যাতলা-পড়া সবুজে কালোয় মেশা নানা রেখায় যেন কোন্ পুরাতন বিস্মৃত কাহিনীর অস্পষ্ট ছবি—দোতালায় ওর শোবার ঘরের জানালায় সকালে ঘুম থেকে উঠেই দূরের রাঙা আকাশের দিকে সাদা পালগুলো দেখতে পেত, দিগন্তের গায়ে গায়ে চলেছে যেন মনের নিরুদ্দেশ কামনার মতো। প্রথম-যৌবনের সেই মরীচিকাই সঙ্গে সঙ্গে এসেছে কলকাতায় ওর পূজার মধ্যে, ওর গানের মধ্যে। সেই তো দৈবের বাণীর ভান করে ওকে

অন্ধভাবে এই বিবাহের ফাঁসের মধ্যে টেনে আনলে। অথচ প্রখর রৌদ্রে নিজে গেল মিলিয়ে।

ইতিমধ্যে মধুসূদন কখন পিছনে এসে দেয়ালে-ঝোলানো আয়নায় কুমুর মুখের প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে রইল। বুঝতে পারলে কুমুর মন যেখানে হারিয়ে গেছে সেই অদৃশ্য অজানার সঙ্গে প্রতিযোগিতা কিছুতেই চলবে না। অন্য দিন হলে কুমুর এই আনমনা ভাব দেখলে রাগ হত। আজ শান্ত বিষাদের সঙ্গে কুমুর পাশে এসে বসল; বললে, "কী ভাবছ বড়োবউ?"

কুমু চমকে উঠল। মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। মধুসূদন তার হাত চেপে ধরে নাড়া দিয়ে বললে, "তুমি কি কিছুতেই আমার কাছে ধরা দেবে না?"

এ কথার উত্তর কুমু ভেবে পেলে না। কেন ধরা দিতে পারছে না সে-প্রশ্ন ও যে নিজেকেও করে। মধুসূদন যখন কঠিন ব্যবহার করছিল তখন উত্তর সহজ ছিল, ও যখন নতি স্বীকার করে তখন নিজেকে নিন্দে করা ছাড়া কোনো জবাব পায় না। স্বামীকে মনপ্রাণ সমর্পণ করতে না পারাটা মহাপাপ, এ সম্বন্ধে কুমুর সন্দেহ নেই, তবু ওর এমন দশা কেন হল? মেয়েদের একটিমাত্র লক্ষ্য, সতী সাবিত্রী হয়ে ওঠা। সেই লক্ষ্য হতে ভ্রষ্ট হওয়ার পরম দুর্গতি থেকে নিজেকে বাঁচাতে চায়—তাই আজ ব্যাকুল হয়ে কুমু মধুসূদনকে বললে, "তুমি আমাকে দয়া করো।"

"কিসের জন্যে দয়া করতে হবে?"

"আমাকে তোমার করে নাও—হুকুম করো, শাস্তি দাও। আমার মনে হয় আমি তোমার যোগ্য নই।"

শুনে বড়ো দুঃখে মধুসূদনের হাসি পেল। কুমু সতীর কর্তব্য করতে চায়। কুমু যদি সাধারণ গৃহিণী মাত্র হত তাহলে এইটুকুই যথেষ্ট হত,

কিন্তু কুমু যে ওর কাছে মন্ত্র-পড়া স্ত্রীর চেয়ে অনেক বেশি, সেই বেশি-টুকুকে পাবার জন্যে ও যতই মূল্য হাঁকছে সবই ব্যর্থ হচ্ছে। ধরা পড়ছে নিজের খর্বতা। কুমুর সঙ্গে নিজের দুর্লঙ্ঘ্য অসাম্য কেবলই ব্যাকুলতা বাড়িয়ে তুলছে।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মধুসূদন বললে, "একটি জিনিস যদি দিই তো কী দেবে বলো।"

কুমু বুঝতে পারলে দাদার দেওয়া সেই জিনিস, ব্যগ্রতার সঙ্গে মধুসূদনের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

"যেমন জিনিসটি তারই উপযুক্ত দাম নেব কিন্তু," বলে খাটের নীচে থেকে রেশমের খোল দিয়ে মোড়া একটি এসরাজ বের করে তার মোড়কটি খুলে ফেললে। কুমুর সেই চিরপরিচিত এসরাজ, হাতির দাঁতে খচিত। বাড়ি থেকে চলে আসবার সময় এইটি ফেলে এসেছিল।

মধুসূদন বললে, "খুশি হয়েছ তো? এইবার দাম দাও।"

মধুসূদন কী দাম চায় কুমু বুঝতে পারলে না, চেয়ে রইল। মধুসূদন বললে, "বাজিয়ে শোনাও আমাকে।"

এটা বেশি কিছু নয়, তবু বড়ো শক্ত দাবি। কুমু এইটুকু আন্দাজ করতে পেরেছে যে, মধুসূদনের মনে সংগীতের রস নেই। এর সামনে বাজানোর সংকোচ কাটিয়ে তোলা কঠিন। কুমু মুখ নিচু করে এসরাজের ছড়িটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল। মধুসূদন বললে, "বাজাও না বড়োবউ, আমার সামনে লজ্জা ক'রো না।"

কুমু বললে, "সুর বাঁধা নেই।"

"তোমার নিজের মনেরই সুর বাঁধা নেই, তাই বলো না কেন?"

কথাটার সত্যতায় কুমুর মনে তখনই ঘা লাগল; বললে, "যন্ত্রটা ঠিক করে রাখি, তোমাকে আর একদিন শোনাব।"

"করে শোনাবে ঠিক করে বলো। কাল?"

"আচ্ছা, কাল।"

"সন্ধ্যেবেলায় আফিস থেকে ফিরে এলে?"

"হাঁ, তাই হবে।"

"এসরাজটা পেয়ে খুব খুশি হয়েছ?"

"খুব খুশি হয়েছি।"

শালের ভিতর থেকে একটা চামড়ার কেস বের করে মধুসূদন বললে, "তোমার জন্যে যে মুক্তার মালা কিনে এনেছি, এটা পেয়ে ততখানিই খুশি হবে না?"

এমনতরো মুশকিলের প্রশ্ন কেন জিজ্ঞাসা করা? কুমু চুপ করে এসরাজের ছড়িটা নাড়াচাড়া করতে লাগল।

"বুঝেছি, দরখাস্ত নামঞ্জুর।"

কুমু কথাটা ঠিক বুঝলে না।

মধুসূদন বললে, "তোমার বুকের কাছে আমার অন্তরের এই দরখাস্তটি লটকিয়ে দেব ইচ্ছে ছিল—কিন্তু তার আগেই ডিসমিস।"

কুমুর সামনে মেজের উপর গয়নাটা রইল খোলা। দুজনে কেউ একটিও কথা বললে না। থেকে থেকে কুমু যে-রকম স্বপ্নাবিষ্ট হয়ে যায়, তেমনি হয়ে রইল। একটু পরে যেন সচেতন হয়ে মালাটা তুলে নিয়ে গলায় পরলে, আর মধুসূদনকে প্রণাম করলে। বললে, "তুমি আমার বাজনা শুনবে?"

মধুসূদন বললে, "হঁ, শুনব।"

"এখনই শোনাব" বলে এসরাজে সুর বাঁধলে। কেদারায় আলাপ আরম্ভ করলে; ভুলে গেল ঘরে কেউ আছে, কেদারা থেকে পৌঁছল ছায়ানটে। যে-গানটি সে ভালোবাসে সেইটি ধরল, "ঠাড়ি রহো মেরে

আঁখনকে আগে।" সুরের আকাশে রঙিন ছায়া ফেলে এল সেই অপরূপ আবির্ভাব, যাকে কুমু গানে পেয়েছে, প্রাণে পেয়েছে. কেবল চোখে পাবার তৃষ্ণা নিয়ে যার জন্যে মিনতি চিরদিন রয়ে গেল—"ঠাড়ি রহো মেরে আঁখনকে আগে।"

মধুসূদন সংগীতের রস বোঝে না, কিন্তু কুমুর বিশ্ববিস্মৃত মুখের উপর যে-সুর খেলছিল, এসরাজের পর্দায় পর্দায় কুমুর আঙুল ছোঁয়ার যে ছন্দ নেচে উঠছিল তাই তার বুকে দোল দিলে, মনে হতে লাগল ওকে যেন কে বরদান করছে। আনমনে বাজাতে বাজাতে কুমু হঠাৎ একসময়ে দেখতে পেলে, মধুসূদন তার মুখের উপর একদৃষ্টে চেয়ে, অমনি হাত গেল থেমে, লজ্জা এল, বাজনা বন্ধ করে দিলে।

মধুসূদনের মন দাক্ষিণ্যে উদ্বেল হয়ে উঠল, বললে, "বড়োবউ, তুমি কী চাও বলো।" কুমু যদি বলত, কিছুদিন দাদার সেবা করতে চাই, মধুসূদন তাতেও রাজি হতে পারত ; কেননা আজ কুমুর গীতমুগ্ধ মুখের দিকে কেবলই চেয়ে চেয়ে সে নিজেকে বলছিল, "এই তো আমার ঘরে এসেছে, এ কী আশ্চর্য সত্য।"

কুমু এসরাজ মাটিতে রেখে, ছড়ি ফেলে চুপ করে রইল।

মধুসূদন আর-একবার অনুনয় করে বললে, "বড়োবউ, তুমি আমার কাছে কিছু চাও। যা চাও তাই পাবে।"

কুমু বললে, "মুরলী বেয়ারাকে একখানা শীতের কাপড় দিতে চাই।"

কুমু যদি বলত কিছু চাই নে, সেও ছিল ভালো, কিন্তু মুরলী বেহারার জন্যে গায়ের কম্বল! যে দিতে পারে মাথার মুকুট. তার কাছে চাওয়া জুতোর ফিতে!

মধুসূদন অবাক। রাগ হল বেহারাটার উপর। বললে. "লক্ষ্মীছাড়া মুরলী বুঝি তোমাকে বিরক্ত করছে?"

"না, আমি আপনিই ওকে একটা আলোয়ান দিতে গেলুম, ও নিল না। তুমি যদি হুকুম কর তবে সাহস করে নেবে।"

মধুসূদন স্তব্ধ হয়ে রইল। খানিক পরে বললে, "ভিক্ষে দিতে চাও! আচ্ছা দেখি, কই তোমার আলোয়ান।"

কুমু তার সেই অনেক দিনের পরা বাদামি রঙের আলোয়ান নিয়ে এল। মধুসূদন সেটা নিয়ে নিজের গায়ে জড়াল। টিপায়ের উপরকার ছোটো ঘণ্টা বাজিয়ে দিতে একজন বুড়ি দাসী এল; তাকে বললে, "মুরলী বেহারাকে ডেকে দাও।"

মুরলী এসে হাত জোড় করে দাঁড়াল; শীতে ও ভয়ে তার জোড়া হাত কাঁপছে।

"তোমার মা-জি তোমাকে বকশিশ দিয়েছেন," বলে মধুসূদন পকেট-কেস থেকে এক-শো টাকার একটা নোট বের করে তার ভাঁজ খুলে সেটা দিলে কুমুর হাতে। এ-রকম অকারণে অযাচিত দান মধুসূদনের দ্বারা জীবনে কখনো ঘটে নি। অসম্ভব ব্যাপারে মুরলী বেহারার ভয় আরও বেড়ে উঠল; দ্বিধাকম্পিত স্বরে বললে, "হুজুর—"

"হুজুর কী রে বেটা! বোকা, নে তোর মায়ের হাত থেকে। এই টাকা দিয়ে যত খুশি গরম কাপড় কিনে নিস।"

ব্যাপারটা এইখানে শেষ হল—সেই সঙ্গে সেদিনকার আর সমস্তই যেন শেষ হয়ে গেল। যে-স্রোতে কুমুর মন ভেসেছিল সে গেল হঠাৎ বন্ধ হয়ে, মধুসূদনের মনে আত্মত্যাগের যে-ঢেউ চিত্তসংকীর্ণতার কূল ছাপিয়ে উঠেছিল তাও সামান্য বেহারার জন্য তুচ্ছ প্রার্থনায় ঠেকে গিয়ে আবার তলায় গেল নেমে। এর পরে সহজে কথাবার্তা কওয়া দুই পক্ষেই অসাধ্য। আজ সন্ধ্যের সময় সেই তালুক-কেনা ব্যাপার নিয়ে লোক এসে বাইরের

ঘরে অপেক্ষা করছে, এ-কথাটা মধুসূদনের মনেই ছিল না। এতক্ষণ পরে চমকে উঠে ধিক্‌কার হল নিজের উপরে। উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "কাজ আছে, আসি।" দ্রুত চলে গেল।

পথের মধ্যে শ্যামাসুন্দরীর ঘরের সামনে এসে বেশ প্রকাশ্য কণ্ঠস্বরেই বললে, "ঘরে আছ ?"

শ্যামাসুন্দরী আজ খায় নি! একটা র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে মেজেয় মাদুরের উপর অবসন্ন ভাবে শুয়ে ছিল। মধুসূদনের ডাক শুনে তাড়াতাড়ি দরজার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলে, "কী ঠাকুরপো ?"

"পান দিলে না আমাকে ?"

৪৪

বাইরে অন্ধকারে দরজার আড়ালে একটি মানুষ এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল— হাবলু। কম সাহস না। মধুসূদনকে যমের মতো ভয় করে, তবু ছিল কাঠের পুতুলের মতো স্তব্ধ হয়ে। সেদিন মধুসূদনের কাছে তাড়া খাওয়ার পর থেকে জেঠাইমার কাছে আসবার সুবিধে হয় নি, মনের ভিতর ছটফট করেছে। আজ এই সন্ধ্যাবেলায় আসা নিরাপদ ছিল না। কিন্তু ওকে বিছানায় শুইয়ে রেখে মা যখন ঘরকন্নার কাজে চলে গেছে এমন সময় কানে এল এসরাজের সুর। কী বাজছে জানত না, কে বাজাচ্ছে বুঝতে পারে নি, জেঠাইমার ঘর থেকে আসছে এটা নিশ্চিত; জেঠামশায় সেখানে নেই এই তার বিশ্বাস, কেননা তাঁর সামনে কেউ বাজনা বাজাতে সাহস করবে এ-কথা সে মনেই করতে পারে না। উপরের তলার দরজার কাছে এসে জেঠামশায়ের জুতোজোড়া দেখেই পালাবার উপক্রম করলে। কিন্তু যখন বাইরে থেকে চোখে পড়ল ওর জেঠাইমা নিজে বাজাচ্ছেন, তখন কিছুতেই পালাতে পা সরল না। দরজার আড়ালে লুকিয়ে শুনতে

লেগেছে। প্রথম থেকেই জেঠাইমাকে ও জানে আশ্চর্য, আজ বিস্ময়ের অন্ত নেই। মধুসূদন চলে যেতেই মনের উচ্ছ্বাস আর ধরে রাখতে পারলে না—ঘরে ঢুকেই কুমুর কোলে গিয়ে বসে গলা জড়িয়ে ধরে কানের কাছে বললে, "জেঠাইমা।"

কুমু তাকে বুকে চেপে ধরে বললে, "এ কী, তোমার হাত যে ঠাণ্ডা! বাদলার হাওয়া লাগিয়েছ বুঝি।"

হাবলু কোনো উত্তর করলে না, ভয় পেয়ে গেল। ভাবলে জেঠাইমা এখনই বুঝি বিছানায় শুতে পাঠিয়ে দেবে। কুমু তাকে শালের মধ্যে ঢেকে নিয়ে নিজের দেহের তাপে গরম করে বললে, "এখনও শুতে যাও নি গোপাল?"

"তোমার বাজনা শুনতে এসেছিলুম। কেমন করে বাজাতে পারলে, জেঠাইমা?"

"তুমি যখন শিখবে তুমিও পারবে।"

"আমাকে শিখিয়ে দেবে?"

এমন সময় মোতির মা ঝড়ের মতো ঘরে ঢুকেই বলে উঠল, "এই বুঝি দস্যি, এখানে লুকিয়ে বসে! আমি ওকে সাতরাজ্যি খুঁজে বেড়াচ্ছি। এদিকে সন্ধ্যাবেলায় ঘরের বাইরে দু পা চলতে গা ছম ছম করে, জেঠাইমার কাছে আসবার সময় ভয়ডর থাকে না। চল্ শুতে চল্।"

হাবলু কুমুকে আঁকড়ে ধরে রইল।

কুমু বললে, "আহা, থাক্-না আর-একটু।"

"এমন করে সাহস বেড়ে গেলে শেষকালে বিপদে পড়বে। ওকে শুইয়ে আমি এখনই আসছি।"

কুমুর বড়ো ইচ্ছে হল হাবলুকে কিছু দেয়, খাবার কিংবা খেলার জিনিস। কিন্তু দেবার মতো কিছু নেই, তাই ওকে চুমো খেয়ে বললে,

"আজ শুতে যাও, লক্ষ্মী ছেলে, কাল দুপুরবেলা তোমাকে বাজনা শোনাব।"

হাবলু করুণ মুখে উঠে মায়ের সঙ্গে চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরেই মোতির মা ফিরে এল। নবীনের ষড়যন্ত্রের কী ফল হল তাই জানবার জন্যে মন অস্থির হয়ে আছে। কুমুর কাছে বসেই চোখে পড়ল, তার হাতে সেই নীলার আংটি। বুঝলে যে কাজ হয়েছে। কথাটা উত্থাপন করবার উপলক্ষ্য-স্বরূপ বললে, "দিদি, তোমার এই বাজনাটা পেলে কেমন করে?"

কুমু বললে, "দাদা পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

"বড়ঠাকুর তোমাকে এনে দিলেন বুঝি?"

কুমু সংক্ষেপে বললে, "হাঁ।"

মোতির মা কুমুর মুখের দিকে তাকিয়ে উল্লাস বা বিস্ময়ের চিহ্ন খুঁজে পেলে না।

"তোমার দাদার কথা কিছু বললেন কি?"

"না।"

"পরশু তিনি তো আসবেন, তাঁর কাছে তোমার যাবার কথা উঠল না?"

"না, দাদার কোনো কথা হয় নি।"

"তুমি নিজেই চাইলে না কেন, দিদি?"

"আমি ওঁর কাছে আর যা-কিছু চাই নে কেন, এটা পারব না।"

"তোমার চাবার দরকার হবে না, তুমি অমনিই ওঁর কাছে চলে যেয়ো। বড়ঠাকুর কিছুই বলবেন না।"

মোতির মা এখনও একটা কথা সম্পূর্ণ বুঝতে পারে নি যে, মধুসূদনের অনুকূলতা কুমুর পক্ষে সংকট হয়ে উঠেছে; এর বদলে মধুসূদন যা চায়

তা ইচ্ছে করলেও কুমু দিতে পারে না। ওর হৃদয় হয়ে গেছে দেউলে। এইজন্যেই মধুসূদনের কাছে দান গ্রহণ করে ঋণ বাড়াতে এত সংকোচ। কুমুর এমনও মনে হয়েছে যে, দাদা যদি আর কিছুদিন দেরি করে আসে তো সেও ভালো।

একটু অপেক্ষা করে থেকে মোতির মা বললে, "আজ মনে হল বড়ঠাকুরের মন যেন প্রসন্ন।"

সংশয়ব্যাকুল চোখে কুমু মোতির মার মুখে তাকিয়ে বললে, "এ-প্রসন্নতা কেন ঠিক বুঝতে পারি নে, তাই আমার ভয় হয়; কী করতে হবে ভেবে পাই নে।"

কুমুর চিবুক ধরে মোতির মা বললে, "কিছুই করতে হবে না; এটুকু বুঝতে পারছ না, এতদিন উনি কেবল কারবার করে এসেছেন, তোমার মতো মেয়েকে কোনোদিন দেখেন নি। একটু একটু করে যতই চিনছেন ততই তোমার আদর বাড়ছে।"

"বেশি দেখলে বেশি চিনবেন, এমন কিছুই আমার মধ্যে নেই, ভাই। আমি নিজেই দেখতে পাচ্ছি আমার ভিতরটা শূন্য। সেই ফাঁকটাই দিনে দিনে ধরা পড়বে। সেইজন্যেই হঠাৎ যখন দেখি উনি খুশি হয়েছেন, আমার মনে হয় উনি বুঝি ঠকেছেন। যেই সেটা ফাঁস হবে সেই আরও রেগে উঠবেন। সেই রাগটাই যে সত্য, তাই তাকে আমি তেমন ভয় করি নে।"

"তোমার দাম তুমি কী জান দিদি। যেদিন এদের বাড়িতে এসেছ, সেইদিনই তোমার পক্ষ থেকে যা দেওয়া হল, এরা সবাই মিলে তা শুধতে পারবে না। আমার কর্তাটি তো একেবারে মরিয়া, তোমার জন্যে সাগর লঙ্ঘন না করতে পারলে স্থির থাকতে পারছেন না। আমি যদি তোমাকে না ভালোবাসতুম তবে এই নিয়ে ওঁর সঙ্গে আমার ঝগড়া হয়ে যেত।"

কুমু হাসলে, বললে, "কত ভাগ্যে এমন দেবর পেয়েছি।"

"আর তোমার এই জা-টি বুঝি ভাগ্যস্থানে রাহু না কেতু।"

"তোমাদের একজনের নাম করলে আর-একজনের নাম করবার দরকার হয় না।"

মোতির মা ডান হাত দিয়ে কুমুর গলা জড়িয়ে ধরে বললে, "আমার একটা অনুরোধ আছে তোমার কাছে।"

"কী বলো।"

"আমার সঙ্গে তুমি 'মনের কথা' পাতাও।"

"সে বেশ কথা, ভাই। প্রথম থেকে মনে-মনে পাতানো হয়েই গেছে।"

"তাহলে আমার কাছে কিছু চেপে রেখো না। আজ তুমি অমন মুখটি করে কেন আছ কিছুই বুঝতে পারছি নে।"

খানিকক্ষণ মোতির মার মুখের দিকে চেয়ে থেকে কুমু বললে, "ঠিক কথা বলব? নিজেকে আমার কেমন ভয় করছে।"

"সে কী কথা! নিজেকে কিসের ভয়?"

"আমি এতদিন নিজেকে যা মনে করতুম আজ হঠাৎ দেখছি তা নই। মনের মধ্যে সমস্ত গুছিয়ে নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েই এসেছিলুম। দাদারা যখন দ্বিধা করেছেন, আমি জোর করেই নতুন পথে পা বাড়িয়েছি। কিন্তু যে-মানুষটা ভরসা করে বেরোল তাকে আজ কোথাও দেখতে পাচ্ছি নে।"

"তুমি ভালোবাসতে পারছ না। আচ্ছা, আমার কাছে লুকিয়ো না, সত্যি করে বলো, কাউকে কি ভালোবেসেছ? ভালোবাসা কাকে বলে তুমি কি জান?"

"যদি বলি জানি, তুমি হাসবে। সূর্য ওঠবার আগে যেমন আলো হয় আমার সমস্ত আকাশ ভরে ভালোবাসা তেমনি করেই জেগেছিল।

কেবলই মনে হয়েছে সূর্য উঠল বলে। সেই সূর্যোদয়ের কল্পনা মাথায় করেই আমি বেরিয়েছি—তীর্থের জল নিয়ে, ফুলের সাজি সাজিয়ে। যে-দেবতাকে এতদিন সমস্ত মন দিয়ে মেনে এসেছি, মনে হয়েছে তাঁর উৎসাহ পেলুম। যেমন করে অভিসারে বেরোয় তেমনি করেই বেরিয়েছি। অন্ধকার রাত্রিকে অন্ধকার বলে মনেই হয় নি, আজ আলোতে চোখ মেলে অন্তরেই বা কী দেখলুম, বাইরেই বা কী দেখছি! এখন বছরের পর বছর, মুহূর্তের পর মুহূর্ত কাটবে কী করে?"

"তুমি কি বড়ঠাকুরকে ভালোবাসতে পারবে না মনে কর?

"পারতুম ভালোবাসতে। মনের মধ্যে এমন কিছু এনেছিলুম যাতে সবই পছন্দমতো করে নেওয়া সহজ হত। গোড়াতেই সেইটেকে তোমার বড়ঠাকুর ভেঙে চুরমার করে দিয়েছেন। আজ সব জিনিস কড়া হয়ে আমাকে বাজছে। আমার শরীরের উপরকার নরম ছালটাকে কে যেন ঘষড়ে তুলে দিল, তাই চারি দিকে সবই আমাকে লাগছে, কেবলই লাগছে; যা কিছু ছুঁই তাতেই চমকে উঠি; এর পরে কড়া পড়ে গেলে কোনো একদিন হয়তো সয়ে যাবে, কিন্তু জীবনে কোনোদিন আনন্দ পাব না তো।"

"বলা যায় না ভাই।"

"খুব বলা যায়। আজ আমার মনে একটুমাত্র মোহ নেই। আমার জীবনটা একেবারে নির্লজ্জের মতো স্পষ্ট হয়ে গেছে। নিজেকে একটু ভোলাবার মতো আড়াল কোথাও বাকি রইল না। মরণ ছাড়া মেয়েদের কি আর কোথাও নড়ে বসবার একটুও জায়গা নেই? তাদের সংসারটাকে নিষ্ঠুর বিধাতা এত আঁট করেই তৈরি করেছে?"

এতক্ষণ ধরে এমনতরো উত্তেজনার কথা কুমুর মুখে মোতির মা আর কোনোদিন শোনে নি। বিশেষ করে আজ যেদিন বড়ঠাকুরকে ওরা কুমুর প্রতি এতটা প্রসন্ন করে এনেছে, সেইদিনই কুমুর এই তীব্র অধৈর্য দেখে

মোতির মা ভয় পেয়ে গেল। বুঝলে লতার একেবারে গোড়ায় ঘা লেগেছে, উপর থেকে অনুগ্রহের জল ঢেলে মালী আর একে তাজা করে তুলতে পারবে না।

একটু পরে কুমু বলে উঠল, "জানি, স্বামীকে এই যে শ্রদ্ধার সঙ্গে আত্মসমর্পণ করতে পারছি নে এ আমার মহাপাপ। কিন্তু সে-পাপেও আমার তেমন ভয় হচ্ছে না যেমন হচ্ছে শ্রদ্ধাহীন আত্মসমর্পণের গ্লানির কথা মনে করে।"

মোতির মা কোনো উত্তর না ভেবে পেয়ে হতবুদ্ধির মতো বসে রইল। একটু চুপ করে থেকে কুমু বললে, "তোমার কত ভাগ্যি ভাই, কত পুণ্যি করেছিলে, ঠাকুরপোকে এমন সমস্ত মনটা দিয়ে ভালোবাসতে পেরেছ। আগে মনে করতুম, ভালোবাসাই সহজ— সব স্ত্রী সব স্বামীকে আপনিই ভালোবাসে আজ দেখতে পাচ্ছি ভালোবাসতে পারাটাই সব চেয়ে দুর্লভ, জন্মজন্মান্তরের সাধনায় ঘটে। আচ্ছা ভাই, সত্যি বলো, সব স্ত্রীই কি স্বামীকে ভালোবাসে?"

মোতির মা একটু হেসে বললে, "ভালো না বাসলেও ভালো স্ত্রী হওয়া যায়, নইলে সংসার চলবে কী করে?"

"সেই আশ্বাস দাও আমাকে। আর কিছু না হই ভালো স্ত্রী যেন হতে পারি। পুণ্য তাতেই বেশি, সেইটেই কঠিন সাধনা।"

"বাইরে থেকে তাতেও বাধা পড়ে।"

"অন্তর থেকে সে বাধা কাটিয়ে উঠতে পারা যায়। আমি পারব, আমি হার মানব না।"

"তুমি পারবে না তো কে পারবে?"

বৃষ্টি জোর করে চেপে এল। বাতাসে ল্যাম্পের আলো থেকে থেকে চকিত হয়ে ওঠে। দমকা হাওয়া যেন একটা ভিজে নিশাচর পাখির

মতো পাখা ঝাপটে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে। কুমুর শরীরটা মনটা শির শির করে উঠল। সে বললে, "আমার ঠাকুরের নামে আর জোর পাচ্ছি নে। মন্ত্র আবৃত্তি করে যাই, মনটা মুখ ফিরিয়ে থাকে, কিছুতে সাড়া দিতে চায় না। তাতেই সব চেয়ে ভয় হয়।"

বানানো কথায় মিথ্যে ভরসা দিতে মোতির মার ইচ্ছে হল না। কোনো উত্তর না করে সে কুমুকে বুকের কাছে জড়িয়ে ধরলে। এমন সময় বাইরে থেকে আওয়াজ পাওয়া গেল, "মেজোবউ।"

কুমু খুশি হয়ে উঠে বললে, "এস, এস ঠাকুরপো।"

"সন্ধ্যাবেলাকার ঘরের আলোটিকে ঘরে দেখতে পেলুম না, তাই খুঁজতে বেরিয়েছি।"

মোতির মা বললে, "হায় হায়, মণিহারা ফণী যাকে বলে!"

"কে মণি আর কে ফণী তা চক্র নাড়া দেখলেই বোঝা যায়, কী বল বউরানী।"

"আমাকে সাক্ষী মেনো না ঠাকুরপো।"

"জানি, তাহলে আমি ঠকব।"

"তা তোমার হারাধনকে তুমি উদ্ধার করে নিয়ে যাও, আমি ধরে রাখব না।"

"হারাধনের জন্যে ওঁর কোনো উৎসাহ নেই দিদি, ছুতো করে বউ-রানীর চরণ দর্শন করতে এসেছেন।"

"ছুতোর কি কোনো দরকার আছে? চরণ আপনি ধরা দিয়েছে। সব চেয়ে যা অসাধ্য তার সাধনা করবে কে? সে যখন আসে সহজেই আসে। পৃথিবীতে হাজার হাজার মানুষ আছে আমার চেয়ে যোগ্য, তবু অমন সুন্দর পা-দুখানি আমিই পারলুম ছুঁতে, তারা তো পারলে না। নবীনের জন্ম সার্থক হয়ে গেল বিনা মূল্যে।"

"আঃ, কী বল ঠাকুরপো, তার ঠিক নেই। তোমার এনসাইক্লোপীডিয়া থেকে বুঝি—"

অমন কথা বলতে পারবে না, বউরানী। চরণ বলতে কী বোঝায় তা ওরা জানবে কী করে? ছাগলের খুরের মতো সরু সরু ঠেকোওআলা জুতোর মধ্যে লক্ষ্মীদের পা কড়া জেনানার মধ্যে ওরা বন্দী করে রেখেছে। সাইক্লোপীডিয়াওআলার সাধ্য কী পায়ের মহিমা বোঝে। লক্ষ্মণ চোদ্দটা বৎসর কেবল সীতার পায়ের দিকে তাকিয়েই নির্বাসন কাটিয়ে দিলেন, তার মানে আমাদের দেশের দেওররাই জানে। তা পায়ের উপরে শাড়ি টেনে দিচ্ছ তো দাও। ভয় নেই তোমার, পদ্ম সন্ধ্যেবেলায় মুদে থাকে বলে তো বরাবর মুদেই থাকে না—আবার তো পাপড়ি খোলে।"

"ভাই মনের কথা, এমনিতরো স্তব করেই বুঝি ঠাকুরপো তোমার মন ভুলিয়েছেন?"

"একটুও না দিদি, মিষ্টিকথার বাজে খরচ করবার লোক নন উনি।"

"স্তুতির বুঝি দরকার হয় না?"

"বউরানী, স্তুতির ক্ষুধা দেবীদের কিছুতেই মেটে না, দরকার খুব আছে। কিন্তু শিবের মতো আমি তো পঞ্চানন নই, এই একটিমাত্র মুখের স্তুতি পুরোনো হয়ে গেছে, এতে উনি আর রস পাচ্ছেন না।"

এমন সময় মুরলী বেয়ারা এসে নবীনকে খবর দিলে, "কর্তামহারাজা বাইরের আপিস-ঘরে ডাক দিয়েছেন।"

শুনে নবীনের মন খারাপ হয়ে গেল। সে ভেবেছিল মধুসূদন আজ আপিস থেকে ফিরেই একেবারে সোজা তার শোবার ঘরে এসে উপস্থিত হবে। নৌকো বুঝি আবার ঠেকে গেল চড়ায়।

নবীন চলে গেলে মোতির মা আস্তে আস্তে বললে, "বড়ঠাকুর কিন্তু তোমাকে ভালোবাসেন সে-কথা মনে রেখো।"

কুমু বললে, "সেইটেই তো আমার আশ্চর্য ঠেকে।"

"বল কী, তোমাকে ভালোবাসা আশ্চর্য! কেন? উনি কি পাথরের?"

"আমি ওঁর যোগ্য না।"

"তুমি যাঁর যোগ্য নও সে-পুরুষ কোথায় আছে?"

"ওঁর কতবড়ো শক্তি, কত সম্মান, কত পাকা বুদ্ধি, উনি কত মস্ত মানুষ। আমার মধ্যে উনি কতটুকু পেতে পারেন? আমি যে কী অসম্ভব কাঁচা তা এখানে এসে দুদিনে বুঝতে পেরেছি। সেইজন্যেই যখন উনি ভালোবাসেন তখনই আমার সব-চেয়ে বেশি ভয় করে! আমি নিজের মধ্যে যে কিছুই খুঁজে পাই নে। এতবড়ো ফাঁকি নিয়ে আমি ওঁর সেবা করব কী করে? কাল রাত্তিরে বসে বসে মনে হল আমি যেন বেয়ারিং লেফাফা, আমাকে দাম দিয়ে নিতে হয়েছে, খুলে ফেললেই ধরা পড়বে যে ভিতরে চিঠিও নেই।"

"দিদি, হাসালে। বড়ঠাকুরের মস্তবড়ো কারবার, কারবারি বুদ্ধিতে ওঁর সমান কেউ নেই সব জানি। কিন্তু তুমি কি ওঁর কারবারের ম্যানেজারি করতে এসেছ যে, যোগ্যতা নেই বলে ভয় পাবে? বড়ঠাকুর যদি মনের কথা খোলসা করে বলেন তবে নিশ্চয় বলবেন তিনিও তোমার যোগ্য নন।"

"সে-কথা তিনি আমাকে বলেছিলেন।"

"বিশ্বাস হয় নি?"

"না। উলটে আমায় ভয় হয়েছিল। মনে হয়েছিল আমার সম্বন্ধে ভুল করলেন, সে-ভুল ধরা পড়বে।"

"কেন তোমার এমন মনে হল বলো দেখি?"

"বলব? এই-যে আমার হঠাৎ বিয়ে হয়ে গেল, এ তো সমস্ত আমি নিজে ঘটিয়ে তুললুম— কিন্তু কী অদ্ভুত মোহে, কী ছেলেমানুষি করে?

যা-কিছুতে আমাকে সেদিন ভুলিয়েছিল তার মধ্যে সমস্তই ছিল ফাঁকি। অথচ এমন দৃঢ় বিশ্বাস, এমন বিষম জেদ যে, সেদিন আমাকে কিছুতেই কেউ ঠেকাতে পারত না। দাদা তা নিশ্চিত জানতেন বলেই বৃথা বাধা দিলেন না, কিন্তু কত ভয় পেয়েছেন, কত উদ্বিগ্ন হয়েছেন তা কি আমি বুঝতে পারি নি? বুঝতে পেরেও নিজের ঝোঁকটাকে একটুও সামলাই নি, এতবড়ো অবুঝ আমি। আজ থেকে চিরদিন আমি কেবলই কষ্ট পাব, কষ্ট দেব, আর প্রতিদিন মনে জানব এ-সমস্তই আমার নিজের সৃষ্টি।"

মোতির মা কী যে বলবে কিছুই ভেবে পেলে না। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে জিজ্ঞাসা করলে, "আচ্ছা দিদি, তুমি যে বিয়ে করতে মন স্থির করলে কী ভেবে?"

"তখন নিশ্চিত জানতুম স্বামী ভালোমন্দ যাই হোক না কেন স্ত্রীর সতীত্বগৌরব প্রমাণের একটা উপলক্ষ্য মাত্র। মনে একটুও সন্দেহ ছিল না যে, প্রজাপতি যাকেই স্বামী বলে ঠিক করে দিয়েছেন তাকেই ভালোবাসবই। ছেলেবেলা থেকে কেবল মাকে দেখেছি, পুরাণ পড়েছি, কথকতা শুনেছি, মনে হয়েছে শাস্ত্রের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে চলা খুব সহজ।"

"দিদি, উনিশ বছরের কুমারীর জন্যে শাস্ত্র লেখা হয় নি।"

"আজ বুঝতে পেরেছি সংসারে ভালোবাসাটা উপরি-পাওনা। ওটাকে বাদ দিয়েই ধর্মকে আঁকড়ে ধরে সংসারসমুদ্রে ভাসতে হবে। ধর্ম যদি সরস হয়ে ফুল না দেয়, ফল না দেয়, অন্তত শুকনো হয়ে যেন ভাসিয়ে রাখে।"

মোতির মা নিজে বিশেষ কিছু না বলে কুমুকে দিয়ে কথা বলিয়ে নিতে লাগল।

৪৫

মধুসূদন আপিসে গিয়েই দেখলে খবর ভালো নয়। মাদ্রাজের এক বড়ো ব্যাঙ্ক ফেল করেছে, তাদের সঙ্গে এদের কারবার। তার পরে কানে এল যে, কোনো ডাইরেক্টরের তরফ থেকে কোনো কোনো কর্মচারী মধুসূদনের অজানিতে খাতাপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করছে। এতদিন কেউ মধুসূদনকে সন্দেহ করতে সাহস করে নি, একজন যেই ধরিয়ে দিয়েছে অমনি যেন একটা মন্ত্রশক্তি ছুটে গেল। বড়ো কাজের ছোটো ত্রুটি ধরা সহজ, যারা মাতব্বর সেনাপতি তারা কত খুচরো হারের ভিতর দিয়ে মোটের উপর মস্ত করেই জেতে। মধুসূদন বরাবর তেমনি জিতেই এসেছে —তাই বেছে বেছে খুচরো হার কারও নজরেই পড়ে নি। কিন্তু বেছে বেছে তারই একটা ফর্দ বানিয়ে সেটা সাধারণ লোকের নজরে তুললে তারা নিজের বুদ্ধির তারিফ করে, বলে আমরা হলে এ-ভুল করতুম না। কে তাদের বোঝাবে যে, ফুটো নৌকো নিয়েই মধুসূদন পাড়ি দিয়েছে, নইলে পাড়ি দেওয়াই হত না, আসল কথাটা এই যে, কূলে পৌঁছল। আজ নৌকোটা ডাঙায় তুলে ফুটোগুলোর বিচার করবার বেলায়, যারা নিরাপদে এসেছে ঘাটে, তাদের গা শিউরে উঠছে। এমনতরো টুকরো সমালোচনা নিয়ে আনাড়িদের ধাঁধা লাগানো সহজ। সাধারণত আনাড়িদের সুবিধে এই যে, তারা লাভ করতে চায়, বিচার করতে চায় না। কিন্তু যদি দৈবাৎ বিচার করতে বসে তবে মারাত্মক হয়ে ওঠে। এই-সব বোকাদের উপর মধুসূদনের নিরতিশয় অবজ্ঞামিশ্রিত ক্রোধের উদয় হল। কিন্তু বোকাদের যেখানে প্রাধান্য সেখানে তাদের সঙ্গে রফা করা ছাড়া গতি নেই। জীর্ণ মই মচ্ মচ্ করে, দোলে, ভাঙার ভয় দেখায়, যে-ব্যক্তি উপরে চড়ে তাকে এই পায়ের তলার অবলম্বনটাকে বাঁচিয়ে চলতেই

হয়। রাগ করে লাথি মারতে ইচ্ছে করে, তাতে মুশকিল আরও বাড়বারই কথা।

শাবকের বিপদের সম্ভাবনা দেখলে সিংহিনী নিজের আহারের লোভ ভুলে যায়, ব্যাবসা সম্বন্ধে মধুসূদনের সেইরকম মনের অবস্থা। এ যে তার নিজের সৃষ্টি ; এর প্রতি তার যে-দরদ সে প্রধানত টাকার দরদ নয়। যার রচনাশক্তি আছে, আপন রচনার মধ্যে সে নিজেকেই নিবিড় করে পায়, সেই পাওয়াটা যখন বিপন্ন হয়ে ওঠে তখন জীবনের আর-সমস্ত সুখদুঃখ-কামনা তুচ্ছ হয়ে যায়। কুমু মধুসূদনকে কিছুদিন থেকে প্রবল টানে টেনেছিল, সেটা হঠাৎ আলগা হয়ে গেল। জীবনে ভালোবাসার প্রয়োজনটা মধুসূদন প্রৌঢ় বয়সে খুব জোরের সঙ্গে অনুভব করেছিল। এই উপসর্গ যখন অকালে দেখা দেয় তখন উদ্দাম হয়েই ওঠে। মধুসূদনকে ধাক্কা কম লাগে নি, কিন্তু আজ তার বেদনা গেল কোথায় ?

নবীন ঘরে আসতেই মধুসূদন জিজ্ঞাসা করলে, "আমার প্রাইভেট জমাখরচের খাতা বাইরের কোনো লোকের হাতে পড়েছে কি, জান ?

নবীন চমকে উঠল, বললে, "সে কী কথা।"

"তোমাকে খুঁজে বের করতে হবে খাতাঞ্চির ঘরে কেউ আনাগোনা করছে কি না।"

"রতিকান্ত বিশ্বাসী লোক, সে কি কখনো—"

"তার অজানতে মুহুরিদের সঙ্গে কেউ কথা-চালাচালি করছে বলে সন্দেহের কারণ ঘটেছে। খুব সাবধানে খবরটা জানা চাই কারা এর মধ্যে আছে।"

চাকর এসে খবর দিলে খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। মধুসূদন সে-কথায় মন না দিয়ে নবীনকে বললে, "শীঘ্র আমার গাড়িটা তৈরি করে আনতে বলে দাও।"

নবীন বললে, "খেয়ে বেরোবে না? রাত হয়ে আসছে।"

"বাইরেই খাব, কাজ আছে।"

নবীন মাথা হেঁট করে ভাবতে ভাবতে বেরিয়ে এল। সে যে-কৌশল করেছিল ফেঁসে গেল বুঝি।

হঠাৎ মধুসূদন নবীনকে ফিরে ডেকে বললে, "এই চিঠিখানা কুমুকে দিয়ে এস।"

নবীন দেখলে বিপ্রদাসের চিঠি। বুঝলে এ-চিঠি আজ সকালেই এসেছে, সন্ধ্যেবেলায় নিজের হাতে কুমুকে দেবে বলে মধুসূদন রেখেছিল। এমনি করে প্রত্যেকবার মিলন উপলক্ষ্যে একটা কিছু অর্ঘ্য হাতে করে আনবার ইচ্ছে। আজ আপিসের কাজে হঠাৎ তুফান উঠে তার এই আদরের আয়োজনটুকু গেল ডুবে।

মাদ্রাজে যে-ব্যাঙ্ক ফেল করেছে সেটার উপরে সাধারণের নিশ্চিত আস্থা ছিল। তার সঙ্গে ঘোষাল-কোম্পানির যে-যোগ সে-সম্বন্ধে অধ্যক্ষদের বা অংশীদারদের কারো মনে কিছুমাত্র সংশয় ছিল না। যেই কল বিগড়ে গেল অমনি অনেকেই বলাবলি করতে আরম্ভ করলে যে, আমরা গোড়া থেকেই ঠাউরেছিলুম, ইত্যাদি।

সাংঘাতিক আঘাতের সময় ব্যাবসাকে যখন একজোট হয়ে রক্ষার চেষ্টা দরকার, সেই সময়েই পরাজয়ের সম্বন্ধে দোষারোপ প্রবল হয়ে ওঠে এবং যাদের প্রতি কারো ঈর্ষা আছে তাদেরকে অপদস্থ করবার চেষ্টায় টলমলে ব্যাবসাকে কাত করে ফেলা হয়। সেইরকম চেষ্টা চলবে মধুসূদন তা বুঝেছিল। মাদ্রাজ ব্যাঙ্কের বিপর্যয়ে ঘোষাল-কোম্পানির লোকসানের পরিমাণ যে কতটা দাঁড়াবে এখনো তা নিশ্চিত জানবার সময় হয় নি, কিন্তু মধুসূদনের প্রতিপত্তি নষ্ট করবার আয়োজনে এও যে একটা মসলা জোগাবে তাতে সন্দেহ ছিল না। যাই হোক, সময়

খারাপ, এখন অন্য সব কথা ভুলে এইটেতেই মধুসূদনকে কোমর বাঁধতে হবে।

রাত্রে মধুসূদনের সঙ্গে আলাপ হবার পর নবীন ফিরে এসে দেখলে, কুমুর সঙ্গে মোতির মার তখনো কথা চলছে। নবীন বললে, "বউরানী, তোমার দাদার চিঠি আছে।"

কুমু চমকে উঠে চিঠিখানা নিলে। খুলতে হাত কাঁপতে লাগল। ভয় হল হয়তো কিছু অপ্রিয় সংবাদ আছে। হয়তো এখন আসাই হবে না। খুব ধীরে ধীরে খাম খুলে পড়ে দেখলে। একটু চুপ করে রইল। মুখ দেখে মনে হল যেন কোথায় ব্যথা বেজেছে। নবীনকে বললে, "দাদা আজ বিকেলে তিনটের সময় কলকাতায় এসেছেন।"

"আজই এসেছেন! তাঁর তো—"

"লিখেছেন দুই-একদিন পরে আসবার কথা ছিল, কিন্তু বিশেষ কারণে আগেই আসতে হল।"

কুমু আর কিছু বললে না। চিঠির শেষদিকে ছিল, একটু সেরে উঠলেই বিপ্রদাস কুমুকে দেখতে আসবে, সেজন্যে কুমু যেন ব্যস্ত বা উদ্বিগ্ন না হয়। এই কথাটাই আগেকার চিঠিতেও ছিল। কেন, কী হয়েছে? কুমু কী অপরাধ করেছে? এ যেন একরকম স্পষ্ট করেই বলা, তুমি আমাদের বাড়িতে এসো না। ইচ্ছে করল মাটিতে লুটিয়ে পড়ে খানিকটা কেঁদে নেয়। কান্না চেপে পাথরের মতো শক্ত হয়ে বসে রইল।

নবীন বুঝলে, চিঠির মধ্যে একটা কী কঠিন মার আছে। কুমুর মুখ দেখে করুণায় ওর মন ব্যথিত হয়ে উঠল। বললে, "বউরানী, তাঁর কাছে তো কালই তোমার যাওয়া চাই।"

"না, আমি যাব না।" যেমনি বলা অমনি আর থাকতে পারলে না, দুই হাত দিয়ে মুখ ঢেকে কেঁদে উঠল। মোতির মা কোনো প্রশ্ন না করে কুমুকে

বুকের কাছে টেনে নিলে, কুমু রুদ্ধকণ্ঠে বলে উঠল, "দাদা আমাকে যেতে বারণ করেছেন।"

নবীন বললে, "না না, বউরানী, তুমি নিশ্চয় ভুল বুঝেছ।"

কুমু খুব জোরে মাথা নেড়ে জানিয়ে দিলে যে, সে একটুও ভুল বোঝে নি।

নবীন বললে, "তুমি কোথায় ভুল বুঝেছ বলব? বিপ্রদাসবাবু মনে করেছেন আমার দাদা তোমাকে তাঁদের ওখানে যেতে দিতে চাইবেন না। চেষ্টা করতে গিয়ে পাছে তোমাকে অপমানিত হতে হয়, পাছে তুমি কষ্ট পাও সেইটে বাঁচাবার জন্যে তিনি নিজে থেকে তোমার রাস্তা সোজা করে দিয়েছেন।"

কুমু এক মুহূর্তে গভীর আরাম পেলে। তার ভিজে চোখের পল্লব নবীনের মুখের দিকে তুলে স্নিগ্ধদৃষ্টিতে চুপ করে চেয়ে রইল। নবীনের কথাটা যে সম্পূর্ণ সত্য তাতে একটুও সন্দেহ রইল না। দাদার স্নেহকে ক্ষণকালের জন্যও ভুল বুঝতে পেরেছে বলে নিজের উপর ধিক্‌কার হল। মনে খুব একটা জোর পেলে। এখনই দাদার কাছে ছুটে না গিয়ে দাদার আসার জন্যে সে অপেক্ষা করতে পারবে। সেই ভালো।

মোতির মা চিবুক ধরে কুমুর মুখ তুলে ধরে বললে, "বাস্ রে, দাদার কথায় একটু আড় হাওয়া লাগলেই একেবারে অভিমানের সমুদ্র উথলে ওঠে।"

নবীন বললে, "বউরানী, কাল তাহলে তোমার যাবার আয়োজন করি গে।"

"না, তার দরকার নেই।"

"দরকার নেই তো কী? তোমার দরকার না থাকে তো আমার দরকার আছে বই কি।"

"তোমার আবার কিসের দরকার ?"

"বা ! আমার দাদাকে তোমার দাদা যা-কিছু ঠাওরাবেন সেটা বুঝি অমনি সয়ে যেতে হবে ! আমার দাদার পক্ষ নিয়ে আমি লড়ব। তোমার কাছে হার মানতে পারব না। কাল তোমাকে ওঁর কাছে যেতেই হচ্ছে।"

কুমু হাসতে লাগল।

"বউরানী, এ ঠাট্টার কথা নয়। আমাদের বাড়ির অপবাদে তোমার অগৌরব। এখন চোখে মুখে একটু জল দিয়ে এস, খেতে যাবে। ম্যানেজার-সাহেবের ওখানে দাদার আজ নিমন্ত্রণ। আমার বিশ্বাস তিনি আজ বাড়ির ভিতরে শুতে আসবেন না, দেখলুম বাইরের কামরায় তাঁর বিছানা তৈরি।"

এই খবরটা পেয়ে কুমু মনে মনে আরাম পেলে, তার পরক্ষণেই এতটা আরাম পেলে বলে লজ্জা বোধ হল।

রাত্রে শোবার ঘরে মোতির মার সঙ্গে নবীনের ওই কথাটা নিয়ে পরামর্শ চলল। মোতির মা বললে, "তুমি তো দিদিকে আশ্বাস দিলে ! তার পরে ?"

"তার পরে আবার কী। নবীনের যেমন কথা তেমনি কাজ। বউরানীকে যেতেই হবে, তার পরে যা হয় তা হবে।"

নতুন-গড়া রাজাদের পারিবারিক মর্যাদাবোধ খুবই উগ্র। এঁরা নিশ্চয় ঠিক করে আছেন যে, বিবাহ করে নববধূ তার পূর্ব-পদবীর চেয়ে অনেক উপরে উঠেছে ; অতএব বাপের বাড়ি বলে কোনো বালাই আছে এ-কথা একেবারে ভুলতে দেওয়াই সংগত। এ-অবস্থায় দুই দিক রক্ষা করা যদি অসম্ভব হয় তবে একটা দিক তো রাখতেই হবে। সেই দিকটা যে কোন্‌টা তা নবীন মনে-মনে পাকা করে রাখলে। যেখানে দাদার অধিকার চরম, সেখানেও কোনোদিন দাদার সঙ্গে লড়াই বাধাতে সাহস

করতে পারবে এ-কথা আর কিছুদিন আগে নবীন স্বপ্নেও ভাবতে পারত না।

স্বামীস্ত্রীতে পরামর্শ করে স্থির হল যে, কাল সকালে কুমু একবার মাত্র বিপ্রদাসের সঙ্গে কিছুক্ষণের জন্যে দেখা করে আসবে, এই প্রস্তাব মধুসূদনের কাছে করা হবে। যদি রাজি হয় এবং কুমুকে সেখানে পাঠানো যায় তাহলে তার পরে সেখান থেকে দু-চার দিনের মধ্যে তাকে না ফেরাবার সংগত কারণ বানানো শক্ত হবে না।

মধুসূদন বাড়ি ফিরল অনেক রাত্রে. সঙ্গে একরাশ কাগজপত্রের বোঝা। নবীন উঁকি মেরে দেখলে, মধুসূদন শুতে না গিয়ে চোখে চশমা এঁটে নীল পেনসিল হাতে আপিস-ঘরের ডেস্কে কোনো দলিলে বা দাগ দিচ্ছে, নোটবইয়ে বা নোট নিচ্ছে। নবীন সাহস করে ঘরে ঢুকেই বললে, "দাদা, আমি কি তোমার কোনো কাজ করে দিতে পারি?" মধুসূদন সংক্ষেপে বললে, "না।" ব্যাবসার এই সংকটের অবস্থাটাকে মধুসূদন সম্পূর্ণ নিজে আয়ত্ত করে নিতে চায়, সবটা তার একার চোখে প্রত্যক্ষ হওয়া দরকার; এ-কাজে অন্যের দৃষ্টির সহায়তা নিতে গেলে নিজেকে দুর্বল করা হবে।

নবীন কোনো কথা বলবার ছিদ্র না পেয়ে বেরিয়ে গেল। শীঘ্র যে সুযোগ পাওয়া যাবে এমন তো ভাবে বোধ হল না। নবীনের পণ, কাল সকালেই বউরানীকে রওনা করে দেবে। আজ রাত্রেই সম্মতি আদায় করা চাই।

খানিকক্ষণ বাদে নবীন একটা ল্যাম্প হাতে করে দাদার টেবিলের উপরে রেখে বললে, "তোমার আলো কম হচ্ছে।"

মধুসূদন অনুভব করলে, এই দ্বিতীয় ল্যাম্পে তার কাজের অনেকখানি সুবিধা হল। কিন্তু এই উপলক্ষ্যেও কোনো কথার সূচনা হতে পারল না। আবার নবীনকে বেরিয়ে আসতে হল।

একটু পরেই মধুসূদনের অভ্যস্ত গুড়গুড়িতে তামাক সেজে তার চৌকির বাঁ পাশে বসিয়ে নলটা টেবিলের উপর আস্তে আস্তে তুলে রাখলে। মধুসূদন তখনই অনুভব করলে, এটারও দরকার ছিল। ক্ষণকালের জন্যে পেনসিলটা রেখে তামাক টানতে লাগল।

এই অবকাশে নবীন কথা পাড়লে, "দাদা, শুতে যাবে না? অনেক রাত হয়েছে। বউরানী তোমার জন্যে হয়তো জেগে বসে আছেন।"

"জেগে বসে আছেন" কথাটা এক মুহূর্তে মধুসূদনের মনের ভিতরে গিয়ে লাগল। ঢেউয়ের উপর দিয়ে জাহাজ যখন টলমল করতে করতে চলেছে, একটি ছোটো ডাঙার পাখি উড়ে এসে যেন মাস্তলে বসল; রুক্ষ সমুদ্রের ভিতর ক্ষণকালের জন্যে মনে এনে দিলে শ্যামল দ্বীপের নিভৃত বনচ্ছায়ার ছবি। কিন্তু সে-কথায় মন দেবার সময় নয়, জাহাজ চালাতে হবে।

মধুসূদন আপন মনের এইটুকু চাঞ্চল্যে ভীত হল। তখনই সেটা দমন করে বললে, "বড়োবউকে শুতে যেতে বলো, আজ আমি বাইরে শোব।"

"তাঁকে নাহয় এখানে ডেকে দিই" বলে নবীন গুড়গুড়ির কলকেটাতে ফুঁ দিতে লাগল।

মধুসূদন হঠাৎ ঝেঁকে উঠে বলে উঠল, "না না।"

নবীন তাতেও না দমে বললে, "তিনি যে তোমার কাছে দরবার করবেন বলে বসে আছেন।"

রুক্ষস্বরে মধুসূদন বললে, "এখন দরবারের সময় নেই।"

"তোমার তো সময় নেই, দাদা, ওঁরও তো সময় কম।"

"কী, হয়েছে কী?"

"বিপ্রদাসবাবু আজ কলকাতায় এসেছেন খবর পাওয়া গেছে, তাই বউরানী কাল সকালে—"

"সকালে যেতে চান?"

"বেশিক্ষণের জন্যে না, একবার কেবল—"

মধুসূদন হাত ঝাঁকানি দিয়ে উঠে বললে, "তা যান-না, যান। বাস্‌, আর নয়, তুমি যাও।"

হুকুম আদায় করেই নবীন ঘর থেকে এক দৌড়। বাইরে আসতেই মধুসূদনের ডাক কানে এসে পৌঁছল, "নবীন।"

ভয় লাগল আবার বুঝি দাদা হুকুম ফিরিয়ে নেয়। ঘরে এসে দাঁড়াতেই মধুসূদন বললে, "বড়োবউ এখন কিছুদিন তাঁর দাদার ওখানে গিয়েই থাকবেন, তুমি তার জোগাড় করে দিয়ো।"

নবীনের ভয় লাগল, দাদার এই প্রস্তাবে তার মুখে পাছে একটুও উৎসাহ প্রকাশ পায়। এমনকি, সে একটু দ্বিধার ভাব দেখিয়ে মাথা চুলকোতে লাগল। বললে, "বউরানী গেলে বাড়িটা বড়ো খালি-খালি ঠেকবে।"

মধুসূদন কোনো উত্তর না করে গুড়গুড়ির নলটা নামিয়ে রেখে কাজে লেগে গেল। বুঝতে পারলে প্রলোভনের রাস্তা এখনো খোলা আছে—ওদিকে একেবারেই না।

নবীন আনন্দিত হয়ে চলে গেল। মধুসূদনের কাজ চলতে লাগল। কিন্তু কখন এই কাজের ধারার পাশ দিয়ে আর-একটা উলটো মানস-ধারা খুলে গেছে তা সে অনেকক্ষণ নিজেই বুঝতে পারে নি। এক সময়ে নীল পেনসিল প্রয়োজন শেষ না হতেই ছুটি নিল, গুড়গুড়ির নলটা উঠল মুখে। দিনের বেলায় মধুসূদনের মনটা কুমুর ভাবনা সম্বন্ধে যখন সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি নিয়েছিল, তখন আগেকার দিনের মতো নিজের 'পরে নিজের একাধিপত্য ফিরে পেয়ে মধুসূদন খুব আনন্দিত হয়েছিল। কিন্তু যত রাত হচ্ছে ততই সন্দেহ হতে লাগল

যে, শত্রু দুর্গ ছেড়ে পালায় নি। সুরঙ্গের ঘরে আছে গা-ঢাকা দিয়ে।

বৃষ্টি থেমে গেছে, কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ বাগানের কোণে এক প্রাচীন সিসু গাছের উপরে আকাশে উঠে আর্দ্র পৃথিবীকে বিহ্বল করে দিয়েছে। হাওয়াটা ঠাণ্ডা, মধুসূদনের দেহটা বিছানার ভিতরে একটা গরম কোমল স্পর্শের জন্যে দাবি জানাতে আরম্ভ করেছে। নীল পেনসিলটা চেপে ধরে খাতাপত্রের উপরে সে ঝুঁকে পড়ল। কিন্তু মনের গভীর আকাশে একটা কথা ক্ষীণ অথচ স্পষ্ট আওয়াজে বাজছে, "বউরানী হয়তো এতক্ষণ জেগে বসে আছেন।"

মধুসূদন পণ করেছিল, একটা বিশেষ কাজ আজ রাত্রের মধ্যেই শেষ করে রাখবে। সেটা কাল সকালের মধ্যে সারতে পারলে যে খুব বেশি অসুবিধা হত তা নয়। কিন্তু পণ রক্ষা করা ওর ব্যবসায়ের ধর্মনীতি। তার থেকে কোনো কারণে যদি ভ্রষ্ট হয় তবে নিজেকে ক্ষমা করতে পারে না। এতদিন ধর্মকে খুব কঠিনভাবেই রক্ষা করেছে। তার পুরস্কারও পেয়েছে যথেষ্ট। কিন্তু ইদানীং দিনের মধুসূদনের সঙ্গে রাত্রের মধুসূদনের সুরের কিছু কিছু তফাত ঘটে আসছে— এক বীণায় দুই তারের মতো। যে দৃঢ় পণ করে ডেস্কের উপর ও ঝুঁকে পড়ে বসেছিল—রাত্রি যখন গভীর হয়ে এল, সেই পণের কোন্ একটা ফাঁকের ভিতর দিয়ে একটা উক্তি ভ্রমরের মতো ভন্ ভন্ করতে শুরু করলে—"বউরানী হয়তো জেগে বসে আছেন।"

উঠে পড়ল। বাতি না নিভিয়ে খাতাপত্র যেমন ছিল তেমনি ভাবেই রেখে চলল শোবার ঘরের দিকে। অন্তঃপুরের আঙিনা-ঘেরা যে বারান্দা দিয়ে তেতালার ঘরে যেতে হয় সেই বারান্দায় রেলিঙের ধারে শ্যামাসুন্দরী মেজের উপর বসে। চাঁদ তখন মধ্য-আকাশে, তার আলো এসে তাকে

ঘিরেছে। তাকে দেখাচ্ছে যেন কোন্ এক গল্পের বইয়ের ছবির মতো; অর্থাৎ সে যেন প্রতিদিনের মানুষ নয়, অতিনিকটের অতিপরিচয়ের কঠোর আবরণ থেকে যেন একটা দূরত্বের মধ্যে বেরিয়ে এসেছে। সে জানত মধুসূদন এই পথ দিয়েই শোবার ঘরে যায়—সেই যাওয়ার দৃশ্যটা ওর কাছে অতি তীব্র বেদনার, সেই জন্যেই তার আকর্ষণটা এত প্রবল। কিন্তু শুধু হৃদয়টাকে ব্যর্থ বেদনায় বিদ্ধ করবার পাগলামিই যে এই প্রতীক্ষার মধ্যে আছে তা নয়, এর মধ্যে একটা প্রত্যাশাও আছে— যদি ক্ষণকালের মধ্যে একটা কিছু ঘটে যায়; অসম্ভব কখন সম্ভব হয়ে যায় এই আশায় পথের ধারে জেগে থাকা।

মধুসূদন ওর দিকে একবার কটাক্ষ করে উপরে চলে গেল। শ্যামাসুন্দরী নিজের ভাগ্যের উপর রাগ করে রেলিং শক্ত করে ধরে তার উপরে মাথা ঠুকতে লাগল।

শোবার ঘরে গিয়ে মধুসূদন দেখে যে, কুমু জেগে বসে নেই। ঘর অন্ধকার, নাবার ঘরের খোলা দরজা দিয়ে অল্প একটু আলো আসছে। মধুসূদন একবার ভাবল, ফিরে চলে যাই, কিন্তু পারল না। গ্যাসের আলোটা জ্বালিয়ে দিলে। কুমু বিছানার মধ্যে মুড়িসুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছে— আলো জ্বালাতেও ঘুম ভাঙল না। কুমুর এই আরামে ঘুমোনোর উপর ওর রাগ ধরল। অধৈর্যের সঙ্গে মশারি খুলে ধপ্ করে বিছানার উপর বসে পড়ল। খাটটা শব্দ করে কেঁপে উঠল।

কুমু চমকে উঠে বসল। আজ মধুসূদন আসবে না বলেই জানত। হঠাৎ তাকে দেখে মুখে এমন একটা ভাব এল যে তাই দেখে মধুসূদনের বুকের ভিতর দিয়ে যেন একটা শেল বিঁধল। মাথায় রক্ত চড়ে গেল, বলে উঠল, "আমাকে কোনোমতেই সইতে পারছ না, না?"

এমনতরো প্রশ্নের কী উত্তর দেবে কুমু তা ভেবেই পেলে না। সত্যিই,

হঠাৎ মধুসূদনকে দেখে ওর বুক কেঁপে উঠেছিল আতঙ্কে। তখন ওর মনটা সতর্ক ছিল না। যে-ভাবটাকে ও নিজের কাছেও সর্বদা চেপে রাখতে চায়, যার প্রবলতা নিজেও কুমু সম্পূর্ণ জানে না, সে তখন হঠাৎ আত্মপ্রকাশ করেছিল।

মধুসূদন চিবিয়ে চিবিয়ে বললে, "দাদার কাছে যাবার জন্যে তোমার দরবার ?"

কুমু এই মুহূর্তেই ওর পায়ে পড়তে প্রস্তুত হয়েছিল, কিন্তু ওর মুখে দাদার নাম শুনেই শক্ত হয়ে উঠল। বললে, "না।"

"তুমি যেতে চাও না ?"

"না, আমি চাই নে।"

"নবীনকে আমার কাছে দরবার করতে পাঠাও নি ?"

"না, পাঠাই নি।"

"দাদার কাছে যাবার ইচ্ছে তাকে তুমি জানাও নি ?"

"আমি তাঁকে বলেছিলুম, দাদাকে দেখতে আমি যাব না।"

"কেন ?"

"তা আমি বলতে পারি নে।"

"বলতে পার না ? আবার তোমার সেই নুরনগরি চাল ?"

"আমি যে নুরনগরেরই মেয়ে।"

"যাও, তাদের কাছেই যাও। যোগ্য নও তুমি এখানকার। অনুগ্রহ করেছিলেম, মর্যাদা বুঝলে না। এখন অনুতাপ করতে হবে।"

কুমু কাঠ হয়ে বসে রইল, কোনো উত্তর করলে না। কুমুর হাত ধরে অসহ্য একটা ঝাঁকানি দিয়ে মধুসূদন বললে, "মাপ চাইতেও জান না ?"

"কিসের জন্যে ?"

"তুমি যে আমার এই বিছানার উপরে শুতে পেরেছ তার জন্যে।"

কুমু তৎক্ষণাৎ বিছানা থেকে উঠে পাশের ঘরে চলে গেল।

মধুসূদন বাইরের ঘরে যাবার পথে দেখলে, শ্যামাসুন্দরী সেই বারান্দায় উপুড় হয়ে পড়ে। মধুসূদন পাশে এসে নিচু হয়ে তার হাত ধরে টেনে তোলবার চেষ্টা করে বললে, "কী করছ, শ্যামা ?" অমনি শ্যামা উঠে বসে মধুসূদনের দুই পা বুকে জড়িয়ে ধরলে, গদ্‌গদ কণ্ঠে বললে, "আমাকে মেরে ফেলো তুমি।"

মধুসূদন তাকে হাত ধরে তুলে দাঁড় করালে; বললে "ইস্‌, তোমার গা যে একেবারে ঠাণ্ডা হিম। চলো তোমাকে শুইয়ে দিয়ে আসি গে।" বলে তাকে নিজের শালের এক অংশে আবৃত করে ডান হাত দিয়ে সবলে চেপে ধরে শোবার ঘরে পৌঁছিয়ে দিয়ে এল। শ্যামা চুপি চুপি বললে, "একটু বসবে না ?"

মধুসূদন বললে, "কাজ আছে।"

রাতের বেলা কোথা থেকে ভূত চেপে এতক্ষণ মধুসূদনের কাজ নষ্ট করে দেবার যোগাড় করেছে— আর নয়। কুমুর কাছ থেকে যে-উপেক্ষা পেয়েছে তার ক্ষতিপূরণের ভাণ্ডার অন্য কোথাও জমা আছে এটুকু সে বুঝে নিলে। ভালোবাসার ভিতর দিয়ে মানুষ আপনার যে পরম মূল্য উপলব্ধি করে, আজ রাত্রে সেটা অনুভব করবার প্রয়োজন মধুসূদনের ছিল। শ্যামাসুন্দরী সমস্ত জীবনমন দিয়ে ওর জন্যে অপেক্ষা করে আছে, সেই আশ্বাসটুকু পেয়ে মধুসূদন আজ রাত্রে কাজের জোর পেলে, যে-অমর্যাদার কাঁটা ওর মনের মধ্যে বিঁধে আছে তার বেদনা অনেকটা কমিয়ে দিলে।

এদিকে রাত্রে কুমু যে-ধাক্কা পেলে তার মধ্যে ওর একটা সান্ত্বনা ছিল। যতবার মধুসূদন তাকে ভালোবাসা দেখিয়েছে, ততবারই কুমুর মনে একটা টানাটানি এসেছে; ভালোবাসার মূল্যেই এর পরিশোধ করা চাই। এই কর্তব্যবোধে ওকে অত্যন্ত অস্থির করেছে। এ-লড়াইয়ে কুমুর জেতবার

কোনো আশা ছিল না। কিন্তু পরাভবটা কুশ্রী, সেটাকে কেবলই চাপা দেবার জন্যে এতদিন কুমু প্রাণপণে চেষ্টা করেছে। কাল রাত্রে সেই চাপা-দেওয়া পরাভবটা এক মুহূর্তে সম্পূর্ণ ধরা পড়ে গেল। কুমুর অসতর্ক অবস্থায় মধুসূদন স্পষ্ট করে দেখতে পেয়েছে যে কুমুর সমস্ত প্রকৃতি মধুসূদনের প্রকৃতির বিরুদ্ধ; এইটে নিশ্চিত জানা হয়ে গেল সে ভালো, তার পরে পরস্পরের যা কর্তব্য সেটা অকপটভাবে করা সম্ভব হবে। মধুসূদন ওকে কামনা করে, সেইখানেই সমস্যা; ক্ষোভের সঙ্গে ওকে যে বর্জন করতে চায় সেইখানেই সত্য। সত্যই মধুসূদনের বিছানায় শোবার অধিকার ওর নেই। শুয়ে ও কেবলই ফাঁকি দিচ্ছে। এ-বাড়িতে ওর যে-পদ সেটা বিড়ম্বনা।

আজ রাত্রে এই একটা প্রশ্ন বারবার কুমুর মনে উঠেছে—কুমুকে নিয়ে মধুসূদনের কেন এত নির্বন্ধ? ও তো কথায় কথায় নুরনগরি চালের প্রসঙ্গ তুলে কুমুকে খোঁটা দেয়, তার মানে কুমুর সঙ্গে ওদের একেবারে ধাতের তফাত, জাতের তফাত, কিন্তু মধুসূদন কেন তবে ওকে ভালোবাসা জানায়? এ কি কখনো সত্য ভালোবাসা হতে পারে? কুমুর নিশ্চয় বিশ্বাস, আজ মধুসূদন যাই মনে করুক না কেন, কুমুকে দিয়ে কখনোই ওর মন ভরতে পারে না। যত শীঘ্র মধুসূদন তা বোঝে ততই সকল পক্ষের মঙ্গল।

নবীন কাল রাত্রে দাদার কাছ থেকে সম্মতি নিয়ে যত আনন্দ করে শুতে গেল, আজ সকালে তার আর বড়ো-কিছু বাকি রইল না। কাল রাত্রি তখন আড়াইটা। মধুসূদন কাজ শেষ করে তখনই নবীনকে ডেকে পাঠিয়েছিল। হুকুম এই যে, কুমুদিনীকে বিপ্রদাসের ওখানে পাঠিয়ে দেওয়া হবে, যতদিন মধুসূদন না আপনি ডেকে পাঠায় ততদিন ফিরে আসবার দরকার নেই। নবীন বুঝলে এটা নির্বাসনদণ্ড।

আঙিনা-ঘেরা চৌকো বারান্দার যে-অংশে কাল রাত্রে মধুসূদনের সঙ্গে

শ্যামার সাক্ষাৎ হয়েছিল, ঠিক তার বিপরীত দিকের বারান্দার সংলগ্ন নবীনের শোবার ঘর। তখন ওরা স্বামীস্ত্রী কুমুর সম্বন্ধেই আলোচনা করছিল। এমন সময় গলার শব্দ শুনে মোতির মা ঘরের দরজা খুলতেই জ্যোৎস্নার আলোতে মধুসূদনের সঙ্গে শ্যামার মিলনের ছবি দেখতে পেলে। বুঝতে পারলে কুমুর ভাগ্যের জালে এই রাত্রে নিঃশব্দে আর-একটা শক্ত গিঁঠ পড়ল।

নবীনকে মোতির মা বললে, "ঠিক এই সংকটের সময় কি দিদির চলে যাওয়া ভালো হচ্ছে?"

নবীন বললে, "এতদিন তো বউরানী ছিলেন না, কাণ্ডটা তো এতদূর কখনোই এগোয় নি। বউরানী আছেন বলেই এটা ঘটেছে।"

"কী বল তুমি।"

"বউরানী যে ঘুমন্ত ক্ষুধাকে জাগিয়েছেন তার অন্ন যোগাতে পারেন নি, তাই সে অনর্থপাত করতে বসেছে। আমি তো বলি এই সময়টা ওঁর দূরে থাকাই ভালো, তাতে আর কিছু না হোক অন্তত উনি শান্তিতে থাকতে পারবেন।"

"তবে এটা কি এমনি ভাবেই চলবে?"

"যে-আগুন নেবাবার কোনো উপায় নেই সেটাকে আপনি জ্বলে ছাই হওয়া পর্যন্ত তাকিয়ে দেখতে হবে।"

পরদিন সকালে হাবলু সমস্তক্ষণ কুমুর সঙ্গে সঙ্গে ফিরলে। গুরুমশায় যখন পড়ার জন্যে ওকে বাইরে ডেকে পাঠালে, ও কুমুর মুখের দিকে চাইলে। কুমু যদি যেতে বলত তো ও যেত, কিন্তু কুমু বেহারাকে বলে দিলে আজ হাবলুর ছুটি।

বধূ কিছুদিনের জন্যে বাপের বাড়ি যাচ্ছে সেই সুরটি আজ কুমুর যাত্রার সময় লাগল না। এ-বাড়ি যেন ওকে আজ হারাতে বসেছে। যে-পাখিকে

খাঁচায় বন্দী করা হয়েছিল, আজ যেন দরজা একটু ফাঁক করতেই সে উড়ে পড়ল, আর যেন এ-খাঁচায় সে ঢুকবে না।

নবীন বললে, "বউরানী, ফিরে আসতে দেরি কোরো না, এই কথাটা সব মন দিয়ে বলতে পারলে বেঁচে যেতুম, কিন্তু মুখ দিয়ে বেরোল না। যাদের কাছে তোমার যথার্থ সম্মান সেইখানেই তুমি থাকো গে। কোনো কালে নবীনকে যদি কোনো কারণে দরকার হয় স্মরণ কোরো।"

মোতির মা নিজের হাতে তৈরি আমসত্ত্ব আচার প্রভৃতি একটা হাঁড়িতে সাজিয়ে পালকিতে তুলে দিলে। বিশেষ কিছু বললে না। কিন্তু মনে তার বেশ একটু আপত্তি ছিল। যতদিন বাধা ছিল স্থূল, যতদিন মধুসূদন কুমুকে বাহির থেকে অপমান করেছে, মোতির মার সমস্ত মন ততদিন ছিল কুমুর পক্ষে ; কিন্তু যে-বাধা সূক্ষ্ম, যা মর্মগত, বিশ্লেষণ করে যার সংজ্ঞা নির্ণয় করা কঠিন, তারই শক্তি যে প্রবলতম, এ-কথাটা মোতির মার কাছে সহজ নয়। স্বামী যে-মুহূর্তে প্রসন্ন হবে সেই মুহূর্তে অবিলম্বে স্ত্রী সেটাকে সৌভাগ্য বলে গণ্য করবে, মোতির মা এইটেকেই স্বাভাবিক বলে জানে। এর ব্যতিক্রমকে সে বাড়াবাড়ি মনে করে। এমন কি, এখনো যে বউরানী সম্বন্ধে নবীনের দরদ আছে, এটাতে তার রাগ হয়। কুমুর প্রকৃতিগত বিতৃষ্ণা যে একান্ত অকৃত্রিম, এটা যে অহংকার নয়, এমনকি এইটে নিয়ে যে কুমুর নিজের সঙ্গে নিজের দুর্জয় বিরোধ, সাধারণত মেয়েদের পক্ষে এটা স্বীকার করে নেওয়া কঠিন। যে চীনে মেয়ে প্রথার অনুসরণে নিজের পা বিকৃত করতে আপত্তি করে নি, সে যদি শোনে জগতে এমন মেয়ে আছে যে আপনার এই পদসংকোচ-পীড়নকে স্বীকার করা অপমানজনক বলে মনে করে, তবে নিশ্চয় সেই কুণ্ঠাকে সে হেসে উড়িয়ে দেয়, নিশ্চয় বলে ওটা ন্যাকামি। যেটা নিগূঢ়ভাবে স্বাভাবিক সেইটেকেই সে জানে অস্বাভাবিক। মোতির মা একদিন কুমুর দুঃখে সব-চেয়ে বেশি দুঃখ পেয়েছিল, বোধ করি

সেই জন্যই আজ তার মন এত কঠিন হতে আরম্ভ করেছে। প্রতিকূল ভাগ্য যখন বরদান করতে আসে তখন তার পায়ে মাথা ঠেকিয়ে যে-মেয়ে অবিলম্বে সে-বর গ্রহণ করতে না পারে, তাকে মমতা করা মোতির মার পক্ষে অসম্ভব— এমনকি মার্জনা করাও।

৪৬

বাড়ির সামনে আসতেই পালকির দরজা একটু ফাঁক করে কুমু উপরের দিকে চেয়ে দেখলে। রোজ এই সময়টা বিপ্রদাস রাস্তার ধারের বারান্দায় বসে খবরের কাগজ পড়ত, আজ দেখলে সেখানে কেউ নেই। আজ যে কুমু এখানে আসবে সে-খবর এ-বাড়িতে পাঠানো হয় ন। পালকির সঙ্গে মহারাজার তকমা-পরা দরোয়ানকে দেখে এ-বাড়ির দরোয়ান ব্যস্ত হয়ে উঠল, বুঝলে যে দিদিঠাকরুন এসেছে। বার-বাড়ির আঙিনা পার হয়ে অন্তঃপুরের দিকে পালকি চলেছিল। কুমু থামিয়ে দ্রুতপদে বাইরের সিঁড়ি বেয়ে উপরের দিকে উঠে চলল। তার ইচ্ছে তাকে আর-কেউ দেখবার আগে সব-প্রথমেই দাদার সঙ্গে তার দেখা হয়। নিশ্চয় সে জানত বাইরের আরাম-কামরাতেই রোগীর থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে। ওখানে জানলা থেকে বাগানের কৃষ্ণচূড়া, কাঞ্চন ও অশথ গাছের একটি কুঞ্জসভা দেখতে পাওয়া যায়। সকালের রোদ্দুর ডালপালার ভিতর দিয়ে এই ঘরেই প্রথম দেখা দেয়। এই ঘরটিই বিপ্রদাসের পছন্দ।

কুমু সিঁড়ির কাছে আসতেই সর্বাগ্রে টম কুকুর ছুটে এসে ওর গায়ের 'পরে ঝাঁপিয়ে পড়ে চেঁচিয়ে লেজ ঝাপটিয়ে অস্থির করে দিলে। কুমুর সঙ্গে সঙ্গেই লাফাতে লাফাতে চেঁচাতে চেঁচাতে টম চলল। বিপ্রদাস একটা মুড়ে-তোলা কৌচের পিঠে হেলান দিয়ে আধ-শোওয়া অবস্থায়, পায়ের

উপর একটা ছিটের বালাপোশ টানা ; একখানা বই নিয়ে ডান হাতটা বিছানার উপর এলিয়ে আছে, যেন ক্লান্ত হয়ে একটু আগে পড়া বন্ধ করেছে। চায়ের পেয়ালা আর ভুক্তাবশিষ্ট রুটি সমেত একটা পিরিচ পাশে মেজের উপরে পড়ে। শিয়রের কাছে দেয়ালের গায়ের শেলফে বইগুলো উলট-পালট এলোমেলো। রাত্রে যে-ল্যাম্প জ্বলেছিল সেটা ধোঁয়ায় দাগি অবস্থায় ঘরের কোণে এখনো পড়ে আছে।

কুমু বিপ্রদাসের মুখের দিকে চেয়ে চমকে উঠল। ওর এমন বিবর্ণ রুগ্ন মূর্তি কখনো দেখে নি। সেই বিপ্রদাসের সঙ্গে এই বিপ্রদাসের যেন কত যুগের তফাত। দাদার পায়ের তলায় মাথা রেখে কুমু কাঁদতে লাগল।

"কুমু যে, এসেছিস ? আয় এইখানে আয়।" বলে বিপ্রদাস তাকে পাশে টেনে নিয়ে এল। যদিও চিঠিতে বিপ্রদাস তাকে আসতে একরকম বারণ করেছিল তবু তার মনে আশা ছিল যে কুমু আসবে। আসতে পেরেছে দেখে ওর মনে হল, তবে হয়তো কোনো বাধা নেই— তবে কুমুর পক্ষে তার ঘরকন্না সহজ হয়ে গেছে। এদের পক্ষ থেকেই কুমুকে আনবার জন্যে প্রস্তাব, পালকি ও লোক পাঠানোই নিয়ম— কিন্তু তা না হওয়া সত্ত্বেও কুমু এল এটাতে ওর যতটা স্বাধীনতা কল্পনা করে নিলে ততটা মধুসূদনের ঘরে বিপ্রদাস একেবারেই প্রত্যাশা করে নি।

কুমু তার দুই হাত দিয়ে বিপ্রদাসের আলুথালু চুল একটু পরিপাটি করতে করতে বললে, "দাদা, তোমার এ কী চেহারা হয়েছে।"

"আমার চেহারা ভালো হবার মতো ইদানীং তো কোনো ঘটনা ঘটে নি— কিন্তু তোর এ কী রকম শ্রী ! ফ্যাকাশে হয়ে গেছিস যে।"

ইতিমধ্যে খবর পেয়ে ক্ষেমা পিসি এসে উপস্থিত। সেই সঙ্গে দরজার কাছে একদল দাসী-চাকর ভিড় করে জমা হল। ক্ষেমাপিসিকে প্রণাম করতেই পিসি ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে কপালে চুমু খেলে। দাসদাসীরা

এসে প্রণাম করলে। সকলের সঙ্গে কুশলসম্ভাষণ হয়ে গেলে পর কুমু বললে, "পিসি, দাদার চেহারা বড়ো খারাপ হয়ে গেছে।"

"সাধে হয়েছে! তোমার হাতের সেবা না পেলে ওর দেহ যে কিছুতেই ভালো হতে চায় না। কতদিনের অভ্যেস।"

বিপ্রদাস বললে, " পসি, কুমুকে খেতে বলবে না?"

"খাবে না তো কী। সেও কি বলতে হবে? ওদের পালকির বেহারা-দরোয়ান সবাইকে বসিয়ে এসেছি, তাদের খাইয়ে দিয়ে আসি গে। তোমরা দুজনে এখন গল্প করো, আমি চললুম।"

বিপ্রদাস ক্ষেমাপিসিকে ইশারা করে কাছে ডেকে কানে কানে কিছু বলে দিলে। কুমু বুঝলে, ওদের বাড়ির লোকদের কী ভাবে বিদায় করতে হবে তারই পরামর্শ। এই পরামর্শের মধ্যে কুমু আজ অপর পক্ষ হয়ে উঠেছে। ওর কোনো মত নেই। এটা ওর একটুও ভালো লাগল না। কুমুও তার শোধ তুলতে বসল। এ-বাড়িতে তার চিরকালের স্থান ফিরে দখলের কাজ শুরু করে দিলে।

প্রথমত, দাদার খানসামা গোকুলকে ফিস ফিস করে কী একটা হুকুম করলে, তার পরে লাগল নিজের মনের মতো করে ঘর গোছাতে। বাইরের বারান্দায় সরিয়ে দিলে পিরিচ, পেয়ালা, ল্যাম্প, খালি সোডা-ওআটারের বোতল, একখানা বেত-ছেঁড়া চৌকি, গোটাকতক ময়লা তোয়ালে এবং গেঞ্জি। শেলফের উপর বইগুলো ঠিকমতো সাজালে, দাদার হাতের কাছাকাছি একখানি টিপাই সরিয়ে এনে তার উপরে গুছিয়ে রাখলে পড়বার বই, কলমদান, ব্লটিংপ্যাড, খাবার জলের কাঁচের সোরাই আর গেলাস, ছোটো একটি আয়না এবং চিরুনি-ব্রুশ।

ইতিমধ্যে গোকুল একটা পিতলের জগে গরম জল, একটা পিতলের চিলেমচি, আর সাফ তোয়ালে বেতের মোড়ার উপর এনে রাখলে।

কিছুমাত্র সম্মতির অপেক্ষা না রেখে কুমু গরম জলে তোয়ালে ভিজিয়ে বিপ্রদাসের মুখ-হাত মুছিয়ে দিয়ে তার চুল আঁচড়িয়ে দিলে, বিপ্রদাস শিশুর মতো চুপ করে সহ্য করল। কখন কী ওষুধ খাওয়াতে হবে এবং পথ্যের নিয়ম কী সমস্ত জেনে নিয়ে এমন ভাবে গুছিয়ে বসল যেন ওর জীবনে আর কোথাও কোনো দায়িত্ব নেই।

বিপ্রদাস মনে মনে ভাবতে লাগল এর অর্থটা কী? ভেবেছিল, দেখা করতে এসেছে আবার চলে যাবে, কিন্তু সে-রকম ভাব তো নয়। শ্বশুর-বাড়িতে কুমুর সম্বন্ধটা কী রকম দাঁড়িয়েছে সেটা বিপ্রদাস জানতে চায়, কিন্তু স্পষ্ট করে প্রশ্ন করতে সংকোচ বোধ করে। কুমুর নিজের মুখ থেকেই শুনবে এই আশা করে রইল। কেবল আস্তে আস্তে একবার জিজ্ঞাসা করলে, "আজ তোকে কখন যেতে হবে?"

কুমু বললে, "আজ যেতে হবে না।"

বিপ্রদাস বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "এতে তোর শ্বশুরবাড়িতে কোনো আপত্তি নেই?"

"না, আমার স্বামীর সম্মতি আছে।"

বিপ্রদাস চুপ করে রইল। কুমু ঘরের কোণের টেবিলটাতে একটা চাদর বিছিয়ে দিয়ে তার উপর ওষুধের শিশি বোতল প্রভৃতি গুছিয়ে রাখতে লাগল। খানিকক্ষণ পরে বিপ্রদাস জিজ্ঞাসা করলে, "তোকে কি তবে কাল যেতে হবে?"

"না, এখন আমি কিছুদিন তোমার কাছে থাকব।"

টম কুকুরটা কৌচের নীচে শান্ত হয়ে নিদ্রার সাধনায় নিযুক্ত ছিল, কুমু তাকে আদর করে তার প্রীতি-উচ্ছ্বাসকে অসংযত করে তুললে। সে লাফিয়ে উঠে কুমুর কোলের উপরে দুই পা তুলে কলভাষায় উচ্চস্বরে আলাপ আরম্ভ করে দিলে। বিপ্রদাস বুঝতে পারলে কুমু

হঠাৎ এই গোলমালটা সৃষ্টি করে তার পিছনে একটু আড়াল করলে আপনাকে।

খানিক বাদে কুকুরের সঙ্গে খেলা বন্ধ করে কুমু মুখ তুলে বললে, "দাদা, তোমার বার্লি খাবার সময় হয়েছে, এনে দিই।"

"না, সময় হয় নি" বলে কুমুকে ইশারা করে বিছানার পাশের চৌকিতে বসালে। আপনার হাতে তার হাত তুলে নিয়ে বললে, "কুমু, আমার কাছে খুলে বল্, কী রকম চলছে তোদের।"

তখনই কুমু কি বলতে পারলে না। মাথা নিচু করে বসে রইল, দেখতে দেখতে মুখ হল লাল, শিশুকালের মতো করে বিপ্রদাসের প্রশস্ত বুকের উপর মুখ রেখে কেঁদে উঠল; বললে, "দাদা, আমি সবই ভুল বুঝেছি, আমি কিছুই জানতুম না।"

বিপ্রদাস আস্তে আস্তে কুমুর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। খানিক বাদে বললে, "আমি তোকে ঠিকমতো শিক্ষা দিতে পারি নি। মা থাকলে তোকে তোর শ্বশুরবাড়ির জন্যে প্রস্তুত করে দিতে পারতেন।"

কুমু বললে, "আমি বরাবর কেবল তোমাদেরই জানি, এখান থেকে অন্য জায়গা যে এত বেশি তফাত তা আমি মনে করতে পারতুম না। ছেলেবেলা থেকে আমি যা-কিছু কল্পনা করেছি সব তোমাদেরই ছাঁচে। তাই মনে একটুও ভয় হয় নি। মাকে অনেক সময় বাবা কষ্ট দিয়েছেন জানি, কিন্তু সে ছিল দুরন্তপনা, তার আঘাত বাইরে, ভিতরে নয়। এখানে সমস্তটাই অন্তরে অন্তরে আমার যেন অপমান।"

বিপ্রদাস কোনো কথা না বলে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চুপ করে বসে ভাবতে লাগল। মধুসূদন যে ওদের থেকে সম্পূর্ণ আর-এক জগতের মানুষ তা সেই বিবাহ-অনুষ্ঠানের আরম্ভ থেকেই বুঝতে পেরেছে। তারই বিষম উদ্বেগে ওর শরীর যেন কোনোমতেই সুস্থ হয়ে উঠছে না। এই

দিঙ্‌নাগের স্থূলহস্তাবলেপ থেকে কুমুকে উদ্ধার করবার তো কোনো উপায় নেই। সকলের চেয়ে মুশকিল এই যে, এই মানুষের কাছে ঋণে ওর সমস্ত সম্পত্তি বাঁধা। এই অপমানিত সম্বন্ধের ধাক্কা যে কুমুকেও লাগছে। এতদিন রোগশয্যায় শুয়ে শুয়ে বিপ্রদাস কেবলই ভেবেছে মধুসূদনের এই ঋণের বন্ধন থেকে কেমন করে সে নিষ্কৃতি পাবে। ওর কলকাতায় আসবার ইচ্ছে ছিল না, পাছে কুমুর শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে ওদের সহজ ব্যবহার অসম্ভব হয়। কুমুর উপর ওর যে স্বাভাবিক স্নেহের অধিকার আছে, পাছে তা পদে পদে লাঞ্ছিত হতে থাকে, তাই ঠিক করেছিল, নুরনগরেই বাস করবে। কলকাতায় আসতে বাধ্য হয়েছে অন্য কোনো মহাজনের কাছ থেকে ধার নেবার ব্যবস্থা করবে বলে। জানে যে এটা অত্যন্ত দুঃসাধ্য, তাই এর দুশ্চিন্তার বোঝা ওর বুকের উপর চেপে বসে আছে।

খানিক বাদে কুমু বিপ্রদাসের থেকে অন্যদিকে ঘাড় একটু বেঁকিয়ে বললে, "আচ্ছা দাদা, স্বামীর 'পরে কোনোমতে মন প্রসন্ন করতে পারছি নে, এটা কি আমার পাপ?"

"কুমু, তুই তো জানিস, পাপপুণ্য সম্বন্ধে আমার মতামত শাস্ত্রের সঙ্গে মেলে না।"

অন্যমনস্কভাবে কুমু একটা ছবিওআলা ইংরেজি মাসিক পত্রের পাতা ওলটাতে লাগল। বিপ্রদাস বললে, "ভিন্ন ভিন্ন মানুষের জীবন তার ঘটনায় ও অবস্থায় এতই ভিন্ন হতে পারে যে, ভালোমন্দর সাধারণ নিয়ম অত্যন্ত পাকা করে বেঁধে দিলে অনেক সময়ে সেটা নিয়মই হয়, ধর্ম হয় না।"

কুমু মাসিক পত্রটার দিকে চোখ নিচু করে বললে, "যেমন মীরাবাই-এর জীবন।"

নিজের মধ্যে কর্তব্য-অকর্তব্যের দ্বন্দ্ব যখনই কঠিন হয়ে উঠেছে, কুমু

তখনই ভেবেছে মীরাবাইএর কথা। একান্ত মনে ইচ্ছা করেছে কেউ ওকে মীরাবাইএর আদর্শটা ভালো করে বুঝিয়ে দেয়।

কুমু একটু চেষ্টা করে সংকোচ কাটিয়ে বলতে লাগল, "মীরাবাই আপনার যথার্থ স্বামীকে অন্তরের মধ্যে পেয়েছিলেন বলেই সমাজের স্বামীকে মন থেকে ছেড়ে দিতে পেরেছিলেন, কিন্তু সংসারকে ছাড়বার সেই বড়ো অধিকার কি আমার আছে?"

বিপ্রদাস বললে, "কুমু, তোর ঠাকুরকে তুই তো সমস্ত মন দিয়েই পেয়েছিস।"

"এক সময়ে তাই মনে করেছিলুম। কিন্তু যখন সংকটে পড়লুম তখন দেখি, প্রাণ আমার কেমন শুকিয়ে গেছে, এত চেষ্টা করছি কিন্তু কিছুতে তাঁকে যেন আমার কাছে সত্য করে তুলতে পারছি নে। আমার সব চেয়ে দুঃখ সেই।"

"কুমু, মনের মধ্যে জোয়ার-ভাঁটা খেলে। কিছু ভয় করিস নে; রাত্তির মাঝে মাঝে আসে, দিন তা বলে তো মরে না। যা পেয়েছিস তোর প্রাণের সঙ্গে তা এক হয়ে গেছে।"

"সেই আশীর্বাদ করো, তাঁকে যেন না হারাই। নির্দয় তিনি দুঃখ দেন, নিজেকে দেবেন বলেই। দাদা, আমার জন্যে ভাবিয়ে আমি তোমাকে ক্লান্ত করছি।"

"কুমু, তোর শিশুকাল থেকে তোর জন্যে ভাবা যে আমার অভ্যেস। আজ যদি তোর কথা জানা বন্ধ হয়ে যায়, তোর জন্যে ভাবতে না পাই, তা হলে শূন্য ঠেকে। সেই শূন্যতা হাতড়াতে গিয়েই তো মন ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।"

কুমু বিপ্রদাসের পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললে, "আমার জন্যে তুমি কিন্তু কিছু ভেবো না, দাদা। আমাকে যিনি রক্ষা করবেন তিনি ভিতরেই আছেন, আমার বিপদ নেই।"

"আচ্ছা, থাক্ ও-সব কথা। তোকে যেমন গান শেখাতুম, ইচ্ছে করছে তেমনি করে আজ তোকে শেখাই।"

"ভাগ্যি শিখিয়েছিলে দাদা, ওতেই আমাকে বাঁচায়। কিন্তু আজ নয়, তুমি আগে একটু জোর পাও। আজ আমি বরঞ্চ তোমাকে একটা গান শোনাই।"

দাদার শিয়রের কাছে বসে কুমু আস্তে আস্তে গাইতে লাগল,

"পিয়া ঘর আয়ে, সোহী পীতম পিয় পারে রে।
মীরাকে প্রভু গিরিধর নাগর,
চরণকমল বলিহার রে।"

বিপ্রদাস চোখ বুজে শুনতে লাগল। গাইতে গাইতে কুমুর দুই চক্ষু ভরে উঠল এক অপরূপ দর্শনে। ভিতরের আকাশ আলো হয়ে উঠল। প্রিয়তম ঘরে এসেছেন, চরণকমল বুকের মধ্যে ছুঁতে পাচ্ছে। অত্যন্ত সত্য হয়ে উঠল অন্তরলোক, যেখানে মিলন ঘটে। গান গাইতে গাইতে ও সেইখানে পৌঁচেছে। "চরণকমল বলিহার রে"—সমস্ত জীবন ভরে দিলে সেই চরণকমল, অন্ত নেই তার—সংসারে দুঃখ-অপমানের জায়গা রইল কোথায়! "পিয়া ঘর আয়ে" তার বেশি আর কী চাই। এই গান কোনোদিন যদি শেষ না নয় তা হলে তো চিরকালের মতো রক্ষা পেয়ে গেল কুমু।

কিছু রুটি-টোস্ট আর এক পেয়ালা বার্লি গোকুল টিপাইএর উপর রেখে দিয়ে গেল। কুমু গান থামিয়ে বললে, "দাদা, কিছুদিন আগে মনে-মনে গুরু খুঁজছিলুম, আমার দরকার কী? তুমি যে আমাকে গানের মন্ত্র দিয়েছ।"

"কুমু, আমাকে লজ্জা দিস নে। আমার মতো গুরু রাস্তায় ঘাটে মেলে, তারা অন্যকে যে-মন্ত্র দেয় নিজে তার মানেই জানে না। কুমু, কতদিন এখানে থাকতে পারবি ঠিক করে বল্ দেখি।"

"যতদিন না ডাক পড়ে।"

"তুই এখানে আসতে চেয়েছিলি ?"

"না, আমি চাই নি।"

"এর মানে কী ?"

"মানের কথা ভেবে লাভ নেই দাদা। চেষ্টা করলেও বুঝতে পারব না। তোমার কাছে আসতে পেরেছি এই যথেষ্ট। যতদিন থাকতে পারি সেই ভালো। দাদা, তোমার খাওয়া হচ্ছে না, খেয়ে নাও।"

চাকর এসে খবর দিলে মুখুজ্যেমশায় এসেছেন। বিপ্রদাস একটু যেন ব্যস্ত হয়ে উঠে বললে, "ডেকে দাও।"

৪৭

কালু ঘরে ঢুকতেই কুমু তাকে প্রণাম করলে।

কালু বললে, "ছোটোখুকী, এসেছ ? এইবার দাদার সেরে উঠতে দেরি হবে না।"

কুমুর চোখ ছলছল করে উঠল। অশ্রু সামলে নিয়ে বললে, "দাদা, তোমার বার্লিতে নেবুর রস দেবে না ?"

বিপ্রদাস উদাসীন ভাবে হাত ওলটালে, অর্থাৎ না হলেই বা ক্ষতি কী। কুমু জানে, বিপ্রদাস বার্লি খেতে ভালোবাসে না, তাই ও যখনই দাদাকে বার্লি খাইয়েছে বার্লিতে নেবুর রস এবং অল্প একটু গোলাপজল মিশিয়ে বরফ দিয়ে শরবতের মতো বানিয়ে দিত। সে আয়োজন আজ নেই, তবু বিপ্রদাস আপন ইচ্ছে কাউকে জানায়ও নি, যা পেয়েছে তাই বিতৃষ্ণার সঙ্গে খেয়েছে।

বার্লি ঠিকমতো তৈরি করে আনবার জন্যে কুমু চলে গেল।

বিপ্রদাস উদ্বিগ্নমুখে জিজ্ঞাসা করলে, "কালুদা, খবর কী বলো।"

"তোমার একলার সইয়ে টাকা ধার দিতে কেউ রাজি হয় না, সুবোধের সই চায়। মাড়োয়ারি ধনীদের কেউ কেউ দিতে পারে, কিন্তু সেটা নিতান্ত বাজিখেলার মতো করে—অত্যন্ত বেশি সুদে চায়, সে আমাদের পোষাবে না।"

"কালুদা, সুবোধকে তার করতে হবে আসবার জন্যে। আর দেরি করলে তো চলবে না।"

"আমারও ভালো ঠেকছে না। সেবারে তোমার সেই আংটি-বেচা টাকা নিয়ে যখন মূল দেনার এক অংশ শোধ করতে গেলুম, মধুসূদন নিতে রাজিই হল না; তখনই বুঝলুম সুবিধে নয়। নিজের মর্জিমতো একদিন হঠাৎ কখন ফাঁস এঁটে ধরবে।"

বিপ্রদাস চুপ করে ভাবতে লাগল।

কালু বললে, "দাদা, ছোটোখুকী যে হঠাৎ আজ সকালে চলে এল, রাগারাগি করে আসে নি তো? মধুসূদনকে চটাবার মতো অবস্থা আমাদের নয়, এটা মনে রাখতে হবে।"

"কুমু বলছে ওর স্বামীর সম্মতি পেয়েছে।"

"সম্মতিটার চেহারাটা কী রকম না জানলে মন নিশ্চিন্ত হচ্ছে না। কত সাবধানে ওর সঙ্গে ব্যবহার করি সে আর তোমাকে কী বলব দাদা। রাগে সর্ব অঙ্গ যখন জলছে তখনও ঠাণ্ডা হয়ে সব সয়েছি, গৌরীশংকরের পাহাড়টার মতো, দুপুর-রোদ্দুরেও তার বরফ গলে না। একে মহাজন তাতে ভগ্নীপতি, একে সামলে চলা কি সোজা কথা!"

বিপ্রদাস কোনো জবাব না করে চুপ করে ভাবতে লাগল।

কুমু এল বার্লি নিয়ে। বিপ্রদাসের মুখের কাছে পেয়ালা ধরে বললে, "দাদা, খেয়ে নাও।"

বিপ্রদাস তার ভাবনা থেকে হঠাৎ চমকে উঠল। কুমু বুঝতে পারলে, গভীর একটা উদ্বেগের মধ্যে দাদা এতক্ষণ ডুবে ছিল।

কালু যখন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল কুমু তার পিছন পিছন গিয়ে বারান্দায় ওকে ধরে বললে, "কালুদা, আমাকে সব কথা বলতে হবে।"

"কী কথা বলতে হবে, দিদি ?"

"তোমাদের কী একটা নিয়ে ভাবনা চলছে।"

"বিষয় আছে ভাবনা নেই, সংসারে এও কি কখনো সম্ভব হয় খুকী ? ও যে কাঁটাগাছের ফল, খিদের চোটে পেড়ে খেতেও হয়, পাড়তে গিয়ে সর্বাঙ্গ ছড়েও যায়।"

"সে-সব কথা পরে হবে, আমাকে বলো কী হয়েছে।"

"বিষয়কর্মের কথা মেয়েদের বলতে নিষেধ।"

"আমি নিশ্চয় জানি তোমাদের কী নিয়ে কথা হচ্ছে। বলব ?"

"আচ্ছা, বলো।"

"আমার স্বামীর কাছে দাদার ধার আছে, সেই নিয়ে।"

কোনো জবাব না দিয়ে কালু তার বড়ো বড়ো দুই চোখ সকৌতুক বিস্ময়হাস্যে বিস্ফারিত করে কুমুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

"আমাকে বলতেই হবে, ঠিক বলেছি কি না।"

"দাদারই বোন তো, কথা না বলতেই কথা বুঝে নেয়।"

বিয়ের পরে প্রথম যেদিন বিপ্রদাসের মহাজন বলে মধুসূদন আস্ফালন করে শাসিয়ে কথা বলেছিল, সেইদিন থেকেই কুমু বুঝেছিল দাদার সঙ্গে স্বামীর সম্বন্ধের অগৌরব। প্রতিদিনই একান্তমনে ইচ্ছে করেছিল, এটা যেন ঘুচে যায়। বিপ্রদাসের মনে এর অসম্মান যে বিঁধে আছে তাতে কুমুর সন্দেহ ছিল না। সেদিন নবীন যেই বিপ্রদাসের চিঠির ব্যাখ্যা করলে অমনি কুমুর মনে এল, সমস্তর মূলে আছে এই দেনাপাওনার

সম্বন্ধ। দাদার শরীর কেন যে এত ক্লান্ত, কোন্ কাজের বিশেষ তাগিদে দাদা কলকাতায় চলে এসেছে, কুমু সমস্তই স্পষ্ট বুঝতে পারলে।

"কালুদা, আমার কাছে লুকিয়ো না, দাদা টাকা ধার করতে এসেছে।"

"তা, ধার করেই তো ধার শুধতে হবে ; টাকা তো আকাশ থেকে পড়ে না। কুটুম্বদের খাতক হয়ে থাকাটা তো ভালো নয়।"

"সে তো ঠিক কথা, তা টাকার জোগাড় করতে পেরেছ ?"

"ঘুরে ঘেরে দেখছি ; হয়ে যাবে, ভয় কী।"

"না, আমি জানি, সুবিধে করতে পার নি।"

"আচ্ছা, ছোটোখুকী, সবই যদি জান, আমাকে জিজ্ঞাসা করা কেন ? ছেলেবেলায় একদিন আমার গোঁফ টেনে ধরে জিজ্ঞাসা করেছিলে, গোঁফ হল কেমন করে ? বলেছিলুম, সময় বুঝে গোঁফের বীজ বুনেছিলুম বলে। তাতেই প্রশ্নটার তখনই নিষ্পত্তি হয়ে গেল। এখন হলে জবাব দেবার জন্যে ডাক্তার ডাকতে হত। সব কথাই যে তোমাকে স্পষ্ট করে জানাতে হবে সংসারের এমন নিয়ম নয়।"

"আমি তোমাকে বলে রাখছি, কালুদা, দাদার সম্বন্ধে সব কথাই আমাকে জানতে হবে।"

"কী করে দাদার গোঁফ উঠল, তাও ?"

"দেখো, অমন করে কথা চাপা দিতে পারবে না। আমি দাদার মুখ দেখেই বুঝেছি, টাকার সুবিধে করতে পার নি।"

"নাই যদি পেরে থাকি, সেটা জেনে তোমার লাভ হবে কী ?"

"সে আমি বলতে পারি নে, কিন্তু আমাকে জানতেই হবে। টাকা ধার পাও নি তুমি ?"

"না, পাই নি।"

"সহজে পাবে না ?"

"পাব নিশ্চয়ই, কিন্তু সহজে নয়; তা দিদি, তোমার কথার জবাব দেওয়ার চেষ্টা ছেড়ে পাবার চেষ্টায় বেরোলে কাজ হয়তো কিছু এগোতে পারে। আমি চললুম।"

খানিকটা গিয়েই আবার ফিরে এসে কালু বললে, "খুকী, এখানে যে তুমি আজ চলে এলে, তার মধ্যে তো কোনো কাঁটাখোঁচা নেই? ঠিক সত্যি করে বলো।"

"আছে কি না তা আমি খুব স্পষ্ট করে জানি নে।"

"স্বামীর সম্মতি পেয়েছ?"

"না-চাইতেই তিনি সম্মতি দিয়েছেন।"

"রাগ করে?"

"তাও আমি ঠিক জানি নে; বলেছেন ডেকে পাঠাবার আগে আমার যাবার দরকার নেই।"

"সে কোনো কাজের কথা নয়, তার আগেই যেয়ো, নিজে থেকেই যেয়ো।"

"গেলে হুকুম মানা হবে না।"

"আচ্ছা, সে আমি দেখব।"

দাদা আজ এই যে বিষম বিপদে পড়েছে, এর সমস্ত অপরাধ কুমুর, এ-কথা না মনে করে কুমু থাকতে পারল না। নিজেকে মারতে ইচ্ছে করে, খুব কঠিন মার। শুনেছে এমন সন্ন্যাসী আছে যারা কণ্টকশয্যায় শুয়ে থাকে, ও সেইরকম করে শুতে রাজি, যদি তাতে কোনো ফল পায়। কোনো যোগী, কোনো সিদ্ধপুরুষ যদি ওকে রাস্তা দেখিয়ে দেয় তা হলে চিরদিন তার কাছে বিকিয়ে থাকতে পারে। নিশ্চয়ই তেমন কেউ আছে, কিন্তু কোথায় তাকে পাওয়া যায়। যদি মেয়েমানুষ না হত, তা হলে যা হয় একটা কিছু উপায় সে করতই। কিন্তু মেজদাদা কী করছেন।

একলা দাদার ঘাড়ে সমস্ত বোঝা চাপিয়ে দিয়ে কোন্ প্রাণে ইংলণ্ডে বসে আছেন ?

কুমু ঘরে ঢুকে দেখে, বিপ্রদাস কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে চুপ করে বিছানায় পড়ে আছে। এমন করলে শরীর কি সারতে পারে ! বিরুদ্ধ ভাগ্যের দুয়ারে মাথা কুটে মরতে ইচ্ছে করে।

দাদার শিয়রের কাছে বসে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে কুমু বললে, 'মেজদাদা কবে আসবেন ?"

"তা তো বলতে পারি নে।"

"তাঁকে আসতে লেখো না।"

"কেন বল্ দেখি !"

"সংসারের সমস্ত দায় একলা তোমারই ঘাড়ে, এ তুমি বইবে কী করে ?"

"কারও বা থাকে দাবি, কারও বা থাকে দায় ; এই দুই নিয়ে সংসার। দায়টাকেই আমি আমার করেছি, এ আমি অন্যকে দেব কেন ?"

"আমি যদি পুরুষমানুষ হতুম জোর করে তোমার কাছ থেকে কেড়ে নিতুম।"

"তাহলেই তো বুঝতে পারছিস কুমু, দায় ঘাড়ে নেবার একটা লোভ আছে। তুই নিজে নিতে পারছিস নে বলেই তোর মেজদাদাকে দিয়ে সাধ মেটাতে চাস। কেন, আমিই বা কী অপরাধ করেছি।"

"দাদা, তুমি টাকা ধার করতে এসেছ ?"

"কিসের থেকে বুঝলি ?"

"তোমার মুখ দেখেই বুঝেছি। আচ্ছা, আমি কি কিছুই করতে পারি নে ?"

"কী ক'রে, বলো ?"

"এই মনে করো, কোনো দলিলে সই করে। আমার সইয়ের কি কোনো দামই নেই?"

"খুবই দাম আছে; সে আমাদের কাছে, মহাজনের কাছে নয়।"

"তোমার পায়ে পড়ি দাদা, বলো আমি কী করতে পারি।"

"লক্ষ্মী হয়ে শান্ত হয়ে থাক্, ধৈর্য ধরে অপেক্ষা কর্, মনে রাখিস সংসারে সেও একটা মস্ত কাজ। তুফানের মুখে নৌকো ঠিক রাখাও যেমন একটা কাজ, মাথা ঠিক রাখাও তেমনি। আমার এসরাজটা নিয়ে আয়, একটু বাজা।"

"দাদা, আমার বড়ো ইচ্ছে করছে একটা কিছু করি।"

"বাজানোটা বুঝি একটা-কিছু নয়।"

"আমি চাই খুব একটা শক্ত কাজ।"

"দলিলে নাম সই করার চেয়ে এসরাজ বাজানো অনেক বেশি শক্ত। আন্ যন্ত্রটা।"

৪৮

একদিন মধুসূদনকে সকলেই যেমন ভয় করত, শ্যামাসুন্দরীরও ভয় ছিল তেমনি। ভিতরে ভিতরে মধুসূদন তার দিকে কখনো কখনো যেন টলেছে, শ্যামাসুন্দরী তা আন্দাজ করেছিল। কিন্তু কোন্ দিক দিয়ে বেড়া ডিঙিয়ে যে ওর কাছে যাওয়া যায় তা ঠাহর করতে পারত না। হাতড়ে হাতড়ে মাঝে মাঝে চেষ্টা করেছে, প্রত্যেকবার ফিরেছে ধাক্কা খেয়ে। মধুসূদন একনিষ্ঠ হয়ে ব্যাবসা গড়ে তুলছিল, কাঞ্চনের সাধনায় কামিনীকে সে অত্যন্তই তুচ্ছ করেছে, মেয়েরা সেইজন্যে ওকে অত্যন্তই ভয় করত। কিন্তু এই ভয়েরও একটা আকর্ষণ আছে। রুক্ষ রুক্ষ বক্ষ এবং সংকুচিত ব্যবহার নিয়েই শ্যামাসুন্দরী ঈষৎ একটা আবরণের আড়ালে মুগ্ধমনে

মধুসূদনের কাছে কাছে ফিরেছে। এক-একবার যখন অসতর্ক অবস্থায় মধুসূদন ওকে অল্প একটু প্রশ্রয় দিয়েছে সেই সময়েই যথার্থ ভয়ের কারণ ঘটেছে। তার অনতিপরেই কিছুদিন ধরে বিপরীত দিক থেকে মধুসূদন প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছে ওর জীবনে মেয়েরা একেবারেই হেয়। তাই এতকাল শ্যামাসুন্দরী নিজেকে খুবই সংযত করে রেখেছিল।

মধুসূদনের বিয়ের পর থেকে সে আর থাকতে পারছিল না। কুমুকে মধুসূদন যদি অন্য সাধারণ মেয়ের মতোই অবজ্ঞা করত, তাহলে সেটা একরকম সহ্য হত। কিন্তু শ্যামা যখন দেখলে রাশ আলগা দিয়ে মধুসূদনও কোনো মেয়েকে নিয়ে অন্ধবেগে মেতে উঠতে পারে, তখন সংযম রক্ষা তার পক্ষে আর সহজ রইল না। এ-কয়দিন সাহস করে যখন-তখন একটু একটু এগিয়ে আসছিল, দেখেছিল এগিয়ে আসা চলে। মাঝে মাঝে অল্পসল্প বাধা পেয়েছে, কিন্তু সেও দেখলে কেটে যায়। মধুসূদনের দুর্বলতা ধরা পড়েছে, সেইজন্যেই শ্যামার নিজের মধ্যেও ধৈর্য বাঁধ মানতে আর পারে না। কুমু চলে আসবার আগের রাত্রে মধুসূদন শ্যামাকে যত কাছে টেনেছিল এমন তো আর কখনোই হয় নি। তার পরেই ওর ভয় হল পাছে উলটো ধাক্কাটা জোরে এসে লাগে। কিন্তু এটুকু শ্যামা বুঝে নিয়েছে যে, ভীরুতা যদি না করে তবে ভয়ের কারণ আপনি কেটে যাবে।

সকালেই মধুসূদন বেরিয়ে গিয়েছিল, বেলা একটা পেরিয়ে বাড়ি এসেছে। ইদানীং অনেক কাল ধরে ওর স্নানাহারের নিয়মের এমন ব্যতিক্রম ঘটে নি। আজ বড়োই ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে বাড়িতে যেই এল, প্রথম কথাই মনে হল, কুমু তার দাদার ওখানে চলে গেছে এবং খুশি হয়েই চলে গেছে। এতকাল মধুসূদন আপনাতে আপনি খাড়া ছিল, কখন এক সময়ে টিল দিয়েছে, শরীরমনের আতুরতার সময় কোনো মেয়ের ভালোবাসাকে আশ্রয় করবার সুপ্ত ইচ্ছা ওর মনে উঠেছে

জেগে, সেইজন্যেই অনায়াসে কুমুর চলে যাওয়াতে ওর এমন ধিক্কার লাগল। আজ ওর খাবার সময়ে শ্যামাসুন্দরী ইচ্ছে করেই কাছে এসে বসে নি; কী জানি কাল রাত্রে নিজেকে ধরা দেবার পরে মধুসূদন নিজের উপর পাছে বিরক্ত হয়ে থাকে। খাবার পর মধুসূদন শূন্য শোবার ঘরে এসে একটুখানি চুপ করে থাকল, তার পরে নিজেই শ্যামাকে ডেকে পাঠালে। শ্যামা লাল রঙের একটা বিলিতি শাল গায়ে দিয়ে যেন একটু সংকুচিতভাবে ঘরে ঢুকে এক ধারে নতনেত্রে দাঁড়িয়ে রইল। মধুসূদন ডাকলে, "এস, এইখানে এস, ব'সো।"

শ্যামা শিয়রের কাছে ব'সে "তোমাকে যে বড়ো রোগা দেখাচ্ছে আজ" বলে একটু ঝুঁকে পড়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

মধুসূদন বললে, "আঃ, তোমার হাত বেশ ঠাণ্ডা।"

রাত্রে মধুসূদন যখন শুতে এল শ্যামাসুন্দরী অনাহূত ঘরে ঢুকে বললে, "আহা, তুমি একলা।"

শ্যামাসুন্দরী একটু যেন স্পর্ধার সঙ্গেই কোনো আর আবরণ রাখতে দিলে না। যেন অসংকোচে সবাইকে সাক্ষী রেখেই ও আপনার অধিকার পাকা করে তুলতে চায়। সময় বেশি নেই, কবে আবার কুমু এসে পড়বে, তার মধ্যে দখল সম্পূর্ণ হওয়া চাই। দখলটা প্রকাশ্য হলে তার জোর আছে, কোনোখানে লজ্জা রাখলে চলবে না। অবস্থাটা দেখতে দেখতে দাসীচাকরদের মধ্যেও জানাজানি হল। মধুসূদনের মনে বহুকালের প্রবৃত্তির আগুন যতবড়ো জোরে চাপা ছিল, ততবড়ো জোরেই তা অবারিত হল, কাউকে কেয়ার করলে না, মত্ততা খুব স্থূলভাবেই সংসারে প্রকাশ করে দিলে।

নবীন মোতির মা দুজনেই বুঝলে, এ-বান আর ঠেকানো যাবে না।

"দিদিকে কি ডেকে আনবে না? আর কি দেরি করা ভালো?"

"সেই কথাই তো ভাবছি। দাদার হুকুম নইলে তো উপায় নেই। দেখি চেষ্টা করে।"

যেদিন সকালে কৌশলে দাদার কাছে কথাটা পাড়বে বলে নবীন এল, দেখে যে দাদা বেরোবার জন্যে প্রস্তুত, দরজার কাছে গাড়ি তৈরি।

নবীন জিজ্ঞাসা করলে, "কোথাও বেরোচ্ছ নাকি।"

মধুসূদন একটু সংকোচ কাটিয়ে বললে, "সেই গনৎকার বেঙ্কটস্বামীর কাছে।"

নবীনের কাছে দুর্বলতা চাপা রাখতেই চেয়েছিল। হঠাৎ মনে হল ওকে সঙ্গে নিয়ে গেলেই সুবিধা হতে পারে। তাই বললে, "চলো আমার সঙ্গে।"

নবীন ভাবলে, সর্বনাশ। বললে, "দেখে আসি গে সে বাড়িতে আছে কি না। আমার তো বোধ হচ্ছে সে দেশে চলে গেছে, অন্তত সেইরকম তো কথা।"

মধুসূদন বললে, "তা বেশ তো, দেখে আসা যাক না।"

নবীন নিরুপায় হয়ে সঙ্গে চলল, কিন্তু মনে-মনে প্রমাদ গনলে।

গনৎকারের বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড়াতেই নবীন তাড়াতাড়ি নেমে গিয়ে একটু উঁকি মেরেই বললে, "বোধ হচ্ছে কেউ যেন বাড়িতে নেই।"

যেমন বলা, সেই মুহূর্তেই স্বয়ং বেঙ্কটস্বামী দাঁতন চিবোতে চিবোতে দরজার কাছে বেরিয়ে এল। নবীন দ্রুত তার গা ঘেঁষে প্রণাম করে বললে, "সাবধানে কথা কবেন।"

সেই এঁদো ঘরে তক্তপোশে সবাই বসল। নবীন বসল মধুসূদনের পিছনে। মধুসূদন কিছু বলবার আগেই নবীন বলে বসল, "মহারাজের সময় বড়ো খারাপ যাচ্ছে, কবে গ্রহশান্তি হবে বলে দাও শাস্ত্রীজি।"

মধুসূদন নবীনের এই ফাঁস-করে-দেওয়া প্রশ্নে অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বুড়ো আঙুল দিয়ে তার উরুতে খুব একটা টিপনি দিলে।

বেঙ্কটস্বামী রাশিচক্র কেটে একেবারে স্পষ্টই দেখিয়ে দিলে মধুসূদনের ধনস্থানে শনির দৃষ্টি পড়েছে।

গ্রহের নাম জেনে মধুসূদনের কোনো লাভ নেই, তার সঙ্গে বোঝাপড়া করা শক্ত। যে-যে মানুষ ওর সঙ্গে শত্রুতা করছে স্পষ্ট করে তাদেরই পরিচয় চাই, বর্ণমালার যে বর্গেই পড়ুক নাম বের করতে হবে। নবীনের মুশকিল এই যে, সে মধুসূদনের আপিসের ইতিবৃত্তান্ত কিছুই জানে না। ইশারাতেও সাহায্য খাটবে না। বেঙ্কটস্বামী মুগ্ধবোধের সূত্র আওড়ায় আর মধুসূদনের মুখের দিকে আড়ে আড়ে চায়। আজকের দিনের নামের বেলায় ভৃগুমুনি সম্পূর্ণ নীরব। হঠাৎ শাস্ত্রী বলে বসল, শত্রুতা করছে একজন স্ত্রীলোক।

নবীন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। সেই স্ত্রীলোকটি যে শ্যামাসুন্দরী এইটে কোনোমতে খাড়া করতে পারলে আর ভাবনা নেই। মধুসূদন নাম চায়। শাস্ত্রী তখন বর্ণমালার বর্গ শুরু করলে। 'ক'বর্গ শব্দটা বলে যেন অদৃশ্য ভৃগুমুনির দিকে কান পেতে রইল—কটাক্ষে দেখতে লাগল মধুসূদনের দিকে। 'ক'বর্গ শুনেই মধুসূদনের মুখে ঈষৎ একটু চমক দিলে। ওদিকে পিছন থেকে 'না' সংকেত করে নবীন ডাইনে বাঁয়ে লাগাল ঘাড়-নাড়া। নবীনের জানাই নেই যে মাদ্রাজে এ-সংকেতের উলটো মানে। বেঙ্কট-স্বামীর আর সন্দেহ রইল না—জোরগলায় বললে, 'ক'বর্গ। মধুসূদনের মুখ দেখে ঠিক বুঝেছিল 'ক'বর্গের প্রথম বর্ণটাই। তাই কথাটাকে আরও একটু ব্যাখ্যা করে শাস্ত্রী বললে, এই 'ক'য়ের মধ্যেই মধুসূদনের সমস্ত কু।

এর পরে পুরো নাম জানাবার জন্যে পীড়াপীড়ি না করে ব্যগ্র হয়ে মধুসূদন জিজ্ঞাসা করলে, "এর প্রতিকার?"

বেঙ্কটস্বামী গম্ভীরভাবে বলে দিলে, "কণ্টকেনৈব কণ্টকং—অর্থাৎ উদ্ধার করবে অন্য একজন স্ত্রীলোক।"

মধুসূদন চকিত হয়ে উঠল। বেঙ্কটস্বামী মানবচরিত্রবিদ্যার চর্চা করেছে।

নবীন অস্থির হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "স্বামীজি, ঘোড়দৌড়ে মহারাজার ঘোড়াটা কি জিতেছে?"

বেঙ্কটস্বামী জানে অধিকাংশ ঘোড়াই জেতে না, একটু হিসাবের ভান করে বলে দিল, "লোকসান দেখতে পাচ্ছি।"

কিছুকাল আগেই মধুসূদনের ঘোড়া মস্ত জিত জিতেছে। মধুসূদনকে কোনো কথা বলবার সময় না দিয়ে মুখ অত্যন্ত বিমর্ষ করে নবীন জিজ্ঞাসা করলে, "স্বামীজি, আমার কন্যাটার কী গতি হবে?" বলা বাহুল্য, নবীনের কন্যা নেই।

বেঙ্কটস্বামী নিশ্চয় ঠাওরালে পাত্র খুঁজছে। নবীনের চেহারা দেখেই বুঝলে, মেয়েটি অপ্সরা নয়। বলে দিলে, "পাত্র শীঘ্র মিলবে না, অনেক টাকা ব্যয় করতে হবে।"

মধুসূদনকে একটু অবসর না দিয়ে পরে পরে দশ-বারোটা অসংগত প্রশ্নের অদ্ভুত উত্তর বের করে নিয়ে নবীন বললে, "দাদা, আর কেন? এখন চলো।"

গাড়িতে উঠেই নবীন বলে উঠল, "দাদা, ওর সমস্ত চালাকি। ভণ্ড কোথাকার।"

"কিন্তু সেদিন যে—"

"সেদিন ও আগে থাকতে খবর নিয়েছিল।"

"কেমন করে জানলে যে আমি আসব?"

"আমারই বোকামি। ঘাট হয়েছে ওর কাছে তোমাকে এনেছিলুম।"

জ্যোতিষীর প্রতারণার প্রমাণ যতই পাক, 'ক'বর্গের কু মধুসূদনের মনে বিঁধে রইল। ভেবে দেখলে যে, নক্ষত্র অনাদর ক'রে খুচরো প্রশ্নের যা-তা জবাব দেয়, কিন্তু আদত প্রশ্নের জবাবে ভুল হয় না। মধুসূদন যার প্রত্যাশাই করে নি সেই দুঃসময় ওর বিবাহের সঙ্গে সঙ্গেই এল। এর চেয়ে স্পষ্ট প্রমাণ কী হবে?

নবীন আস্তে আস্তে কথা পাড়ল, "দাদা, দুই সপ্তাহ তো কেটে গেল, এইবার বউরানীকে আনিয়ে নিই।"

"কেন, তাড়া কিসের? দেখো নবীন, তোমাকে বলে রাখলুম আর কখনোই এ-সব কথা আমার কাছে তুলবে না। যে দিন আমার খুশি আমি আনিয়ে নেব।"

নবীন দাদাকে চেনে, বুঝলে এ-কথাটা খতম হয়ে গেল।

তবু সাহস করে জিজ্ঞাসা করলে, "মেজোবউ যদি বউরানীকে দেখতে যায় তাহলে কি দোষ আছে?"

মধুসূদন অবজ্ঞা করে সংক্ষেপে বললে, "যাক না।"

৪৯

ব্যস্তসমস্ত হয়ে একটা কেদারা দেখিয়ে দিয়ে বিপ্রদাস বললে, "আসুন নবীনবাবু, এইখানে বসুন।"

নবীন বললে, "আমার পরিচয়টা পান নি বোধ হচ্ছে। মনে করেছেন আমি রাজবাড়ির কোন্ আদুরে ছেলে। যিনি আপনার ছোটো বোন, আমি তাঁর অধম সেবক, আমাকে সম্মান করে আমায় আশীর্বাদটা ফাঁকি দেবেন না। কিন্তু করেছেন কী? আপনার অমন শরীরের কেবল ছায়াটি বাকি রেখেছেন!"

"শরীরটা সত্য নয়, ছায়া, মাঝে মাঝে সে-খবরটা পাওয়া ভালো। ওতে শেষের পাঠ এগিয়ে থাকে।"

কুমু ঘরে ঢুকেই বললে, "ঠাকুরপো, চলো কিছু খাবে।"

"খাব, কিন্তু একটা শর্ত আছে। যতক্ষণ পূরণ না হবে, ব্রাহ্মণ অতিথি অভুক্ত তোমার দ্বারে পড়ে থাকবে।"

"শর্তটা কী শুনি ?"

"আমাদের বাড়িতে থাকতেই দরবার জানিয়ে রেখেছিলুম কিন্তু সেখানে জোর পাই নি। ভক্তকে একখানি ছবি তোমায় দিতে হবে। সেদিন বলেছিলে নেই, আজ তা বলবার জো নেই, তোমার দাদার ঘরের দেয়ালে ওই তো সামনেই ঝুলছে।"

ভালো ছবি দৈবাৎ হয়ে থাকে, কুমুর ওই ছবিটি তেমনি যেন দৈবের রচনা। কপালে যে-আলোটি পড়লে কুমুর মনের চেহারাটি মুখে প্রকাশ পায় সেই আলোটিই পড়েছিল। ললাটে নির্মল বুদ্ধির দীপ্তি, চোখে গভীর সারল্যের সকরুণতা। দাঁড়ানো ছবি। কুমুর সুন্দর ডান হাতটি একটা শূন্য চৌকির হাতার উপরে। মনে হয় যেন সামনে ও আপনারই একটা দূরকালের ছায়া দেখতে পেয়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়েছে।

নিজের এই ছবিটি কুমুর চোখে পড়ে নি। কলকাতা থেকে ছবিওআলা আনিয়ে বিবাহের কয়দিন আগে ওর দাদা এটি তুলিয়েছিল। তার পরে নিজের ঘরে ছবিটি টাঙিয়েছে, এইটেতে কুমুর হৃদয় আর্দ্র হয়ে গেল। ফটোগ্রাফের কপি আরও নিশ্চয় আছে, তাই দাদার মুখের দিকে চাইলো। নবীন বললে, "বুঝতে পারছেন, বিপ্রদাসবাবু, বউরানীর দয়া হয়েছে। দেখুন না ওঁর চোখের দিকে চেয়ে। অযোগ্য বলেই আমার প্রতি ওঁর একটু বিশেষ করুণা।"

বিপ্রদাস হেসে বললে, "কুমু, আমার ওই চামড়ার বাক্সয় আরও

খানকয়েক ছবি আছে, তোর ভক্তকে বরদান করতে চাস যদি তো অভাব হবে না।"

কুমু নবীনকে খাওয়াতে নিয়ে গেলে পর কালু এল ঘরে। বললে, "আমি মেজোবাবুকে তার করেছি শীঘ্র চলে আসবার জন্যে।"

"আমার নামে?"

"হ্যাঁ, তোমারই নামে, দাদা। আমি জানি, তুমি শেষ পর্যন্ত হাঁ-না করবে, এদিকে সময় বড়ো কঠিন হয়ে আসছে। ডাক্তারের কাছে যা শোনা গেল, তোমার উপর এত চাপ সইবে না।"

ডাক্তার বলেছে হৃদ্‌যন্ত্রের বিকারের লক্ষণ দেখা দিয়েছে, শরীরমন শান্ত রাখা চাই। এক সময়ে বিপ্রদাসের যে অতিরিক্ত কুস্তির নেশা ছিল এটা তারই ফল, তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে মনের উদ্বেগ।

সুবোধকে এ-রকম জোর-তলব করে ধরে আনা ভালো হবে কি না বিপ্রদাস বুঝতে পারলে না। চুপ করে ভাবতে লাগল। কালু বললে, "বড়োবাবু, মিথ্যা ভাবছ, বিষয়কর্মের একটা শেষ ব্যবস্থা এখনই করা চাই, আর এতে তাঁকে না হলে চলবে না। বারো পার্সেন্ট সুদে মাড়োয়ারির হাতে মাথা বিকিয়ে দিতে পারব না। তারা আবার দু-লাখ টাকা আগাম সুদ হিসেবে কেটে নেবে। তার উপর দালালি আছে।"

বিপ্রদাস বললে, "আচ্ছা, আসুক সুবোধ। কিন্তু আসবে তো?"

"যতবড়ো সাহেব হোক না, তোমার তার পেলে সে না এসে থাকতে পারবে না। সে তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। কিন্তু দাদা, আর দেরি করা নয়, খুকীকে শ্বশুরবাড়ি পাঠিয়ে দাও।"

বিপ্রদাস খানিকক্ষণ চুপ করে রইল, বললে, "মধুসূদন না ডেকে পাঠালে যাবার বাধা আছে।"

"কেন, খুকী কি মধুসূদনের পাটখাটা মজুর? নিজের ঘরে থাকে তার আবার হুকুম কিসের?"

আহার সেরে নবীন একলা এল বিপ্রদাসের ঘরে। বিপ্রদাস বললে, "কুমু তোমাকে স্নেহ করে।"

নবীন বললে, "তা করেন। বোধ করি আমি অযোগ্য বলেই ওঁর স্নেহ এত বেশি।"

"তাঁর সম্বন্ধে তোমাকে কিছু বলতে চাই, তুমি আমাকে কোনো কথা লুকিয়ো না।"

"কোনো কথা আমার নেই যা আপনাকে বলতে আমার বাধবে।"

"কুমু যে এখানে এসেছে আমার মনে হচ্ছে তার মধ্যে যেন বাঁকা কিছু আছে।"

"আপনি ঠিকই বুঝেছেন। যাঁর অনাদর কল্পনা করা যায় না সংসারে তাঁরও অনাদর ঘটে।"

"অনাদর ঘটেছে তবে?"

"সেই লজ্জায় এসেছি। আর তো কিছুই পারি নে, পায়ের ধুলো নিয়ে মনে মনে মাপ চাই।"

"কুমু যদি আজই স্বামীর ঘরে ফিরে যায় তাতে ক্ষতি আছে কি?"

"সত্যি কথা বলি, যেতে বলতে সাহস করি নে।"

ঠিক যে কী হয়েছে বিপ্রদাস সে-কথা নবীনকে জিজ্ঞাসা করলে না। মনে করলে, জিজ্ঞাসা করা অন্যায় হবে। কুমুকেও প্রশ্ন করে কোনো কথা বের করতে বিপ্রদাসের অভিরুচি নেই। মনের মধ্যে ছটফট করতে লাগল। কালুকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলে, "তুমি তো ওদের বাড়িতে যাওয়া-আসা কর, মধুসূদনের সম্বন্ধে তুমি বোধ হয় কিছু জান।"

"কিছু আভাস পেয়েছি, কিন্তু সম্পূর্ণ না জেনে তোমার কাছে কিছু

বলতে চাই নে। আর দুটো দিন সবুর করো, খবর তোমাকে দিতে পারব।"

আশঙ্কায় বিপ্রদাসের মন ব্যথিত হয়ে উঠল। প্রতিকার করবার কোনো রাস্তা তার হাতে নেই বলে দুশ্চিন্তাটা ওর হৃৎপিণ্ডটাকে ক্ষণে ক্ষণে মোচড় দিতে লাগল।

৫০

কুমু অনেকদিন যেটা একান্ত ইচ্ছা করেছিল সে ওর পূর্ণ হল; সেই পরিচিত ঘরে, সেই ওর দাদার স্নেহের পরিবেষ্টনের মধ্যে এল ফিরে, কিন্তু দেখতে পেলে ওর সেই সহজ জায়গাটি নেই। এক-একবার অভিমানে ওর মনে হচ্ছে যাই ফিরে, কেননা ও স্পষ্ট বুঝতে পারছে সবারই মনে প্রতিদিন এই প্রশ্নটি রয়েছে, 'ও ফিরে যাচ্ছে না কেন, কী হয়েছে ওর?' দাদার গভীর স্নেহের মধ্যে ওই একটা উৎকণ্ঠা, সেটা নিয়ে ওদের মধ্যে স্পষ্ট আলোচনা চলে না, তার বিষয় ও নিজে, অথচ ওর কাছে সেটা চাপা রইল।

বিকেল হয়ে আসছে, রোদ্দুর পড়ে এল। শোবার ঘরের জানালার কাছে কুমু ব'সে। কাকগুলো ডাকাডাকি করছে, বাইরের রাস্তায় গাড়ির শব্দ আর লোকালয়ের নানা কলরব। নতুন বসন্তের হাওয়া শহরের ইঁটকাঠের উপর রঙ ধরাতে পারলে না। সামনের বাড়িটাকে অনেকখানি আড়াল করে একটা পাতবাদামের গাছ, অস্থির হাওয়া তারই ঘনসবুজ পাতায় দোল লাগিয়ে অপরাহ্নের আলোটাকে টুকরো টুকরো করে ছড়িয়ে দিতে লাগল। এইরকম সময়েই পোষা হরিণী তার অজানা বনের দিকে ছুটে যেতে চায়, যেদিন হাওয়ার মধ্যে বসন্তের ছোঁওয়া লাগে, মনে হয় পৃথিবী যেন উৎসুক হয়ে চেয়ে আছে নীল আকাশের দূর পথের

দিকে। যা-কিছু চার দিকে বেড়ে আছে সেইটেকেই মনে হয় মিথ্যে; আর যার ঠিকানা পাওয়া যায় নি, যার ছবি আঁকতে গেলে রঙ যায় আকাশে ছড়িয়ে, মূর্তি উঁকি দিয়ে পালিয়ে যায় জলস্থলের নানা ইশারার মধ্যে মন তাকেই বলে সব চেয়ে সত্য। কুমুর মন হাঁপিয়ে উঠে আজ পালাই-পালাই করছে সব কিছু থেকে, আপনার কাছ থেকে। কিন্তু এ কী বেড়া। আজ এ-বাড়িতেও মুক্তি নেই। কল্পনায় মৃত্যুকেও মধুর করে তুললে। মনে মনে বললে, কালো যমুনার পারে, সেই কালোবরণ, চলেছি তারই অভিসারে, দিনের পর দিনে—কত দীর্ঘ পথ, কত দুঃখের পথ। মনে পড়ে গেল, দাদার অসুখ বেড়েছে—সেবা করতে এসে আমিই অসুখ বাড়িয়েছি, এখন আমি যা করতে যাব তাতেই উলটো হবে। দুই হাতে মুখ চেপে ধরে কুমু খুব খানিকটা কেঁদে নিলে। কান্নার বেগ থামলে স্থির করলে বাড়ি ফিরে যাবে, তা যা হয় তাই হবে—সব সহ্য করবে—শেষকালে তো আছে মুক্তি, শীতল গভীর মধুর। সেই মৃত্যুর কল্পনা মনের মধ্যে যতই স্পষ্ট করে আঁকড়ে ধরল ততই ওর বোধ হল জীবনের ভার একেবারে দুর্বহ হবে না, গুন গুন করে গাইতে লাগল—

পথপর রয়নি অঁধেরী,
কুঞ্জপর দীপ উজিয়ারা।

দুপুরবেলা কুমু দাদাকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে চলে এসেছিল, এতক্ষণে ওষুধ আর পথ্য খাওয়াবার সময় হয়েছে। ঘরে এসে দেখলে, বিপ্রদাস উঠে বসে পোর্টফোলিয়ো কোলে নিয়ে সুবোধকে ইংরেজিতে এক লম্বা চিঠি লিখছে। ভর্ৎসনার সুরে কুমু তাকে বললে, "দাদা, আজ তুমি ভালো করে ঘুমোও নি।"

বিপ্রদাস বললে, "তুই ঠিক করে রেখেছিস ঘুমোলেই বিশ্রাম হয়।

মন যখন চিঠি লেখার দরকার বোধ করে তখন চিঠি লিখলেই বিশ্রাম।"

কুমু বুঝলে, দরকারটা ওকে নিয়েই। সমুদ্রের এপারে এক ভাইকে ব্যাকুল করেছে, সমুদ্রের ওপারে আর-এক ভাইকে ছটফটিয়ে দেবে, কী ভাগ্য নিয়েই জন্মেছিল তাদের এই বোন। দাদাকে চা খাওয়ানো হলে পর আস্তে আস্তে বললে, "অনেক দিন তো হয়ে গেল, এবার বাড়ি যাওয়া ঠিক করেছি।"

বিপ্রদাস কুমুর মুখের দিকে চেয়ে বোঝবার চেষ্টা করলে কথাটা কী ভাবের। এতদিন দুই ভাইবোনের মধ্যে যে স্পষ্ট বোঝাপড়া ছিল আজ আর তা নেই, এখন মনের কথার জন্যে হাতড়ে বেড়াতে হয়। বিপ্রদাস লেখা বন্ধ করলে। কুমুকে পাশে বসিয়ে কিছু না বলে তার হাতের উপর ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। কুমু তার ভাষা বুঝল। সংসারের গ্রন্থি কঠিন হয়েছে, কিন্তু ভালোবাসার একটুও অভাব হয় নি। চোখ দিয়ে জল পড়তে চাইল, জোর করে বন্ধ করে দিলে। কুমু মনে মনে বললে, এই ভালোবাসার উপর সে ভার চাপাবে না। তাই আবার বললে, "দাদা, আমি যাওয়া ঠিক করেছি।"

বিপ্রদাস কী জবাব দেবে ভেবে পেলে না, কেননা কুমুর যাওয়াটাই হয়তো ভালো, অন্তত সেটাই তো কর্তব্য। চুপ করে রইল। এমন সময় কুকুরটা ঘুম থেকে জেগে কুমুর কোলের উপর দুই পা তুলে বিপ্রদাসের প্রসাদ রুটির টুকরোর জন্যে কাকুতি জানালে।

রামস্বরূপ বেহারা এসে খবর দিলে মুখুজ্যেমশায় এসেছেন। কুমু উদ্বিগ্ন হয়ে বললে, "আজ দিনে তোমার ঘুম হয় নি, তার উপরে কালুদার সঙ্গে তর্কবিতর্ক করে ক্লান্ত হয়ে পড়বে। আমি বরঞ্চ যাই, কিছু যদি কথা থাকে শুনে নিই গে, তার পরে তোমাকে সময়মতো এসে জানাব।"

"ভারি ডাক্তার হয়েছিস তুই! একজনের কথা যদি আর-একজন শুনে নেয় তাতে রোগীর মন খুব সুস্থির হয় ভেবেছিস!"

"আচ্ছা, আমি শুনব না, কিন্তু আজ থাক্।"

"কুমু, ইংরেজ-কবি বলেছে, শ্রুত সংগীত মধুর, অশ্রুত সংগীত মধুরতর। তেমনি শ্রুত সংবাদ ক্লান্তিকর হতে পারে, কিন্তু অশ্রুত সংবাদ আরও অনেক ক্লান্তিকর, অতএব অবিলম্বে শুনে নেওয়াই ভালো।"

"আমি কিন্তু পনেরো মিনিট পরেই আসব, আর তখনো যদি তোমাদের কথাবার্তা না থামে তবে আমি তার মধ্যেই এসরাজ বাজাব— ভীমপলশ্রী।"

"আচ্ছা, তাতেই রাজি।"

আধঘণ্টা পরে এসরাজ হাতে কুমু ঘরে ঢুকল, কিন্তু বিপ্রদাসের মুখের ভাব দেখে তখনই এসরাজটা দেয়ালের কোণে ঠেকিয়ে রেখে দাদার পাশে বসে তার হাত চেপে ধরে জিজ্ঞাসা করলে, "কী হয়েছে দাদা?"

কুমু এতদিন বিপ্রদাসের মধ্যে যে-অস্থিরতা লক্ষ্য করেছিল তার মধ্যে একটা গভীর বিষাদ ছিল। বিপ্রদাসের জীবনে দুঃখ তাপ অনেক গেছে, কেউ তাকে সহজে বিচলিত হতে দেখে নি। বই পড়া, গানবাজনা করা, দূরবীন নিয়ে তারা দেখা, ঘোড়ায় চড়া, নানা জায়গা থেকে অজানা গাছপালা নিয়ে বাগান করা প্রভৃতি নানা বিষয়েই তার ঔৎসুক্য থাকাতে সে নিজের সম্বন্ধীয় দুঃখ কষ্টকে নিজের মধ্যে কখনো জমতে দেয় নি। এবার রোগের দুর্বলতায় তাকে নিজের ছোটো গণ্ডির মধ্যে বড়ো বেশি করে বদ্ধ করেছে। এখন সে বাইরে থেকে সেবা ও সঙ্গ পাবার জন্যে উন্মুখ হয়ে থাকে, চিঠিপত্র ঠিকমতো না পেলে উদ্বিগ্ন হয়, ভাবনাগুলো দেখতে দেখতে কালো হয়ে ওঠে। তাই দাদার 'পরে কুমুর স্নেহ আজ যেন মাতৃস্নেহের মতো রূপ ধরেছে— তার অমন ধৈর্যগম্ভীর আত্মসমাহিত দাদার

মধ্যে কোথা থেকে যেন বালকের ভাব এল, এত আবদার, এত চাঞ্চল্য, এত জেদ। আর সেই সঙ্গে এমন গভীর বিষাদ আর উৎকণ্ঠা।

কিন্তু কুমু এসে দেখলে তার দাদার সেই আবেশটা কেটে গিয়েছে। তার চোখে যে-আগুন জ্বলেছে সে যেন মহাদেবের তৃতীয় নেত্রের আগুনের মতো, নিজের কোনো বেদনার জন্যে নয়— সে তার দৃষ্টির সামনে বিশ্বের কোনো পাপকে দেখতে পাচ্ছে, তাকে দগ্ধ করা চাই। কুমুর কথায় কোনো উত্তর না দিয়ে সামনের দেয়ালে অনিমেষ দৃষ্টি রেখে বিপ্রদাস চুপ করে বসে রইল।

কুমু আর খানিক বাদে আবার জিজ্ঞাসা করলে, "দাদা, কী হয়েছে বলো।"

বিপ্রদাস যেন এক দূর লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি রেখে বললে, "দুঃখ এড়াবার জন্যে চেষ্টা করলে দুঃখ পেয়ে বসে। ওকে জোরের সঙ্গে মানতে হবে।"

"তুমি উপদেশ দাও, আমি মানতে পারব দাদা।"

"আমি দেখতে পাচ্ছি, মেয়েদের যে অপমান সে আছে সমস্ত সমাজের ভিতরে, সে কোনো একজন মেয়ের নয়।"

কুমু ভালো করে তার দাদার কথার মানে বুঝতে পারলে না।

বিপ্রদাস বললে, "ব্যথাটাকে আমারই আপনার মনে করে এতদিন কষ্ট পাচ্ছিলুম, আজ বুঝতে পারছি এর সঙ্গে লড়াই করতে হবে সকলের হয়ে।"

বিপ্রদাসের ফ্যাকাশে গৌরবর্ণ মুখের উপর লাল আভা এল। ওর কোলের উপর রেশমের কাজ-করা একটা চৌকো বালিশ ছিল, সেটাকে ঠেলে হঠাৎ সরিয়ে ফেলে দিলে। বিছানা থেকে উঠে পাশের হাতাওআলা চৌকির উপর বসতে যাচ্ছিল, কুমু ওর হাত চেপে ধরে বললে, "শান্ত হও দাদা, উঠো না, তোমার অসুখ বাড়বে।" বলে একটু জোর

করেই পিঠের দিকের উঁচু-করা বালিশের উপর বিপ্রদাসকে হেলিয়ে শুইয়ে দিলে।

বিপ্রদাস গায়ের কাপড়টাকে মুঠো দিয়ে চেপে ধরে বললে, "সহ্য করা ছাড়া মেয়েদের অন্য কোনো রাস্তা একেবারেই নেই বলেই তাদের উপর কেবলই মার এসে পড়ছে। বলবার দিন এসেছে যে সহ্য করব না। কুমু, এখানেই তোর ঘর মনে করে থাকতে পারবি? ও-বাড়িতে তোর যাওয়া চলবে না।"

কালুর কাছ থেকে বিপ্রদাস আজ অনেক কথা শুনেছে।

শ্যামাসুন্দরীর সঙ্গে মধুসূদনের যে-সম্বন্ধ ঘটেছে তার মধ্যে অপ্রকাশ্যতা আর ছিল না। ওরা দুই পক্ষই অকুণ্ঠিত। লোকে ওদেরকে অপরাধী মনে করছে মনে করেই ওরা স্পর্ধিত হয়ে উঠেছে। এই সম্বন্ধটার মধ্যে সূক্ষ্ম কাজ কিছুই ছিল না বলেই পরস্পরকে এবং লোকমতকে বাঁচিয়ে চলা ওদের পক্ষে ছিল অনাবশ্যক। শোনা গেছে শ্যামাসুন্দরীকে মধুসূদন কখনো কখনো মেরেওছে, শ্যামা যখন তারস্বরে কলহ করেছে তখন মধুসূদন তাকে সকলের সামনেই বলেছে, "দূর হয়ে যা বজ্জাত, বেরিয়ে যা আমার বাড়ি থেকে।" কিন্তু এতেও কিছু আসে-যায় নি। শ্যামার সম্বন্ধে মধুসূদন আপন কর্তৃত্ব সম্পূর্ণ বজায় রেখেছে, ইচ্ছে ক'রে মধুসূদন নিজে তাকে যা দিয়েছে শ্যামা যখনই তার বেশি কিছুতে হাত দিতে গেছে অমনি খেয়েছে ধমক। শ্যামার ইচ্ছে ছিল, সংসারের কাজে মোতির মার জায়গাটা সে-ই দখল করে, কিন্তু তাতেও বাধা পেলে; মধুসূদন মোতির মাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে, শ্যামাসুন্দরীকে বিশ্বাস করে না। শ্যামার সম্বন্ধে ওর কল্পনায় রঙ লাগে নি, অথচ খুব মোটা রকমের একটা আসক্তি জন্মেছে। যেন শীতকালের বহুব্যবহৃত ময়লা রেজাইটার মতো, তাতে কারুকাজের সম্পূর্ণ অভাব, বিশেষ যত্ন করবার জিনিস নয়, খাট থেকে

ধুলোয় পড়ে গেলেও আসে-যায় না। কিন্তু ওতে আরাম আছে। শ্যামাকে সামলিয়ে চলবার একটুও দরকার নেই, তা ছাড়া শ্যামা সমস্ত মনপ্রাণের সঙ্গে ওকে যে বড়ো বলে মানে, ওর জন্যে সব সইতে সব করতে সে রাজি এটা নিঃসংশয়ে জানার দরুন মধুসূদনের আত্মমর্যাদা সুস্থ আছে। কুমু থাকতে প্রতিদিন ওর এই আত্মমর্যাদা বড়ো বেশি নাড়া খেয়েছিল।

মধুসূদনের এই আধুনিক ইতিহাসটা জানবার জন্যে কালুকে খুব বেশি সন্ধান করতে হয় নি। ওদের বাড়িতে লোকজনের মধ্যে এই নিয়ে যথেষ্ট বলাবলি চলেছিল, অবশেষে নিতান্ত অভ্যস্ত হওয়াতে বলাবলির পালাও একরকম শেষ হয়ে এসেছে।

খবরটা শোনবামাত্র বিপ্রদাসকে যেন আগুনের তীর মারলে। মধুসূদন কিছু ঢাকবার চেষ্টামাত্রও করে নি, নিজের স্ত্রীকে প্রকাশ্যে অপমান করা এতই সহজ—স্ত্রীর প্রতি অত্যাচার করতে বাহিরের বাধা এতই কম। স্ত্রীকে নিরুপায়ভাবে স্বামীর বাধ্য করতে সমাজে হাজার রকম যন্ত্র ও যন্ত্রণার সৃষ্টি করা হয়েছে, অথচ সেই শক্তিহীন স্ত্রীকে স্বামীর উপদ্রব থেকে বাঁচাবার জন্যে কোনো আবশ্যিক পন্থা রাখা হয় নি। এরই নিদারুণ দুঃখ ও অসম্মান ঘরে ঘরে যুগে যুগে কী রকম ব্যাপ্ত হয়ে আছে এক মুহূর্তে বিপ্রদাস তা যেন দেখতে পেলে। সতীত্বগরিমার ঘন প্রলেপ দিয়ে এই ব্যথা মারবার চেষ্টা, কিন্তু বেদনাকে অসম্ভব করবার একটুও চেষ্টা নেই। স্ত্রীলোক এত সস্তা, এত অকিঞ্চিৎকর।

বিপ্রদাস বললে, "কুমু, অপমান সহ্য করে যাওয়া শক্ত নয়, কিন্তু সহ্য করা অন্যায়। সমস্ত স্ত্রীলোকের হয়ে তোমাকে তোমার নিজের সম্মান দাবি করতে হবে, এতে সমাজ তোমাকে যত দুঃখ দিতে পারে দিক।"

কুমু বললে, "দাদা, তুমি কোন্ অপমানের কথা বলছ ঠিক বুঝতে পারছি নে।"

বিপ্রদাস বললে, "তুই কি তবে সব কথা জানিস নে ?"

কুমু বললে, "না।"

বিপ্রদাস চুপ করে রইল। একটু পরে বললে, "মেয়েদের অপমানের দুঃখ আমার বুকের মধ্যে জমা হয়ে রয়েছে। কেন তা জানিস ?"

কুমু কিছু না বলে দাদার মুখের দিকে চেয়ে রইল। খানিক পরে বললে, "চিরজীবন মা যা দুঃখ পেয়েছিলেন আমি তা কোনোমতে ভুলতে পারি নে, আমাদের ধর্মবুদ্ধিহীন সমাজ সেজন্যে দায়ী।"

এইখানে ভাইবোনের মধ্যে প্রভেদ আছে। কুমু তার বাবাকে খুব বেশি ভালোবাসত, জানত তাঁর হৃদয় কত কোমল। সমস্ত অপরাধ কাটিয়েও তার বাবা ছিলেন খুব বড়ো এ-কথা না মনে করে সে থাকতে পারত না, এমনকি তার বাবার জীবনে যে শোচনীয় পরিণাম ঘটেছিল সেজন্যে সে তার মাকেই মনে মনে দোষ দিয়েছে।

বিপ্রদাসও তার বাবাকে বড়ো বলেই ভক্তি করেছে। কিন্তু বারে বারে স্খলনের দ্বারা তার মাকে তিনি সকলের কাছে অসম্মানিত করতে বাধা পান নি এটা সে কোনোমতে ক্ষমা করতে পারলে না। তার মাও ক্ষমা করেন নি বলে বিপ্রদাস মনের মধ্যে গৌরব বোধ করত।

বিপ্রদাস বললে, "আমার মা যে অপমান পেয়েছিলেন তাতে সমস্ত স্ত্রীজাতির অসম্মান। কুমু, তুই ব্যক্তিগতভাবে নিজের কথা ভুলে সেই অসম্মানের বিরুদ্ধে দাঁড়াবি, কিছুতে হার মানবি নে।"

কুমু মুখ নিচু করে আস্তে আস্তে বললে, "বাবা কিন্তু মাকে খুব ভালোবাসতেন সে-কথা ভুলো না, দাদা। সেই ভালোবাসায় অনেক পাপের মার্জনা হয়।"

বিপ্রদাস বললে, "তা মানি, কিন্তু এত ভালোবাসা সত্ত্বেও তিনি এত সহজে মায়ের সম্মানহানি করতে পারতেন, সে পাপ সমাজের। সমাজকে

সেজন্য ক্ষমা করতে পারব না, সমাজের ভালোবাসাই নেই, আছে কেবল বিধান।”

“দাদা, তুমি কি কিছু শুনেছ?”

“হাঁ শুনেছি, সে-সব কথা তোকে আস্তে আস্তে পরে বলব।”

“সেই ভালো। আমার ভয় হচ্ছে আজকেকার এই-সব কথাবার্তায় তোমার শরীর আরও দুর্বল হয়ে যাবে।”

“না কুমু, ঠিক তার উলটো। এতদিন দুঃখের অবসাদে শরীরটা যেন এলিয়ে পড়ছিল। আজ যখন মন বলছে, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত লড়াই করতে হবে, আমার শরীরের ভিতর থেকে শক্তি আসছে।”

“কিসের লড়াই দাদা।”

“যে-সমাজ নারীকে তার মূল্য দিতে এত বেশি ফাঁকি দিয়েছে তার সঙ্গে লড়াই।”

“তুমি তার কি করতে পার দাদা?”

“আমি তাকে না মানতে পারি। তা ছাড়া আরও আরও কী করতে পারি সে আমাকে ভাবতে হবে; আজ থেকেই শুরু হল, কুমু। এই বাড়িতে তোর জায়গা আছে, সে সম্পূর্ণ তোর নিজের, আর-কারও সঙ্গে আপস করে নয়। এইখানেই তুই নিজের জোরে থাকবি।”

“আচ্ছা দাদা, সে হবে, কিন্তু আর তুমি কথা ক’য়ো না।”

এমন সময় খবর এল, মোতির মা এসেছে।

৫১

শোবার ঘরে কুমু মোতির মাকে নিয়ে বসল। কথা কইতে কইতে অন্ধকার হয়ে এল, বেহারা এল আলো জ্বালতে, কুমু নিষেধ করে দিলে।

কুমু সব কথাই শুনলে; চুপ ক’রে রইল।

মোতির মা বললে, "বাড়িকে ভূতে পেয়েছে বউরানী। ওখানে টিঁকে থাকা দায়, তুমি কি যাবে না?"

"আমার কি ডাক পড়েছে?"

"না, ডাকবার কথা বোধ হয় মনেও নেই। কিন্তু তুমি না গেলে তো চলবেই না।"

"আমার কী করবার আছে? আমি তো তাঁকে তৃপ্ত করতে পারব না। ভেবে দেখতে গেলে আমার জন্যেই সমস্ত কিছু হয়েছে, অথচ কোনো উপায় ছিল না। আমি যা দিতে পারতুম সে তিনি নিতে পারলেন না। আজ আমি শূন্য হাতে গিয়ে কী করব?"

"বল কী বউরানী, সংসার যে তোমারই, সে তো তোমার হাতছাড়া হলে চলবে না।"

"সংসার বলতে কী বোঝ ভাই? ঘরদুয়োর, জিনিসপত্র, লোকজন? লজ্জা করে এ-কথা বলতে যে, তাতে আমার অধিকার আছে। মহলে অধিকার খুইয়েছি, এখন কি ওই-সব বাইরের জিনিস নিয়ে লোভ করা চলে?"

"কী বলছ ভাই, বউরানী? ঘরে কি তুমি একেবারেই ফিরবে না?"

"সব কথা ভালো করে বুঝতে পারছি নে। আর কিছুদিন আগে হলে ঠাকুরের কাছে সংকেত চাইতুম, দৈবজ্ঞের কাছে শুধোতে যেতুম। কিন্তু আমার সে-সব ভরসা ধুয়েমুছে গেছে। আরম্ভে সব লক্ষণই তো ভালো ছিল। শেষে কোনোটাই তো একটুও খাটল না। আজ কতবার বসে বসে ভেবেছি, দেবতার চেয়ে দাদার বিচারের উপর ভর করলে এত বিপদ ঘটত না। তবুও মনের মধ্যে যে দেবতাকে নিয়ে দ্বিধা উঠেছে, হৃদয়ের মধ্যে তাঁকে এড়াতে পারি নে। ফিরে ফিরে সেইখানে এসে লুটিয়ে পড়ি।"

"তোমার কথা শুনে যে ভয় লাগে। ঘরে কি যাবেই না?"

"কোনো কালেই যাব না সে-কথা ভাবা শক্ত, যাবই সে-কথাও সহজ নয়।"

"আচ্ছা, তোমার দাদার কাছে একবার কথা বলে দেখব। দেখি তিনি কী বলেন। তাঁর দর্শন পাওয়া যাবে তো?"

"চলো না, এখনই নিয়ে যাচ্ছি।"

বিপ্রদাসের ঘরে ঢুকেই তার চেহারা দেখে মোতির মা থমকে দাঁড়াল, মনে হল যেন ভূমিকম্পের পরেকার আলো-নেবা চুড়ো-ভাঙা মন্দির, ভিতরে একটা অন্ধকার আর নিস্তব্ধতা। প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিয়ে মেজের উপর বসল।

বিপ্রদাস ব্যস্ত হয়ে বললে, "এই যে চৌকি আছে।"

মোতির মা মাথা নেড়ে বললে, "না, এখানে বেশ আছি।"

ঘোমটার ভিতর থেকে তার চোখ ছলছল করতে লাগল। বুঝতে পারলে দাদার এই অবস্থায় কুমুকে ব্যথাই বাজছে।

কুমু প্রসঙ্গটা সহজ করে দেবার জন্যে বললে, "দাদা, ইনি বিশেষ করে এসেছেন তোমার মত জিজ্ঞাসা করতে।"

মোতির মা বললে, "না না, মত জিজ্ঞাসা পরের কথা, আমি এসেছি ওঁর চরণ দর্শন করতে।"

কুমু বললে, "উনি জানতে চান, ওঁদের বাড়িতে আমাকে যেতে হবে কি না।"

বিপ্রদাস উঠে বসল; বললে, "সে তো পরের বাড়ি, সেখানে কুমু গিয়ে থাকবে কী করে?" যদি ক্রোধের সুরে বলত তাহলে কথাটার ভিতরকার আগুন এমন করে জ্বলে উঠত না। শান্ত কণ্ঠস্বর, মুখের মধ্যে উত্তেজনার লক্ষণ নেই।

মোতির মা ফিস ফিস করে কী বললে। তার অভিপ্রায় ছিল পাশে বসে কুমু তার কথাগুলো বিপ্রদাসের কানে পৌঁছিয়ে দেবে। কুমু সম্মত হল না, বললে, "তুমিই গলা ছেড়ে বলো।"

মোতির মা স্বর আর একটু স্পষ্ট করে বললে "যা ওঁর আপনারই, কেউ তাকে পরের করে দিতে পারে না, তা সে যেই হোক না।"

"সে-কথা ঠিক নয়। উনি আশ্রিত মাত্র। ওঁর নিজের অধিকারের জোর নেই। ওঁকে ঘরছাড়া করলে হয়তো নিন্দা করবে, বাধা দেবে না। যত শাস্তি সমস্তই কেবল ওঁর জন্যে। তবু অনুগ্রহের আশ্রয়ও সহ্য করা যেত যদি তা মহদাশ্রয় হত।"

এমন কথার কী জবাব দেবে মোতির মা ভেবে পেলে না। স্বামীর আশ্রয়ে বিঘ্ন ঘটলে মেয়ের পক্ষের লোকেরাই তো পায়ে-ধরাধরি করে, এ যে উলটো কাণ্ড!

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, "কিন্তু আপন সংসার না থাকলে মেয়েরা যে বাঁচে না; পুরুষেরা ভেসে বেড়াতে পারে, মেয়েদের কোথাও স্থিতি চাই তো।"

"স্থিতি কোথায়? অসম্মানের মধ্যে? আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি কুমুকে যিনি গড়েছেন তিনি আগাগোড়া পরম শ্রদ্ধা করে গড়েছেন। কুমুকে অবজ্ঞা করে এমন যোগ্যতা কারও নেই, চক্রবর্তী-সম্রাটেরও না।"

কুমুকে মোতির মা খুবই ভালোবাসে, ভক্তি করে, কিন্তু তবু কোনো মেয়ের এত মূল্য থাকতে পারে যে তার গৌরব স্বামীকে ছাপিয়ে যাবে এ-কথা মোতির মার কানে ঠিক লাগল না। সংসারে স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া-ঝাঁটি চলুক, স্ত্রীর ভাগ্যে অনাদর-অপমানও না-হয় যথেষ্ট ঘটল, এমনকি তাঁর থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে স্ত্রী আফিম খেয়ে গলায় দড়ি দিয়ে মরে সেও বোঝা যায়, কিন্তু তাই বলে স্বামীকে একেবারে বাদ দিয়ে স্ত্রী নিজের

জোরে থাকবে এটাকে মোতির মা স্পর্ধা বলেই মনে করে। মেয়েজাতের এত গুমর কেন। মধুসূদন যত অযোগ্য হোক, যত অন্যায় করুক, তবু সে তো পুরুষমানুষ; এক জায়গায় সে তার স্ত্রীর চেয়ে আপনিই বড়ো, সেখানে কোনো বিচার খাটে না। বিধাতার সঙ্গে মামলা করে জিতবে কে?

মোতির মা বললে, "একদিন ওখানে যেতে তো হবেই, আর তো রাস্তা নেই।"

"যেতে হবেই এ-কথা ক্রীতদাস ছাড়া কোনো মানুষের পক্ষে খাটে না।"

"মন্ত্র পড়ে স্ত্রী যে কেনা হয়েই গেছে। সাত পাক যেদিন ঘোরা হল সেদিন সে যে দেহে মনে বাঁধা পড়ল, তার তো আর পালাবার জো রইল না। এ বাঁধন যে মরণের বাড়া। মেয়ে হয়ে যখন জন্মেছি তখন এ-জন্মের মতো মেয়ের ভাগ্য তো আর কিছুতে উজিয়ে ফেরানো যায় না।"

বিপ্রদাস বুঝতে পারলে, মেয়ের সম্মান মেয়েদের কাছেই সবচেয়ে কম। তারা জানেও না যে, এইজন্যে মেয়েদের ভাগ্যে ঘরে ঘরে অপমানিত হওয়া এত সহজ। তারা আপনার আলো আপনি নিবিয়ে বসে আছে। তার পরে কেবলই মরছে ভয়ে, কেবলই মরছে ভাবনায়, অযোগ্য লোকের হাতে কেবলই খাচ্ছে মার, আর মনে করছে সেইটে নীরবে সহ্য করাতেই স্ত্রী-জন্মের সর্বোচ্চ চরিতার্থতা। না, মানুষের এত লাঞ্ছনাকে প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না। সমাজ যাকে এতদূর নামিয়ে দিলে সমাজকেই সে প্রতিদিন নামিয়ে দিচ্ছে।

বিপ্রদাসের খাটের পাশেই মেজের উপর কুমু মুখ নিচু করে বসে ছিল। বিপ্রদাস মোতির মাকে কিছু না বলে কুমুর মাথায় হাত দিয়ে বললে, "একটা কথা তোকে বলি কুমু, বোঝবার চেষ্টা করিস। ক্ষমতা জিনিসটা যেখানে পড়ে-পাওয়া জিনিস, যার কোনো যাচাই নেই, অধিকার বজায়

রাখবার জন্যে যাকে যোগ্যতার কোনো প্রমাণ দিতে হয় না, সেখানে সংসারে সে কেবলই হীনতার সৃষ্টি করে। এ-কথা তোকে অনেকবার বলেছি, তোর সংস্কার তুই কাটাতে পারিস নি, কষ্ট পেয়েছিস। তুই যখন বিশেষ করে ব্রাহ্মণভোজন করাতিস, কোনোদিন বাধা দিই নি, কেবল বার বার বোঝাতে চেষ্টা করেছি, অবিচারে কোনো মানুষের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করে নেওয়ার দ্বারা শুধু যে তারই অনিষ্ট তা নয়, তাতে করে সমাজের শ্রেষ্ঠতার আদর্শকেই খাটো করে। এ-রকম অন্ধ শ্রদ্ধার দ্বারা নিজেরই মনুষ্যত্বকে অশ্রদ্ধা করি এ-কথা কেউ ভাবে না কেন? তুই তো ইংরেজি সাহিত্য কিছু কিছু পড়েছিস, বুঝতে পারছিস নে, এই রকম যত দলগড়া শাস্ত্রগড়া নির্বিকার ক্ষমতার বিরুদ্ধে সমস্ত জগতে আজ লড়াইয়ের হাওয়া উঠেছে। যত-সব ইচ্ছাকৃত অন্ধ দাসত্বকে বড়ো নাম দিয়ে মানুষ দীর্ঘকাল পোষণ করেছে, তারই বাসা ভাঙবার দিন এল।"

কুমু মাথা নিচু করেই বললে, "দাদা, তুমি কি বল স্ত্রী স্বামীকে অতিক্রম করবে?"

"অন্যায় অতিক্রম করা মাত্রকেই দোষ দিচ্ছি। স্বামীও স্ত্রীকে অতিক্রম করবে না—এই আমার মত।"

"যদি করে, স্ত্রী কি তাই ব'লে—"

কুমুর কথা শেষ না হতেই বিপ্রদাস বললে, "স্ত্রী যদি সেই অন্যায় মেনে নেয় তবে সকল স্ত্রীলোকের প্রতিই তাতে করে অন্যায় করা হবে। এমনি করে প্রত্যেকের দ্বারাই সকলের দুঃখ জমে উঠেছে। অত্যাচারের পথ পাকা হয়েছে।"

মোতির মা একটু অধৈর্যের স্বরেই বললে, "আমাদের বউরানী সতীলক্ষ্মী, অপমান করলে সে অপমান ওঁকে স্পর্শ করতেও পারে না।"

বিপ্রদাসের কণ্ঠ এবার উত্তেজিত হয়ে উঠল, "তোমরা সতীলক্ষ্মীর

কথাই ভাবছ। আর যে-কাপুরুষ তাকে অবাধে অপমান করবার অধিকার পেয়ে সেটাকে প্রতিদিন খাটাচ্ছে তার দুর্গতির কথা ভাবছ না কেন ?”

কুমু তখনই উঠে দাঁড়িয়ে বিপ্রদাসের চুলের মধ্যে আঙুল বুলোতে বুলোতে বললে, “দাদা তুমি আর কথা কোয়ো না। তুমি যাকে মুক্তি বল, যা জ্ঞানের দ্বারা হয়, আমাদের রক্তের মধ্যে তার বাধা। আমরা মানুষকেও জড়িয়ে থাকি, বিশ্বাসকেও; কিছুতেই তার জট ছাড়াতে পারি নে। যতই ঘা খাই ঘুরেফিরে আটকা পড়ি। তোমরা অনেক জান তাতেই তোমাদের মন ছাড়া পায়, আমরা অনেক মানি তাতেই আমাদের জীবনের শূন্য ভরে। তুমি যখন বুঝিয়ে দাও তখন বুঝতে পারি হয়তো আমার ভুল আছে। কিন্তু ভুল বুঝতে পারা, আর ভুল ছাড়তে পারা কি একই ? লতার আঁকড়ির মতো আমাদের মমত্ব সব-কিছুকেই জড়িয়ে জড়িয়ে ধরে, সেটা ভালোই হোক আর মন্দই হোক, তার পরে আর তাকে ছাড়তে পারি নে।”

বিপ্রদাস বললে, “সেইজন্যেই তো সংসারে কাপুরুষের পূজার পূজারিনীর অভাব হয় না। তারা জানবার বেলা ‘অপবিত্রকে অপবিত্র বলেই জানে, কিন্তু মানবার বেলায় তাকে পবিত্রের মতো করেই মানে।”

কুমু বললে, “কী করব দাদা, সংসারকে দুই হাতে জড়িয়ে নিতে হবে বলেই আমাদের সৃষ্টি। তাই আমরা গাছকেও আঁকড়ে ধরি, শুকনো কুটোকেও। গুরুকে মানতে আমাদের যতক্ষণ লাগে, ভণ্ডকে মানতেও ততক্ষণ। জাল যে আমাদের নিজের ভিতরেই। দুঃখ থেকে আমাদেরকে বাঁচাবে কে ? সেইজন্যেই ভাবি, দুঃখ যদি পেতেই হয়, তাকে মেনে নিয়েও তাকে ছাড়িয়ে ওঠবার উপায় করতে হবে। তাই তো মেয়েরা এত করে ধর্মকে আশ্রয় করে থাকে।”

বিপ্রদাস কিছুই বললে না, চুপ করে বসে রইল।

সেই ওর চুপ করে বসে থাকাটাও কুমুকে কষ্ট দিলে। কুমু জানে কথা বলার চেয়েও এর ভার অনেক বেশি।

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে মোতির মা কুমুকে জিজ্ঞাসা করলে, "কী ঠিক করলে বউরানী?"

কুমু বললে, "যেতে পারব না। তা ছাড়া, আমাকে তো ফিরে যাবার অনুমতি দেন নি।"

মোতির মা মনে মনে কিছু বিরক্তই হল। শ্বশুরবাড়ির প্রতি ওর শ্রদ্ধা যে বেশি তা নয়, তবু শ্বশুরবাড়ি সম্বন্ধে দীর্ঘকালের মমত্ববোধ ওর হৃদয়কে অধিকার করে আছে। সেখানকার কোনো বউ যে তাকে লঙ্ঘন করবে এটা তার কিছুতেই ভালো লাগল না। কুমুকে যা বললে তার ভাবটা এই, পুরুষমানুষের প্রকৃতিতে দরদ কম আর তার অসংযম বেশি, গোড়া থেকেই এটা তো ধরা কথা। সৃষ্টি তো আমাদের হাতে নেই, যা পেয়েছি তাকে নিয়েই ব্যবহার করতে হবে। "ওরা ওই রকমই" বলে মনটাকে তৈরি করে নিয়ে যেমন করে হোক সংসারটাকে চালানোই চাই। কেননা সংসারটাই মেয়েদের। স্বামী ভালোই হোক মন্দই হোক, সংসারটাকে স্বীকার করে নিতেই হবে। তা যদি একেবারে অসম্ভব হয় তাহলে মরণ ছাড়া আর গতিই নেই।

কুমু হেসে বললে, "না-হয় তাই হল। মরণের অপরাধ কী?"

মোতির মা উদ্বিগ্ন হয়ে বলে উঠল, "অমন কথা বোলো না।"

কুমু জানে না অল্পদিন হল ওদেরই পাড়াতে একটি সতেরো বছরের বউ কার্বলিক অ্যাসিড খেয়ে আত্মহত্যা করেছিল। তার এম. এ. পাশ করা স্বামী—গবর্মেণ্ট আপিসে বড়ো চাকরি করে। স্ত্রী খোঁপায় গোঁজবার একটা রুপোর চিরুনি হারিয়ে ফেলেছে, মার কাছ থেকে এই নালিশ শুনে

লোকটা তাকে লাথি মেরেছিল। মোতির মার সেই কথা মনে প'ড়ে গায়ে কাঁটা দিলে।

এমন সময়ে নবীনের প্রবেশ। কুমু খুশি হয়ে উঠল। বললে, "জানতুম ঠাকুরপোর আসতে বেশি দেরি হবে না।"

নবীন হেসে বললে, "ন্যায়শাস্ত্রে বউরানীর দখল আছে, আগে দেখেছেন শ্রীমতী ধোঁয়াকে, তার থেকে শ্রীমান আগুনের আবির্ভাব হিসেব করতে শক্ত ঠেকে নি।"

মোতির মা বললে, "বউরানী, তুমিই ওকে নাই দিয়ে বাড়িয়ে তুলেছ। ও বুঝে নিয়েছে ওকে দেখলে তুমি খুশি হও, সেই দেমাকে—"

"আমাকে দেখলেও খুশি হতে পারেন যিনি, তাঁর কি কম ক্ষমতা? যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন তিনিও নিজের হাতের কাজ দেখে অনুতাপ করেন, আর যিনি আমার পাণিগ্রহণ করেছেন তাঁর মনের ভাব দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ।"

"ঠাকুরপো, তোমরা দুজনে মিলে কথা-কাটাকাটি করো, তৃতীয় ব্যক্তি ছন্দোভঙ্গ করতে চায় না, আমি এখন চললুম।"

মোতির মা বললে, "সে কী কথা ভাই। এখানে তৃতীয় ব্যক্তিটা কে? তুমি না আমি? গাড়িভাড়া করে ও কি আমাকে দেখতে এসেছে ভেবেছ?"

"না, ওঁর জন্যে খাবার বলে দিই গে।" বলে কুমু চলে গেল।

৫২

মোতির মা জিজ্ঞাসা করলে, "কিছু খবর আছে বুঝি?"

"আছে। দেরি করতে পারলুম না, তোমার সঙ্গে পরামর্শ করতে এলুম। তুমি তো চলে এলে, তার পরে দাদা হঠাৎ আমার ঘরে এসে

উপস্থিত। মেজাজটা খুবই খারাপ। সামান্য দামের একটা গিল্টি করা চুরোটের ছাইদান টেবিল থেকে অদৃশ্য হয়েছে। সম্প্রতি যাঁর অধিকারে সেটা এসেছে তিনি নিশ্চয়ই সেটাকে সোনা বলে ঠাউরেছেন, নইলে পরকাল খোয়াতে যাবেন কোন্ সাধে। জান তো তুচ্ছ একটা জিনিস নড়ে গেলে দাদার বিপুল সম্পত্তির ভিতটাতে যেন নাড়া লাগে, সে তিনি সইতে পারেন না। আজ সকালে আপিসে যাবার সময় আমাকে বলে গেলেন শ্যামাকে দেশে পাঠাতে। আমি খুব উৎসাহের সঙ্গেই সেই পবিত্র কাজে লেগেছিলুম। ঠিক করেছিলুম তিনি আপিস থেকে ফেরবার আগেই কাজ সেরে রাখব। এমন সময়ে বেলা দেড়টার সময় হঠাৎ দাদা এক দমে আমার ঘরে এসে ঢুকে পড়লেন; বললেন, 'এখনকার মতো থাক্।' যেই ঘর থেকে বেরোতে যাচ্ছেন, আমার ডেস্কের উপর বউরানীর সেই ছবিটি চোখে পড়ল। থমকে গেলেন। বুঝলুম আড়-চাহনিটাকে সিধে করে নিয়ে ছবিটিকে দেখতে দাদার লজ্জা বোধ হচ্ছে। বললুম, 'দাদা, একটু ব'সো, একটা ঢাকাই কাপড় তোমাকে দেখাতে চাই। মোতির মার ছোটো ভাজের সাধ, তাই তাকে দিতে হবে। কিন্তু গণেশরাম দামে আমাকে ঠকাচ্ছে বলে বোধ হচ্ছে। তোমাকে দিয়ে সেটা একবার দেখিয়ে নিতে চাই। আমার যতটা আন্দাজ তাতে মনে হয় না তো তেরো টাকা তার দাম হতে পারে। খুব বেশি হয় তো ন-টাকা সাড়ে ন-টাকার মধ্যেই হওয়া উচিত।' "

মোতির মা অবাক হয়ে বললে, "ও আবার তোমার মাথায় কোথা থেকে এল? আমার ছোটো ভাজের সাধ হবার কোনো উপায়ই নেই। তার কোলের ছেলেটির বয়স তো সবে দেড় মাস। বানিয়ে বলতে তোমার আজকাল দেখছি কিছুই বাধে না। এই তোমার নতুন বিদ্যে পেলে কোথায়?"

"যেখান থেকে কালিদাস তাঁর কবিত্ব পেয়েছেন, বাণী বীণাপাণির কাছ থেকে।"

"বীণাপাণি তোমাকে যতক্ষণ না ছাড়েন ততক্ষণ তোমাকে নিয়ে ঘর করা যে দায় হবে।"

"পণ করেছি, স্বর্গারোহণকালে নরকদর্শন করে যাব, বউরানীর চরণে এই আমার দান।"

"কিন্তু সাড়ে ন-টাকা দামের ঢাকাই কাপড় তখন-তখনই তোমার জুটল কোথায়?"

"কোথাও না। কুড়ি মিনিট পরে ফিরে এসে বললুম, 'গণেশরাম সে-কাপড় আমাকে না বলেই ফিরিয়ে নিয়ে গেছে।' দাদার মুখ দেখে বুঝলুম, ইতিমধ্যে ছবিটা তাঁর মগজের মধ্যে ঢুকে স্বপ্নের রূপ ধরেছে। কী জানি কেন, পৃথিবীতে আমারই কাছে দাদার একটু আছে চক্ষুলজ্জা, আর কারও হলে ছবিটা ধাঁ করে তুলে নিতে তাঁর বাধত না।"

"তুমিও তো লোভী কম নয়। দাদাকে না-হয় সেটা দিতেই।"

"তা দিয়েছি, কিন্তু সহজ মনে দিই নি। বললেম, 'দাদা, এই ছবিটা থেকে একটা অয়েলপেন্টিং করিয়ে নিয়ে তোমার শোবার ঘরে রেখে দিলে হয় না?' দাদা যেন উদাসীনভাবে বললে, 'আচ্ছা, দেখা যাবে।' বলেই ছবিটা নিয়ে উপরের ঘরে চলে গেল। তার পরে কী হল ঠিক জানি নে। বোধ করি আপিসে যাওয়া হয় নি, আর ওই ছবিটাও ফিরে পাবার আশা রাখি নে।"

"তোমার বউরানীর জন্যে স্বর্গটাই খোয়াতে যখন রাজি আছ, তখন না-হয় একখানা ছবিই বা খোয়ালে।"

"স্বর্গটা সম্বন্ধে সন্দেহ আছে, ছবিটা সম্বন্ধে একটুও সন্দেহ ছিল না। এমন ছবি দৈবাৎ হয়। যে-দুর্লভ লগ্নে ওঁর মুখটিতে লক্ষ্মীর প্রসাদ সম্পূর্ণ

নেমেছিল ঠিক সেই শুভযোগটি ওই ছবিতে ধরা পড়ে গেছে। এক-একদিন রাত্তিরে ঘুম থেকে উঠে আলো জ্বালিয়ে ওই ছবিটি দেখেছি। প্রদীপের আলোয় ওর ভিতরকার রূপটি যেন আরও বেশি করে দেখা যায়।”

“দেখো, আমার কাছে অত বাড়াবাড়ি করতে তোমার একটুও ভয় নেই?”

“ভয় যদি থাকত তাহলেই তোমার ভাবনার কথাও থাকত। ওঁকে দেখে আমার আশ্চর্য কিছুতে ভাঙে না। মনে করি আমাদের ভাগ্যে এটা সম্ভব হল কী করে? আমি যে ওঁকে বউরানী বলতে পারছি এ ভাবলে গায়ে কাঁটা দেয়। আর উনি যে সামান্য নবীনের মতো মানুষকেও হাসিমুখে কাছে বসিয়ে খাওয়াতে পারেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এও এত সহজ হল কী করে? আমাদের পরিবারের মধ্যে সব চেয়ে হতভাগ্য আমার দাদা। যাকে সহজে পেলেন তাকে কঠিন করে বাঁধতে গিয়েই হারালেন।”

“বাস্ রে, বউরানীর কথায় তোমার মুখ যখন খুলে যায় তখন থামতে চায় না।”

“মেজোবউ, জানি, তোমার মনে একটুখানি বাজে।”

“না, কক্‌খনো না।”

“হাঁ, অল্প একটু। কিন্তু এই উপলক্ষ্যে একটা কথা মনে করিয়ে দেওয়া ভালো। নুরনগরে স্টেশনে প্রথম বউরানীর দাদাকে দেখে যে-সব কথা বলেছিলে চলতি ভাষায় তাকেও বাড়াবাড়ি বলা চলে।”

“আচ্ছা আচ্ছা, ও-সব তর্ক থাক্, এখন কী বলতে চাচ্ছিলে বলো।”

“আমার বিশ্বাস, আজকালের মধ্যেই দাদা বউরানীকে ডেকে পাঠাবেন। বউরানী যে এত আগ্রহে বাপের বাড়ি চলে এলেন, আর তার পর থেকে এতদিন ফেরবার নাম নেই, এতে দাদার প্রচণ্ড অভিমান হয়েছে তা

জানি। দাদা কিছুতেই বুঝতে পারেন না সোনার খাঁচাতে পাখির কেন লোভ নেই। নির্বোধ পাখি, অকৃতজ্ঞ পাখি!"

"তা ভালোই তো, বড়ঠাকুর ডেকেই পাঠান না। সেই কথাই তো ছিল।"

"আমার মনে হয়, ডাকবার আগেই বউরানী যদি যান ভালো হয়, দাদার ওইটুকু অভিমানের না-হয় জিত রইল। তা ছাড়া বিপ্রদাসবাবু তো চান বউরানী তাঁর সংসারে ফিরে যান, আমিই নিষেধ করেছিলুম।"

বিপ্রদাসের সঙ্গে এই নিয়ে আজ কী কথা হয়েছে মোতির মা তার কোনো আভাস দিলে না। বললে, "বিপ্রদাসবাবুর কাছে গিয়ে বলোই না।"

"তাই যাই, তিনি শুনলে খুশি হবেন।"

এমন সময় কুমু দরজার বাইরে থেকে বললে, "ঘরে ঢুকব কী?"

মোতির মা বললে, "তোমার ঠাকুরপো পথ চেয়ে আছেন।"

"জন্ম-জন্ম পথ চেয়ে ছিলুম, এইবার দর্শন পেলুম।"

"আঃ ঠাকুরপো, এত কথা তুমি বানিয়ে বলতে পার কী করে?"

"নিজেই আশ্চর্য হয়ে যাই, বুঝতে পারি নে।"

"আচ্ছা, চলো এখন খেতে যাবে।"

"খাবার আগে একবার তোমার দাদার সঙ্গে কিছু কথাবার্তা কয়ে আসি গে।"

"না, সে হবে না।"

"কেন?"

"আজ দাদা অনেক কথা বলেছেন, আজ আর নয়।"

"ভালো খবর আছে।"

"তা হোক, কাল এসো বরঞ্চ। আজ কোনো কথা নয়।"

"কাল হয়তো ছুটি পাব না, হয়তো বাধা ঘটবে। দোহাই তোমার, আজ একবার কেবল পাঁচ মিনিটের জন্যে। তোমার দাদা খুশি হবেন, কোনো ক্ষতি হবে না তাঁর।"

"আচ্ছা, আগে তুমি খেয়ে নাও, তার পরে হবে।"

খাওয়া হয়ে গেলে পর কুমু নবীনকে বিপ্রদাসের ঘরে নিয়ে এল। দেখলে দাদা তখনো ঘুমোয় নি। ঘর প্রায় অন্ধকার, আলোর শিখা ম্লান। খোলা জানলা দিয়ে তারা দেখা যায়; থেকে থেকে হু হু করে বইছে দক্ষিণের হাওয়া; ঘরের পর্দা, বিছানার ঝালর, আলনায় ঝোলানো বিপ্রদাসের কাপড় নানারকম ছায়া বিস্তার করে কেঁপে কেঁপে উঠছে, মেজের উপর খবরের কাগজের একটা পাতা যখন-তখন এলোমেলো উড়ে বেড়াচ্ছে। আধ-শোওয়া অবস্থায় বিপ্রদাস স্থির হয়ে বসে। এগোতে নবীনের পা সরে না। প্রদোষের ছায়া আর রোগের শীর্ণতা বিপ্রদাসকে একটা আবরণ দিয়েছে, মনে হচ্ছে ও যেন সংসার থেকে অনেক দূর, যেন অন্য লোকে। মনে হল ওর মতো এমনতরো একলা মানুষ আর জগতে নেই।

নবীন এসে বিপ্রদাসের পায়ের ধুলো নিয়ে বললে, "বিশ্রামে ব্যাঘাত করতে চাই নে। একটি কথা বলে যাব। সময় হয়েছে, এইবার বউরানী ঘরে ফিরে আসবেন বলে আমরা চেয়ে আছি।"

বিপ্রদাস কোনো উত্তর করলে না, স্থির হয়ে বসে রইল।

খানিক পরে নবীন বললে, "আপনার অনুমতি পেলেই ওঁকে নিয়ে যাবার বন্দোবস্ত করি।"

ইতিমধ্যে কুমু ধীরে ধীরে দাদার পায়ের কাছে এসে বসেছে। বিপ্রদাস তার মুখের উপর দৃষ্টি রেখে বললে, "মনে যদি করিস তোর যাবার সময় হয়েছে তা হলে যা কুমু।"

কুমু বললে, "না দাদা, যাব না।" বলে বিপ্রদাসের হাঁটুর উপর উপুড় হয়ে পড়ল।

ঘর স্তব্ধ, কেবল থেকে থেকে দমকা বাতাসে একটা শিথিল জানলা খড়্ খড়্ করছে, আর বাইরে বাগানে গাছের পাতাগুলো মর্মরিয়ে উঠছে।

কুমু একটু পরে বিছানা থেকে উঠেই নবীনকে বললে, "চলো, আর দেরি নয়। দাদা, তুমি ঘুমোও।"

মোতির মা বাড়িতে ফিরে এসে বললে, "এতটা কিন্তু ভালো না।"

"অর্থাৎ চোখে খোঁচা দেওয়াটা যেমনি হোক না, চোখটা রাঙা হয়ে ওঠা একেবারেই ভালো নয়।"

"না গো না, ওটা ওঁদের দেমাক। সংসারে ওঁদের যোগ্য কিছুই মেলে না, ওঁরা সবার উপরে।"

"মেজোবউ, এতবড়ো দেমাক সবাইকে সাজে না, কিন্তু ওঁদের কথা আলাদা।"

"তাই বলে কি আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি করতে হবে?"

"আত্মীয়স্বজন বললেই আত্মীয়স্বজন হয় না। ওঁরা আমাদের থেকে সম্পূর্ণ আর-এক শ্রেণীর মানুষ। সম্পর্ক ধরে ওঁদের সঙ্গে ব্যবহার করতে আমার সংকোচ হয়।"

"যিনি যতবড়ো লোকই হোন না কেন, তবু সম্পর্কের জোর আছে এটা মনে রেখো।"

নবীন বুঝতে পারলে, এই আলোচনার মধ্যে কুমুর 'পরে মোতির মার একটুখানি ঈর্ষার ঝাঁজও আছে। তা ছাড়া এটাও সত্যি, পারিবারিক বাঁধনটার দাম মেয়েদের কাছে খুবই বেশি। তাই নবীন এ নিয়ে বৃথা তর্ক না করে বললে, "আর কিছুদিন দেখাই যাক না। দাদার আগ্রহটাও একটু বেড়ে উঠুক, তাতে ক্ষতি হবে না।"

৫৩

মধুসূদনের সংসারে তার স্থানটা পাকা হয়েছে বলেই শ্যামাসুন্দরী প্রত্যাশা করতে পারত, কিন্তু সে-কথা অনুভব করতে পারছে না। বাড়ির চাকরবাকরদের 'পরে ওর কর্তৃত্বের দাবি জন্মেছে বলে প্রথমটা ও মনে করেছিল কিন্তু পদে পদে বুঝতে পারছে যে তারা ওকে মনে মনে প্রভুপদে বসাতে রাজি নয়। ওকে সাহস করে প্রকাশ্যে অবজ্ঞা দেখাতে পারলে তারা যেন বাঁচে এমনি অবস্থা। সেইজন্যেই শ্যামা তাদেরকে যখন তখন অনাবশ্যক ভর্ৎসনা ও অকারণে ফরমাশ করে, কেবলই তাদের দোষত্রুটি ধরে। খিট্ খিট্ করে। বাপ-মা তুলে গাল দেয়। কিছুদিন পূর্বে এই বাড়িতেই শ্যামা নগণ্য ছিল, সেই স্মৃতিটাকে সংসার থেকে মুছে ফেলবার জন্যে খুব কড়াভাবে মাজাঘষার কাজ করতে গিয়ে দেখে যে সেটা সয় না। বাড়ির একজন পুরোনো চাকর শ্যামার তর্জন না সইতে পেরে কাজে ইস্তফা দিলে। তাই নিয়ে শ্যামাকে মাথা হেঁট করতে হল। তার কারণ, নিজের ধনভাগ্য সম্বন্ধে মধুসূদনের কতকগুলো অন্ধ সংস্কার আছে। যে-সব চাকর তার আর্থিক উন্নতির সমকালবর্তী তাদের মৃত্যু বা পদত্যাগকে ও দুর্লক্ষণ মনে করে। অনুরূপ কারণেই সেই সময়কার একটা মসীচিহ্নিত অত্যন্ত পুরোনো ডেস্ক্ অসংগতভাবে আপিস-ঘরে হাল আমলের দামি আসবাবের মাঝখানেই অসংকোচে প্রতিষ্ঠিত আছে, তার উপরে সেই সেদিনকারই দস্তার দোয়াত আর একটা সস্তা বিলিতি কাঠের কলম, যে-কলমে সে তার ব্যবসায়ের নবযুগে প্রথম বড়ো একটা দলিলে নাম-সই করেছিল। সেই সময়কার উড়ে চাকর দধি যখন কাজে জবাব দিলে মধুসূদন সেটা গ্রাহ্যই করলে না, উলটে সে-লোকটার ভাগ্যে বকশিশ জুটে গেল। শ্যামাসুন্দরী এই নিয়ে ঘোরতর অভিমান করতে গিয়ে

দেখে হালে পানি পায় না। দধির হাসিমুখ তাকে দেখতে হল। শ্যামার মুশকিল এই, মধুসূদনকে সে সত্যিই ভালোবাসে, তাই মধুসূদনের মেজাজের উপর বেশি চাপ দিতে ওর সাহস হয় না, সোহাগ কোন্ সীমায় স্পর্ধায় এসে পৌঁছবে খুব ভয়ে ভয়ে তারই আন্দাজ করে চলে। মধুসূদনও নিশ্চিত জানে, শ্যামার সম্বন্ধে সময় বা ভাবনা নষ্ট করবার দরকার নেই। আদর-আবদার-ঘটিত অপব্যয়ের পরিমাণ সংকোচ করলেও দুর্ঘটনার আশঙ্কা অল্প। অথচ শ্যামাকে নিয়ে ওর একটা স্থূলরকম মোহ আছে, কিন্তু সেই মোহকে ষোলো আনা ভোগে লাগিয়েও তাকে অনায়াসে সামলিয়ে চলতে পারে এই আনন্দে মধুসূদন উৎসাহ পায়—এর ব্যতিক্রম হলে বন্ধন ছিঁড়ে যেত। কর্মের চেয়ে মধুসূদনের কাছে বড়ো কিছু নেই। সেই কর্মের জন্যে ওর সব চেয়ে দরকার অবিচলিত আত্মকর্তৃত্ব। তারই সীমার মধ্যে শ্যামার কর্তৃত্ব প্রবেশ করতে সাহস পায় না, অল্প একটু পা বাড়াতে গিয়ে উঁচোট খেয়ে ফিরে আসে। শ্যামা তাই কেবলই আপনাকে দানই করে, দাবি করতে গিয়ে ঠকে। টাকাকড়ি-সাজসরঞ্জামে শ্যামা চিরদিন বঞ্চিত—তার 'পরে ওর লোভের অন্ত নেই। এতেও তাকে পরিমাণ রক্ষা করে চলতে হয়। এতবড়ো ধনীর কাছে যা অনায়াসে প্রত্যাশা করতে পারত তাও ওর পক্ষে দুরাশা। মধুসূদন মাঝে মাঝে এক-একদিন খুশি হয়ে ওকে কাপড়চোপড় গহনাপত্র কিছু কিছু এনে দেয়, তাতে ওর সংগ্রহের ক্ষুধা মেটে না। ছোটোখাটো লোভের সামগ্রী আত্মসাৎ করবার জন্যে কেবলই হাত চঞ্চল হয়ে ওঠে। সেখানেও বাধা। এইরকমেরই একটা সামান্য উপলক্ষ্যে কিছুদিন আগে ওর নির্বাসনের ব্যবস্থা হয়; কিন্তু শ্যামার সঙ্গ ও সেবা মধুসূদনের অভ্যস্ত হয়ে এসেছিল—পানতামাকের অভ্যাসেরই মতো সস্তা অথচ প্রবল। সেটাতে ব্যাঘাত ঘটলে মধুসূদনের কাজেরই ব্যাঘাত ঘটবে আশঙ্কায়,

এবারকার মতো শ্যামার দণ্ড রদ হল। কিন্তু দণ্ডের ভয় মাথার উপর ঝুলতে লাগল।

নিজের এইরকম দুর্বল অধিকারের মধ্যে শ্যামাসুন্দরীর মনে একটা আশঙ্কা লেগেই ছিল কবে আবার কুমু আপন সিংহাসনে ফিরে আসে। এই ঈর্ষার পীড়নে তার মনে একটুও শান্তি নেই। জানে কুমুর সঙ্গে ওর প্রতিযোগিতা চলবেই না, ওরা এক ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে নেই। কুমু মধুসূদনের আয়ত্তের অতীত, সেইখানেই তার অসীম জোর; আর শ্যামা তার এত বেশি আয়ত্তের মধ্যে যে, তার ব্যবহার আছে মূল্য নেই। এই নিয়ে শ্যামা অনেক কান্নাই কেঁদেছে, কতবার মনে করেছে আমার মরণ হলেই বাঁচি। কপাল চাপড়ে বলেছে, এত বেশি সস্তা হলুম কেন? তার পরে ভেবেছে, সস্তা বলেই জায়গা পেলুম, যার দর বেশি তার আদর বেশি, যে সস্তা সে হয়তো সস্তা বলেই জেতে।

মধুসূদন যখন শ্যামাকে গ্রহণ করে নি, তখন শ্যামার এত অসহ্য দুঃখ ছিল না। সে আপন উপবাসী ভাগ্যকে একরকম করে মেনে নিয়েছিল। মাঝে মাঝে সামান্য খোরাককেই যথেষ্ট মনে হত। আজ অধিকার পাওয়া আর না-পাওয়ার মধ্যে সামঞ্জস্য কিছুতেই ঘটছে না। হারাই-হারাই ভয়ে মন আতঙ্কিত। ভাগ্যের রেল-লাইন এমন কাঁচা করে পাতা যে, ডিরেলের ভয় সর্বত্রই এবং প্রতি মুহূর্তেই। মোতির মার কাছে মন খোলাখুলি করে সান্ত্বনা পাবার জন্যে একবার চেষ্টা করেছিল। সে এমনি একটা ঝাঁজের সঙ্গে মাথা-ঝাঁকানি দিয়ে পাশ কাটিয়ে গেছে যে, তার একটা কোনো সাংঘাতিক শোধ তুলতে পারলে এখনই তুলত, কিন্তু জানে সংসার-ব্যবস্থায় মধুসূদনের কাছে মোতির মার দাম আছে, সেখানে একটুও নাড়া সইবে না। সেই অবধি দুজনের কথা বন্ধ, পারতপক্ষে মুখ-দেখাদেখি নেই। এমনি করে এ-বাড়িতে শ্যামার

স্থান পূর্বের চেয়ে আরও সংকীর্ণ হয়ে গেছে। কোথাও তার একটুও স্বচ্ছন্দতা নেই।

এমন সময় একদিন সন্ধ্যেবেলায় শোবার ঘরে এসে দেখে, টেবিলের উপর দেয়ালে হেলানো কুমুর ফটোগ্রাফ। যে-বজ্র মাথায় পড়বে তারই বিদ্যুৎশিখা ওর চোখে এসে পড়ল। যে-মাছকে বঁড়শি বিঁধেছে তারই মতো করে ওর বুকের ভিতরটা ধড়্‌ফড়্‌ ধড়্‌ফড়্‌ করতে লাগল। ইচ্ছা করে, ছবিটা থেকে চোখ ফিরিয়ে নেয়, পারে না। একদৃষ্টে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে থাকল, মুখ বিবর্ণ, দুই চোখে একটা দাহ, মুঠো দৃঢ় করে বন্ধ। একটা-কিছু ভাঙতে, একটা-কিছু ছিঁড়ে ফেলতে চায়। এ ঘরে থাকলে এখনই কিছু-একটা লোকসান করে ফেলবে এই ভয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল। আপনার ঘরে গিয়ে বিছানার উপর উপুড় হয়ে পড়ে চাদরখানা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ছিঁড়ে ফেললে।

রাত হয়ে এল। বাইরে থেকে বেহারা খবর দিলে, মহারাজ শোবার ঘরে ডেকে পাঠিয়েছেন। বলবার শক্তি নেই যে যাব না। তাড়াতাড়ি উঠে মুখ ধুয়ে একটা বুটিদার ঢাকাই শাড়ি পরে গায়ে একটু গন্ধ মেখে গেল শোবার ঘরে। ছবিটা যাতে চোখে না পড়ে এই তার চেষ্টা। কিন্তু ঠিক সেই ছবিটার সামনেই বাতি—সমস্ত আলো যেন কারও দীপ্ত দৃষ্টির মতো ওই ছবিকে উদ্‌ভাসিত করে আছে। সমস্ত ঘরের মধ্যে ওই ছবিটিই সব চেয়ে দৃশ্যমান। শ্যামা নিয়মমতো পানের বাটা নিয়ে মধুসূদনকে পান দিলে, তার পরে পায়ের কাছে বসে পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। যে-কোনো কারণেই হোক আজ মধুসূদন প্রসন্ন ছিল। বিলাতি দোকানের থেকে একটা রুপোর ফটোগ্রাফের ফ্রেম কিনে এনেছিল। গম্ভীরভাবে শ্যামাকে বললে, "এই নাও।" শ্যামাকে সমাদর করবার উপলক্ষ্যেও মধুসূদন মধুর রসের অবতারণায় যথেষ্ট কার্পণ্য করে।

কেননা সে জানে ওকে অল্প একটু প্রশ্রয় দিলেই ও আর মর্যাদা রাখতে পারে না। ব্রাউন কাগজে জিনিসটা মোড়া ছিল। আস্তে আস্তে কাগজের মোড়কটা খুলে ফেলে বললে, "কী হবে এটা ?"

মধুসূদন বললে, "জান না, এতে ফটোগ্রাফ রাখতে হয়।"

শ্যামার বুকের ভিতরটাতে কে যেন চাবুক চালিয়ে দিলে, বললে, "কার ফটোগ্রাফ রাখবে ?"

"তোমার নিজের। সেদিন যে ছবিটা তোলানো হয়েছে।"

"আমার এত সোহাগে কাজ নেই।" বলে সেই ফ্রেমটা ছুঁড়ে মেজের উপর ফেলে দিলে।

মধুসূদন আশ্চর্য হয়ে বললে, "এর মানে কী হল ?"

"এর মানে কিছুই নেই।" বলে মুখে হাত দিয়ে কেঁদে উঠল, তার পরে বিছানা থেকে মেজের উপর পড়ে মাথা ঠুকতে লাগল। মধুসূদন ভাবল, শ্যামার কম দামের জিনিস পছন্দ হয় নি, ওর বোধ করি ইচ্ছে ছিল একটা দামি গয়না পায়। সমস্ত দিন আপিসের কাজ সেরে এসে এই উপদ্রবটা একটুও ভালো লাগল না। এ-যে প্রায় হিস্‌টিরিয়া। হিস্‌টিরিয়ার 'পরে ওর বিষম অবজ্ঞা। খুব একটা ধমক দিয়ে বললে, "ওঠো বলছি, এখনই ওঠো !"

শ্যামা উঠে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মধুসূদন বললে, "এ কিছুতেই চলবে না।"

মধুসূদন শ্যামাকে বিশেষ ভাবেই জানে। নিশ্চয় ঠাওরেছিল একটু পরেই ফিরে এসে পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ে মাপ চাইবে—সেই সময়ে খুব শক্ত করে দুটো কথা শুনিয়ে দিতে হবে।

দশটা বাজল, শ্যামা এল না। আর-একবার শ্যামার ঘরের দরজার বাইরে থেকে আওয়াজ এল, "মহারাজ বোলায়া।"

শ্যামা বললে, "মহারাজকে বলো আমার অসুখ করেছে।"

মধুসূদন ভাবলে, 'আস্পর্ধা তো কম নয়, হুকুম করলে আসে না!'

মনে ঠিক করে রেখেছিল আরও খানিক বাদে আসবে। তাও এল না। এগারোটা বাজতে মিনিট পনেরো বাকি। বিছানা ছেড়ে মধুসূদন দ্রুতপদে শ্যামার ঘরে গিয়ে ঢুকল। দেখলে ঘরে আলো নেই। অন্ধকারে বেশ দেখা গেল—শ্যামা মেজের উপর পড়ে আছে। মধুসূদন ভাবলে এ-সমস্ত কেবল আদর কাড়বার জন্যে।

গর্জন করে বললে, "উঠে এস বলছি, শীঘ্র উঠে এস। ন্যাকামি কোরো না।"

শ্যামা কিছু না বলে উঠে এল।

৫৪

পরদিন আপিসে যাবার আগে খাবার পরে শোবার ঘরে বিশ্রাম করতে এসেই মধুসূদন দেখলে ছবিটি নেই। অন্য দিনের মতো আজ শ্যামা পান নিয়ে মধুসূদনের সেবার জন্যে আগে থাকতে প্রস্তুত ছিল না। আজ সে অনুপস্থিতও। তাকে ডেকে পাঠানো হল। বেশ বোঝা গেল একটু কুণ্ঠিতভাবেই সে এল। মধুসূদন জিজ্ঞাসা করলে, "টেবিলের উপর ছবি ছিল, কী হল।"

শ্যামা অত্যন্ত বিস্ময়ের ভান করে বললে, "ছবি! কার ছবি?"

ভানের পরিমাণটা কিছু বেশি হয়ে পড়ল। সাধারণত পুরুষদের বুদ্ধিবৃত্তির 'পরে মেয়েদের অশ্রদ্ধা আছে বলেই এতটা সম্ভব হয়েছিল।

মধুসূদন ক্রুদ্ধস্বরে বললে, "ছবিটা দেখ নি।"

শ্যামা নিতান্ত ভালোমানুষের মতো মুখ করে বললে, "না, দেখি নি তো।"

মধুসূদন গর্জন করে বলে উঠল, "মিথ্যে কথা বলছ।"

"মিথ্যে কথা কেন বলব, ছবি নিয়ে আমি করব কী।"

"কোথায় রেখেছ বের করে নিয়ে এস বলছি! নইলে ভালো হবে না।"

"ওমা! কী আপদ! তোমার ছবি আমি কোথায় পাব যে বের করে আনব।"

বেহারাকে ডাক পড়ল। মধু তাকে বললে, "মেজোবাবুকে ডেকে আন্।"

নবীন এল। মধুসূদন বললে, "বড়োবউকে আনিয়ে নাও।"

শ্যামা মুখ বাঁকিয়ে কাঠের পুতুলের মতো চুপ করে বসে রইল।

নবীন খানিকক্ষণ পরে মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললে, "দাদা, ওখানে একবার কি তোমার নিজে যাওয়া উচিত হবে না? তুমি আপনি গিয়ে যদি বল তা হলে বউরানী খুশি হবেন।"

মধুসূদন গম্ভীরভাবে খানিকক্ষণ গুড়্গুড়ি টেনে বললে, "আচ্ছা, কাল রবিবার আছে, কাল যাব।"

নবীন মোতির মার কাছে এসে বললে, "একটা কাজ করে ফেলেছি।"

"আমার পরামর্শ না নিয়েই।"

"পরামর্শ নেবার সময় ছিল না।"

"তাহলে তো দেখছি তোমাকে পস্তাতে হবে।"

"অসম্ভব নয়। কুষ্ঠিতে আমার বুদ্ধিস্থানে আর কোনো গ্রহ নেই, আছেন নিজের স্ত্রী। এইজন্য সর্বদা তোমাকে হাতের কাছে রেখেই চলি। ব্যাপারটা হচ্ছে এই—দাদা আজ হুকুম করলেন বউরানীকে আনানো চাই। আমি ফস্ করে বলে বসলেম, তুমি নিজে গিয়ে যদি কথাটা তোল ভালো হয়। দাদা কী মেজাজে ছিলেন রাজি হয়ে গেলেন। তার পর থেকেই ভাবছি এর ফলটা কী হবে।"

"ভালো হবে না। বিপ্রদাসবাবুর যে-রকম ভাবখানা দেখলুম কী বলতে কী বলবেন, শেষকালে কুরুক্ষেত্রের লড়াই বেধে যাবে। এমন কাজ করলে কেন ?"

"প্রথম কারণ, বুদ্ধির কোঠা ঠিক সেই সময়টাতেই শূন্য ছিল, তুমি ছিলে অন্যত্র। দ্বিতীয় হচ্ছে, সেদিন বউরানী যখন বললেন, আমি যাব না, তার ভিতরকার মানেটা বুঝেছিলুম। তাঁর দাদা রুগ্ন শরীর নিয়ে কলকাতায় এলেন, তবু এক দিনের জন্যে মহারাজ দেখতে গেলেন না— এই অনাদরটা তাঁর মনে সব চেয়ে বেজেছিল।"

শুনেই মোতির মা একটু চমকে উঠল, কথাটা কেন যে আগে তার মনে পড়ে নি এইটেই তার আশ্চর্য লাগল। আসলে নিজের অগোচরেও শ্বশুরবাড়ির মাহাত্ম্য নিয়ে ওর একটা অহংকার আছে। অন্য সাধারণ লোকের মতো মহারাজ মধুসূদনেরও কুটুম্বিতার দায়িত্ব আছে এ-কথা তার মন বলে না।

সেদিনকার তর্কের অনুবৃত্তিস্বরূপে নবীন একটুখানি টিপ্পনী দিয়ে বললে, "নিজের বুদ্ধিতে কথাটা আমার হয়তো মনে আসত না, তুমিই আমাকে মনে করিয়ে দিয়েছিলে।"

"কী রকম শুনি ?"

"ওই-যে সেদিন বললে, কুটুম্বিতার দায়িত্ব আত্মমর্যাদার দায়িত্বের চেয়েও বড়ো। তাই মনে করতে সাহস হল যে মহারাজার মতো অতবড়ো লোকেরও বিপ্রদাসবাবুকে দেখতে যাওয়া উচিত।"

মোতির মা হার মানতে রাজি নয়, কথাটাকে উড়িয়ে দিলে, "কাজের সময় এত বাজে কথাও বলতে পার! কী করা উচিত এখন সেই কথাটা ভাবো দেখি।"

"গোড়াতেই সকল কথার শেষ পর্যন্ত ভাবতে গেলে ঠকতে হয়। আশু

ভাবা উচিত প্রথম কর্তব্যটা কী। সেটা হচ্ছে বিপ্রদাসবাবুকে দাদার দেখতে যাওয়া। দেখতে গিয়ে তার ফলে যা হতে পারে তার উপায় এখনই চিন্তা করতে বসলে তাতে চিন্তাশীলতার পরিচয় দেওয়া হবে; কিন্তু সেটা হবে অতিচিন্তাশীলতা।"

"কী জানি আমার বোধ হচ্ছে মুশকিল বাধবে।"

৫৫

সেদিন সকালে অনেকক্ষণ ধরে কুমু তার দাদার ঘরে বসে গানবাজনা করেছে। সকালবেলাকার সুরে নিজের ব্যক্তিগত বেদনা বিশ্বের জিনিস হয়ে অসীমরূপে দেখা দেয়। তার বন্ধনমুক্তি ঘটে। সাপগুলো যেন মহাদেবের জটায় প্রকাশ পায় ভূষণ হয়ে। ব্যথার নদীগুলি ব্যথার সমুদ্রে গিয়ে বৃহৎ বিরাম লাভ করে। তার রূপ বদলে যায়, চঞ্চলতা লুপ্ত হয় গভীরতায়। বিপ্রদাস নিশ্বাস ছেড়ে বললে, "সংসারে ক্ষুদ্র কালটাই সত্য হয়ে দেখা দেয় কুমু, চিরকালটা থাকে আড়ালে; গানে চিরকালটাই আসে সামনে, ক্ষুদ্র কালটা যায় তুচ্ছ হয়ে, তাতেই মন মুক্তি পায়।"

এমন সময়ে খবর এল, "মহারাজ মধুসূদন এসেছেন।"

এক মুহূর্তে কুমুর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল; তাই দেখে বিপ্রদাসের মনে বড়ো বাজল, বললে, "কুমু তুই বাড়ির ভিতরে যা। তোকে হয়তো দরকার হবে না।"

কুমু দ্রুতপদে চলে গেল। মধুসূদন ইচ্ছে করেই খবর না দিয়েই এসেছে। এ-পক্ষ আয়োজনের দৈন্য ঢাকা দেবার অবকাশ না পায় এটা তার সংকল্পের মধ্যে। বড়ো ঘরের লোক ব'লে বিপ্রদাসের মনের মধ্যে একটা বড়াই আছে ব'লে মধুসূদনের বিশ্বাস। সেই কল্পনাটা সে সইতে

পারে না। তাই আজ সে এমনভাবে এল যেন দেখা করতে আসে নি, দেখা দিতে এসেছে।

মধুসূদনের সাজটা ছিল বিচিত্র, বাড়ির চাকর-দাসীরা অভিভূত হবে এমনতরো বেশ। ডোরাকাটা বিলিতি শার্টের উপর একটা রঙিন ফুলকাটা সিল্কের ওয়েস্ট্‌কোট, কাঁধের উপর পাট-করা চাদর, যত্নে কোঁচানো কালাপেড়ে শান্তিপুরে ধুতি, বার্নিশ-করা কালো দরবারি জুতো, বড়ো বড়ো হীরেপান্নাওআলা আংটিতে আঙুল ঝলমল করছে। প্রশস্ত উদরের পরিধি বেষ্টন করে মোটা সোনার ঘড়ির শিকল, হাতে একটি শৌখিন লাঠি, তার সোনার হাতলটি হাতির মুণ্ডের আকারে নানা জহরতে খচিত। একটা অসমাপ্ত নমস্কারের দ্রুত আভাস দিয়ে খাটের পাশের একটা কেদারায় বসে বললে, "কেমন আছেন বিপ্রদাসবাবু, শরীরটা তো তেমন ভালো দেখাচ্ছে না।"

বিপ্রদাস তার কোনো উত্তর না দিয়ে বললে, "তোমার শরীর ভালোই আছে দেখছি।"

"বিশেষ ভালো যে তা বলতে পারি নে— সন্ধ্যের দিকটা মাথা ধরে, আর খিদেও ভালো হয় না। খাওয়াদাওয়ার অল্প একটু অযত্ন হলেই সইতে পারি নে। আবার অনিদ্রাতেও মাঝে মাঝে ভুগি, ওইটেতে সব চেয়ে দুঃখ দেয়।"

শুশ্রূষার লোকের যে সর্বদা দরকার তারই ভূমিকা পাওয়া গেল।

বিপ্রদাস বললে, "বোধ করি আপিসের কাজ নিয়ে বেশি পরিশ্রম করতে হচ্ছে।"

"এমনিই কী! আপিসের কাজকর্ম আপনিই চলে যাচ্ছে, আমাকে বড়ো কিছু দেখতে হয় না। ম্যাকৃনটন সাহেবের উপরেই বেশির ভাগ কাজের ভার, সার আর্থর পীবডিও আমাকে অনেকটা সাহায্য করেন।

গুড়গুড়ি এল, পানের বাটায় পান ও মসলা নিয়ে চাকর এসে দাঁড়াল, তার থেকে একটি ছোটো এলাচ নিয়ে মুখে পুরল, আর কিছু নিলে না। গুড়গুড়ির নল নিয়ে দুই-একবার মৃদু মৃদু টান দিলে। তার পরে গুড়গুড়ির নলটা বাঁ হাতে কোলের উপরেই ধরা রইল। আর তার ব্যবহার হল না। অন্তঃপুর থেকে খবর এল, জলখাবার প্রস্তুত। ব্যস্ত হয়ে বললে, "ওইটি তো পারব না। আগেই তো বলেছি, খাওয়াদাওয়া সম্বন্ধে খুব ধরকাট করেই চলতে হয়।"

বিপ্রদাস দ্বিতীয়বার অনুরোধ করলে না। চাকরকে বললে, "পিসি-মাকে বলো গে, ওঁর শরীর ভালো নেই, খেতে পারবেন না।"

বিপ্রদাস চুপ করে রইল। মধুসূদন আশা করেছিল, কুমুর কথা আপনিই উঠবে। এতদিন হয়ে গেল, এখন কুমুকে শ্বশুরবাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার প্রস্তাব বিপ্রদাস আপনিই উদ্বিগ্ন হয়ে করবে—কিন্তু কুমুর নামও করে না যে। ভিতরে ভিতরে একটু একটু করে রাগ জন্মাতে লাগল। ভাবলে এসে ভুল করেছি। সমস্ত নবীনের কাণ্ড। এখনই গিয়ে তাকে খুব একটা কড়া শাস্তি দেবার জন্যে মনটা ছট্‌ফট্ করতে লাগল।

এমন সময় সাদাসিধে সরু কালাপেড়ে একখানি শাড়ি পরে মাথায় ঘোমটা টেনে কুমু ঘরে প্রবেশ করলে। বিপ্রদাস এটা আশা করে নি। সে আশ্চর্য হয়ে গেল। প্রথমে স্বামীর, পরে দাদার পায়ের ধুলো নিয়ে কুমু মধুসূদনকে বললে, "দাদার শরীর ক্লান্ত, ওঁকে বেশি কথা কওয়াতে ডাক্তারের মানা। তুমি এই পাশের ঘরে এস।"

মধুসূদনের মুখ লাল হয়ে উঠল। দ্রুত চৌকি থেকে উঠে পড়ল। কোল থেকে গুড়গুড়ির নলটা মাটিতে পড়ে গেল। বিপ্রদাসের মুখের দিকে না চেয়েই বললে, "আচ্ছা, তবে আসি।"

প্রথম ঝোঁকটা হল হন্ হন্ করে গাড়িতে উঠে বাড়িতে চলে যায়। কিন্তু মন পড়েছে বাঁধা। অনেক দিন পরে আজ কুমুকে দেখেছে। ওকে অত্যন্ত সাদাসিধে আটপৌরে কাপড়ে এই প্রথম দেখলে। ওকে এত সুন্দর আর কখনো দেখে নি। এমন সংযত, এত সহজ। মধুসূদনের বাড়িতে ও ছিল পোশাকি মেয়ে, যেন বাইরের মেয়ে, এখানে সে একেবারে ঘরের মেয়ে। আজ যেন ওকে অত্যন্ত কাছের থেকে দেখা গেল। কী স্নিগ্ধ মূর্তি। মধুসূদনের ইচ্ছে করতে লাগল, একটু দেরি না করে এখনই ওকে সঙ্গে করে নিয়ে যায়। ও আমার, ও আমারই, ও আমার ঘরের, আমার ঐশ্বর্যের, আমার সমস্ত দেহমনের, এই কথাটা উলটেপালটে বলতে ইচ্ছে করে।

পাশের ঘরে একটা সোফা দেখিয়ে কুমু যখন বসতে বললে তখন ওকে বসতেই হল। নিতান্ত যদি বাইরের ঘর না হত তা হলে কুমুকে ধরে সোফায় আপনার পাশে বসাত। কুমু না বসে একটা চৌকির পিছনে তার পিঠের উপর হাত রেখে দাঁড়াল। বললে, "আমাকে কিছু বলতে চাও ?"

ঠিক এমন স্বরে প্রশ্নটা মধুসূদনের ভালো লাগল না, বললে, "যাবে না বাড়িতে ?"

"না।"

মধুসূদন চমকে উঠল—বললে, "সে কী কথা !"

"আমাকে তোমার তো দরকার নেই।"

মধুসূদন বুঝলে, শ্যামাসুন্দরীর খবরটা কানে এসেছে, এটা অভিমান। অভিমানটা ভালোই লাগল। বললে, "কী যে বল তার ঠিক নেই। দরকার নেই তো কী। শূন্য ঘর কি ভালো লাগে ?"

এ নিয়ে কথা-কাটাকাটি করতে কুমুর প্রবৃত্তি হল না। সংক্ষেপে আর-একবার বললে, "আমি যাব না।"

"মানে কী? বাড়ির বউ বাড়িতে যাবে না—?"

কুমু সংক্ষেপে বললে, "না।"

মধুসূদন সোফা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "কী! যাবে না! যেতেই হবে!"

কুমু কোনো জবাব করলে না। মধুসূদন বললে, "জান পুলিস ডেকে তোমাকে নিয়ে যেতে পারি ঘাড়ে ধরে! 'না' বললেই হল!"

কুমু চুপ করে রইল। মধুসূদন গর্জন করে বললে, "দাদার স্কুলে নূরনগরি কায়দা শিক্ষা আবার আরম্ভ হয়েছে?"

কুমু দাদার ঘরের দিকে একবার কটাক্ষপাত করে বললে, "চুপ করো, অমন চেঁচিয়ে কথা কোয়ো না।"

"কেন? তোমার দাদাকে সামলে কথা কইতে হবে নাকি? জান এই মুহূর্তে ওকে পথে বার করতে পারি।"

পরক্ষণেই কুমু দেখে ওর দাদা ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। দীর্ঘকায়, শীর্ণদেহ, পাণ্ডুবর্ণ মুখ, বড়ো বড়ো চোখদুটো জ্বালাময়, একটা মোটা সাদা চাদর গা ঢেকে মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে, কুমুকে ডেকে বললে, "আয় কুমু, আয় আমার ঘরে।"

মধুসূদন চেঁচিয়ে উঠল, বললে, "মনে থাকবে তোমার এই আস্পর্ধা! তোমার নূরনগরের নূর মুড়িয়ে দেব তবে আমার নাম মধুসূদন।"

ঘরে গিয়েই বিপ্রদাস বিছানায় শুয়ে পড়ল। চোখ বন্ধ করলে, কিন্তু ঘুমে নয়, ক্লান্তিতে ও চিন্তায়। কুমু শিয়রের কাছে বসে পাখা নিয়ে বাতাস করতে লাগল। এমনি করে অনেকক্ষণ কাটলে পর ক্ষেমা পিসি এসে বললে, "আজ কি খেতে হবে না কুমু? বেলা যে অনেক হল।"

বিপ্রদাস চোখ খুলে বললে, "কুমু, যা খেতে যা। তোর কালুদাকে পাঠিয়ে দে।"

কুমু বললে, "দাদা, তোমার পায়ে পড়ি, এখন কালুদাকে না, একটু ঘুমোবার চেষ্টা করো।"

বিপ্রদাস কিছু না বলে সুগভীর বেদনার দৃষ্টিতে কুমুর মুখের দিকে চেয়ে রইল। খানিক বাদে নিশ্বাস ফেলে আবার চোখ বুজলে। কুমু ধীরে ধীরে বেরিয়ে গিয়ে দরজা দিল ভেজিয়ে।

একটু পরেই কালু খবর পাঠাল যে আসতে চায়। বিপ্রদাস উঠে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসল। কালু বললে, "জামাই এসে অল্পক্ষণ পরেই তো চলে গেল। কী হল বলো তো। কুমুকে ওদের ওখানে ফিরে নিয়ে যাবার কথা কিছু বললে কি?"

"হাঁ বলেছিল। কুমু তার জবাব দিয়েছে, সে যাবে না।"

কালু বিষম ভীত হয়ে বললে, "বল কী দাদা! এ যে সর্বনেশে কথা!"

"সর্বনাশকে আমরা কোনোকালে ভয় করি নে, ভয় করি অসম্মানকে।"

"তা হলে তৈরি হও, আর দেরি নেই। রক্তে আছে, যাবে কোথায়। জানি তো, তোমার বাবা ম্যাজিস্ট্রেটকে তুচ্ছ করতে গিয়ে অন্তত দু-লাখ টাকা লোকসান করেছিলেন। বুক ফুলিয়ে নিজের বিপদ ঘটানো, ও তোমাদের পৈতৃক শখ। ওটা অন্তত আমার বংশে নেই, তাই তোমাদের সাংঘাতিক পাগলামিগুলো চুপ করে সইতে পারি নে। কিন্তু বাঁচব কী করে?"

বিপ্রদাস উঁচু বাঁ-হাঁটুর উপর ডান পা তুলে দিয়ে তাকিয়ায় মাথা রেখে চোখ বুজে খানিকক্ষণ ভাবলে। অবশেষে চোখ খুলে বললে, "দলিলের শর্ত অনুসারে মধুসূদন ছ-মাস নোটিশ না দিয়ে আমার কাছ থেকে টাকা দাবি করতে পারে না। ইতিমধ্যে সুবোধ আষাঢ় মাসের মধ্যেই এসে পড়বে— তখন একটা উপায় হতে পারবে।"

কালু একটু বিরক্ত হয়েই বললে, "উপায় হবে বইকি। বাতি-গুলো এক দমকায় নিবত, সেইগুলো একে একে ভদ্ররকম করে নিববে।"

"বাতি তলার খোপটার মধ্যে এসে জলছে, এখন যে-ফরাস এসে তাকে যে-রকম ফুঁ দিয়েই নেবাক না—তাতে বেশি হা-হুতাশ করবার কিছু নেই। ওই তলানির আলোটার তদ্বির করতে আর ভালো লাগে না, ওর চেয়ে পুরো অন্ধকারে সোয়াস্তি পাওয়া যায়।"

কালুর বুকে ব্যথা বাজল। সে বুঝলে, এটা অসুস্থ মানুষের কথা, বিপ্রদাস তো এ-রকম হালছাড়া প্রকৃতির লোক নয়; পরিণামটাকে ঠেকাবার জন্যে বিপ্রদাস এতদিন নানারকম প্ল্যান করছিল। তার বিশ্বাস ছিল কাটিয়ে উঠবে। আজ ভাবতেও পারে না—বিশ্বাস করবারও জোর নেই।

কালু স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে বিপ্রদাসের মুখের দিকে চেয়ে বললে, "তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না ভাই, যা করবার আমিই করব। যাই একবার দালাল-মহলে ঘুরে আসি গে।"

পরদিন বিপ্রদাসের কাছে এক ইংরেজি চিঠি এল—মধুসূদনের লেখা। ভাষাটা ওকালতি ছাঁদের—হয়তো বা অ্যাটর্নিকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছে। নিশ্চিত করে জানতে চায় কুমু ওদের ওখানে ফিরে আসবে কি না, তার পরে যথাকর্তব্য করা হবে।

বিপ্রদাস কুমুকে জিজ্ঞাসা করলে, "কুমু, ভালো করে সব ভেবে দেখেছিস?"

কুমু বললে, "ভাবনা সম্পূর্ণ শেষ করে দিয়েছি, তাই আমার মন আজ খুব নিশ্চিন্ত। ঠিক মনে হচ্ছে, যেমন এখানে ছিলুম তেমনি আছি—মাঝে যা-কিছু ঘটেছে সমস্ত স্বপ্ন।"

"যদি তোকে জোর করে নিয়ে যাবার চেষ্টা হয়, তুই জোর করে সামলাতে পারবি ?"

"তোমার উপর উৎপাত যদি না হয় তো খুব পারব।"

"এইজন্যে জিজ্ঞাসা করছি যে, যদি শেষকালে ফিরে যেতেই হয় তা হলে যত দেরি করে যাবি ততই সেটা বিশ্রী হয়ে উঠবে। ওদের সঙ্গে সম্বন্ধ-সূত্র তোর মনকে কোথাও কিছুমাত্র জড়িয়েছে কি ?"

"কিছুমাত্র না। কেবল আমি নবীনকে, মোতির মাকে, হাবলুকে ভালোবাসি। কিন্তু তারা ঠিক যেন অন্য বাড়ির লোক।"

"দেখ্ কুমু, ওরা উৎপাত করবে। সমাজের জোরে, আইনের জোরে উৎপাত করবার ক্ষমতা ওদের আছে। সেইজন্যেই সেটাকে অগ্রাহ্য করা চাই। করতে গেলেই লজ্জা সংকোচ ভয় সমস্ত বিসর্জন দিয়ে লোকসমাজের সামনে দাঁড়াতে হবে, ঘরে-বাইরে চারি দিকে নিন্দের তুফান উঠবে, তার মাঝখানে মাথা তুলে তোর ঠিক থাকা চাই।"

"দাদা, তাতে তোমার অনিষ্ট, তোমার অশান্তি হবে না ?"

"অনিষ্ট অশান্তি কাকে তুই বলিস কুমু ? তুই যদি অসম্মানের মধ্যে ডুবে থাকিস তার চেয়ে অনিষ্ট আমার আর কী হতে পারে ? যদি জানি যে, যে-ঘরে তুই আছিস সে তোর ঘর হয়ে উঠল না, তোর উপর যার একান্ত অধিকার সে তোর একান্ত পর, তবে আমার পক্ষে তার চেয়ে অশান্তি ভাবতে পারি নে। বাবা তোকে খুব ভালোবাসতেন, কিন্তু তখনকার দিনে কর্তারা থাকতেন দূরে দূরে। তোর পক্ষে পড়াশুনোর দরকার আছে তা তিনি মনেই করতেন না। আমিই নিজে গোড়া থেকে তোকে শিখিয়েছি, তোকে মানুষ করে তুলেছি। তোর বাপ-মার চেয়ে আমি কোনো অংশে কম না। সেই মানুষ করে তোলার দায়িত্ব যে কী

আজ তা বুঝতে পারছি। তুই যদি অন্য মেয়ের মতো হতিস তা হলে কোথাও তোর ঠেকত না। আজ যেখানে তোর স্বাতন্ত্র্যকে কেউ বুঝবে না, সম্মান করবে না, সেখানে যে তোর নরক। আমি কোন্ প্রাণে তোকে সেখানে নির্বাসিত করে থাকব? যদি আমার ছোটো ভাই হতিস তা হলে যেমন করে থাকতিস তেমনি করেই চিরদিন থাক্-না আমার কাছে।"

দাদার বুকের কাছে খাটের প্রান্তে মাথা রেখে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে কুমু বললে, "কিন্তু আমি তোমাদের তো ভার হয়ে থাকব না? ঠিক বলছ?"

কুমুর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বিপ্রদাস বললে, "ভার কেন হবি বোন? তোকে খুব খাটিয়ে নেব। আমার সব কাজ দেব তোর হাতে। কোনো প্রাইভেট সেক্রেটারি এমন করে কাজ করতে পারবে না। আমাকে তোর বাজনা শোনাতে হবে, আমার ঘোড়া তোর জিম্মেয় থাকবে। তা ছাড়া জানিস আমি শেখাতে ভালোবাসি। তোর মতো ছাত্রী পাব কোথায় বল্? এক কাজ করা যাবে, অনেক দিন থেকে পারসি পড়বার শখ আমার আছে। একলা পড়তে ভালো লাগে না। তোকে নিয়ে পড়ব, তুই নিশ্চয় আমার চেয়ে এগিয়ে যাবি, আমি একটুও হিংসে করব না দেখিস।"

শুনতে শুনতে কুমুর মন পুলকিত হয়ে উঠল, এর চেয়ে জীবনে সুখ আর কিছু হতে পারে না।

খানিক পরে বিপ্রদাস আবার বললে, "আরও একটা কথা তোকে বলে রাখি কুমু, খুব শীঘ্রই আমাদের কাল বদল হবে, আমাদের চালও বদলাবে। আমাদের থাকতে হবে গরিবের মতো। তখন তুই থাকবি আমাদের গরিবের ঐশ্বর্য হয়ে।"

কুমুর চোখে জল এল, বললে, "আমার এমন ভাগ্য যদি হয় তো বেঁচে যাই।"

বিপ্রদাস মধুসূদনের চিঠি হাতে রাখলে, উত্তর দিলে না।

৫৬

দু-দিন পরেই নবীন, মোতির মা, হাবলুকে নিয়ে এসে উপস্থিত। হাবলু জেঠাইমার কোলে চড়ে তার বুকে মাথা রেখে কেঁদে নিলে। কান্নাটা কিসের জন্যে স্পষ্ট করে বলা শক্ত— অতীতের জন্যে অভিমান, না বর্তমানের জন্যে আবদার, না ভবিষ্যতের জন্যে ভাবনা?

কুমু হাবলুকে জড়িয়ে ধরে বললে, "কঠিন সংসার, গোপাল, কান্নার অন্ত নেই। কী আছে আমার, কী দিতে পারি, যাতে মানুষের ছেলের কান্না কমে। কান্না দিয়ে কান্না মেটাতে চাই, তার বেশি শক্তি নেই। যে-ভালোবাসা আপনাকে দেয় তার অধিক আর কিছু দিতে পারে না, বাছারা, সেই ভালোবাসা তোরা পেয়েছিস; জেঠাইমা চিরদিন থাকবে না, কিন্তু এই কথাটা মনে রাখিস, মনে রাখিস, মনে রাখিস।" বলে তার গালে চুমু খেলে।

নবীন বললে, "বউরানী, এবার রজবপুরে পৈতৃক ঘরে চলেছি; এখানকার পালা সাঙ্গ হল।"

কুমু ব্যাকুল হয়ে বললে, "আমি হতভাগিনী এসে তোমাদের এই বিপদ ঘটালুম।"

নবীন বললে, "ঠিক তার উলটো। অনেক দিন থেকেই মনটা যাই-যাই করছিল। বেঁধে-সেধে তৈরি হয়ে ছিলুম, এমন সময় তুমি এলে আমাদের ঘরে। ঘরের আশ খুব করেই মিটেছিল, কিন্তু বিধাতার সইল না।"

সেদিন মধুসূদন ফিরে গিয়ে তুমুল একটা বিপ্লব বাধিয়েছিল তা বোঝা গেল।

নবীন যাই বলুক, কুমুই যে ওদের সংসারের সমস্ত ওলটপালট করে দিয়েছে মোতির মার তাতে সন্দেহ নেই, আর সেই অপরাধ সে সহজে ক্ষমা করতে চায় না। তার মত এই যে, এখনো কুমুর সেখানে যাওয়া উচিত মাথা হেঁট করে, তার পরে যত লাঞ্ছনাই হোক সেটা মেনে নেওয়া চাই। গলা বেশ একটু কঠিন করেই জিজ্ঞাসা করলে, "তুমি কি শ্বশুরবাড়ি একেবারেই যাবে না ঠিক করেছ?"

কুমু তার উত্তরে শক্ত করেই বললে, "না, যাব না।"

মোতির মা জিজ্ঞাসা করলে, "তা হলে তোমার গতি কোথায়?"

কুমু বললে, "মস্ত এই পৃথিবী, এর মধ্যে কোনো-এক জায়গায় আমারও একটুখানি ঠাঁই হতে পারবে। জীবনে অনেক যায় খসে, তবুও কিছু বাকি থাকে।"

কুমু বুঝতে পারছিল মোতির মার মন ওর কাছ থেকে অনেকখানি সরে এসেছে। নবীনকে জিজ্ঞাসা করলে, "ঠাকুরপো, তা হলে কী করবে এখন।"

"নদীর ধারে কিছু জমি আছে, তার থেকে মোটা ভাতও জুটবে, কিছু হাওয়া খাওয়াও চলবে।"

মোতির মা উষ্মার সঙ্গেই বললে, "ওগো মশায়, না, সেজন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না। ওই মির্জাপুরের অন্নজলে দাবি রাখি, সে কেউ কাড়তে পারবে না। আমরা তো এত বেশি সম্মানী লোক নই, বড়ঠাকুর তাড়া দিলেই অমনি বিবাগি হয়ে চলে যাব। তিনিই আবার আজ বাদে কাল ফিরিয়ে ডাকবেন, তখন ফিরেও আসব, ইতিমধ্যে সবুর সইবে, এই বলে রাখলুম।"

নবীন একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে বললে, “সে-কথা জানি মেজোবউ, কিন্তু তা নিয়ে বড়াই করি নে। পুনর্জন্ম যদি থাকে তবে সম্মানী হয়েই যেন জন্মাই, তাতে অন্নজলের যদি টানাটানি ঘটে সেও স্বীকার।”

বস্তুত নবীন অনেক বারই দাদার আশ্রয় ছেড়ে গ্রামে চাষবাসের সংকল্প করেছে। মোতির মা মুখে তর্জনগর্জন করেছে, কাজের বেলায় কিছুতেই সহজে নড়তে চায় নি, নবীনকে বারে বারে আটকে রেখেছে। সে জানে ভাশুরের উপর তার সম্পূর্ণ দাবি আছে। ভাশুর তো শ্বশুরের স্থানীয়। তার মতে ভাশুর অন্যায় করতে পারে, কিন্তু তাকে অপমান বলা চলে না। কুমুর প্রতি কুমুর স্বামীর ব্যবহার যেমনই হোক তাই বলে কুমু স্বামীর ঘর অস্বীকার করতে পারে, এ-কথা মোতির মার কাছে নিতান্ত সৃষ্টিছাড়া।

খবর এল, ডাক্তার এসেছে। কুমু বললে, “একটু অপেক্ষা করো, শুনে আসি ডাক্তার কী বলে।”

ডাক্তার কুমুকে বলে গেল, নাড়ি আরও খারাপ, রাত্তিরে ঘুম কমেছে, বোধ হয় রোগী ঠিক বিশ্রাম পাচ্ছে না।

অতিথিদের কাছে কুমু ফিরে যাচ্ছিল, এমন সময় কালু এসে বললে, “একটা কথা না বলে থাকতে পারছি নে, জাল বড়ো জটিল হয়ে এসেছে, তুমি যদি এই সময়ে শ্বশুরবাড়ি ফিরে না যাও, বিপদ আরও ঘনিয়ে ধরবে। আমি তো কোনো উপায় ভেবে পাচ্ছি নে।”

কুমু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। কালু বললে, “তোমার স্বামীর ওখান থেকে তাগিদ এসেছে, সেটা অগ্রাহ্য করবার শক্তি কি আমাদের আছে? আমরা যে একেবারে তার মুঠোর মধ্যে।”

কুমু বারান্দায় রেলিং চেপে ধরে বললে, “আমি কিছুই বুঝতে পারছি নে, কালুদা। প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে, মনে হয় মরণ ছাড়া

কোনো রাস্তাই আমার খোলা নেই।" এই বলে কুমু দ্রুতপদে চলে গেল।

দাদার ঘরে যখন কুমু ছিল, সেই অবকাশে ক্ষেমাপিসির সঙ্গে মোতির মার কিছু কথাবার্তা হয়ে গেছে। নানারকম লক্ষণ মিলিয়ে দুজনেরই মনে সন্দেহ হয়েছে কুমু গর্ভিণী। মোতির মা খুশি হয়ে উঠল, মনে মনে বললে, মা-কালী করুন তাই যেন হয়। এইবার জব্দ। মানিনী শ্বশুর-বাড়িকে অবজ্ঞা করতে চান, কিন্তু এ-যে নাড়িতে গ্রন্থি লাগল, শুধু তো আঁচলে আঁচলে নয়, পালাবে কেমন করে।

কুমুকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে মোতির মা তার সন্দেহের কথাটা বললে। কুমুর মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। সে হাত মুঠো করে বললে, "না না, এ কখনোই হতে পারে না, কিছুতেই না।"

মোতির মা বিরক্ত হয়েই বললে, "কেন হতে পারবে না ভাই? তুমি যত বড়ো ঘরেরই মেয়ে হও না কেন, তোমার বেলাতেই তো সংসারের নিয়ম উলটে যাবে না। তুমি ঘোষালদের ঘরের বউ তো, ঘোষাল-বংশের ইষ্টদেবতা কি তোমাকে সহজে ছুটি দেবেন? পালাবার পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি।"

স্বামীর সঙ্গে কুমুর অল্পকালের পরিচয় দিনে দিনে ভিতরে ভিতরে কী রকম যে বিকৃত মূর্তি ধরেছে গর্ভের আশঙ্কায় ওর মনে সেটা খুব স্পষ্ট হয়ে উঠল। মানুষে মানুষে যে-ভেদটা সব চেয়ে দুরতিক্রমণীয়, তার উপাদান-গুলো অনেক সময়ে খুব সূক্ষ্ম। ভাষায় ভঙ্গিতে, ব্যবহারের ছোটো ছোটো ইশারায়, যখন কিছুই করছে না, তখনকার অনভিব্যক্ত ইঙ্গিতে, গলার স্বরে, রুচিতে, রীতিতে, জীবনযাত্রার আদর্শে, ভেদের লক্ষণগুলি আভাসে ছড়িয়ে থাকে। মধুসূদনের মধ্যে এমন কিছু আছে যা কুমুকে কেবল যে আঘাত করেছে তা নয়, ওকে গভীর লজ্জা দিয়েছে। ওর মনে

হয়েছে সেটা যেন অশ্লীল। মধুসূদন তার জীবনের আরম্ভে একদিন দুঃসহ ভাবেই গরিব ছিল, সেই জন্যে 'পয়সা'র মাহাত্ম্য সম্বন্ধে সে কথায় কথায় যে মত ব্যক্ত করত সেই গর্বোক্তির মধ্যে তার রক্তগত দারিদ্র্যের একটা হীনতা ছিল। এই পয়সা-পূজার কথা মধুসূদন বার বার তুলত কুমুর পিতৃকুলকে খোঁটা দেবার জন্যেই। ওর সেই স্বাভাবিক ইতরতায়, ভাষার কর্কশতায়, দাম্ভিক অসৌজন্যে, সবসুদ্ধ মধুসূদনের দেহমনের, ওর সংসারের আন্তরিক অশোভনতায় প্রত্যহই কুমুর সমস্ত শরীরমনকে সংকুচিত করে তুলছে। যতই এগুলোকে দৃষ্টি থেকে, চিন্তা থেকে সরিয়ে ফেলতে চেষ্টা করেছে, ততই এরা বিপুল আবর্জনার মতো চারি দিকে জমে উঠেছে। আপন মনের ঘৃণার ভাবের সঙ্গে কুমু আপনিই প্রাণপণে লড়াই করে এসেছে। স্বামীপূজার কর্তব্যতার সম্বন্ধে সংস্কারটাকে বিশুদ্ধ রাখবার জন্যে ওর চেষ্টার অন্ত ছিল না, কিন্তু কত বড়ো হার হয়েছে তা এর আগে এমন করে বোঝে নি। মধুসূদনের সঙ্গে ওর রক্তমাংসের বন্ধন অবিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, তার বীভৎসতা ওকে বিষম পীড়া দিলে। কুমু অত্যন্ত উদ্বিগ্ন-মুখে মোতির মাকে জিজ্ঞাসা করলে, "কী করে তুমি নিশ্চয় জানলে?"

মোতির মার ভারি রাগ হল, সামলে নিয়ে বললে, "ছেলের মা আমি, আমি জানব না তো কে জানবে? তবু একেবারে নিশ্চয় করে বলবার সময় হয় নি। ভালো দাই কাউকে ডেকে পরীক্ষা করিয়ে দেখা ভালো।"

নবীন, মোতির মা, হাবলুর যাবার সময় হল। কিন্তু দৈবের এই চরম অন্যায়ের কথা ছাড়া কুমু আর কোনো কিছুতে আজ মন দিতে পারছিল না। তাই খুব সাধারণভাবেই শ্বশুড়বাড়ির বন্ধুদের কাছ থেকে ওর বিদায় নেওয়া হল। নবীন যাবার সময়ে বললে, "বউরানী, সংসারে সব জিনিসেরই অবসান আছে। কিন্তু তোমাকে সেবা করবার যে-অধিকার হঠাৎ একদিন পেয়েছি সে যে এমন খাপছাড়াভাবে হঠাৎ আর-একদিন

শেষ হতে পারে, সে-কথা ভাবতেও পারি নে। আবার দেখা হবে।" নবীন প্রণাম করলে, হাবলু নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল, মোতির মা মুখ শক্ত করে রইল, একটি কথাও কইলে না।

৫৭

খবরটা বিপ্রদাসের কানে গেল। দাই এল, সন্দেহ রইল না যে কুমুর গর্ভাবস্থা। মধুসূদনের কানেও সংবাদ পৌঁচেছে। মধুসূদন ধন চেয়েছিল, ধন পুরো পরিমাণেই জমেছে, ধনের উপযুক্ত খেতাবও মিলেছে, এখন নিজের মহিমাকে ভাবী বংশের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলেই এ-সংসারে তার কর্তব্য চরম লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছবে। মনটা যতই খুশি হল ততই অপরাধের সমস্ত দায়িত্ব কুমুর উপর থেকে সরিয়ে বোঝাই করলে বিপ্রদাসের উপর। দ্বিতীয় একখানা চিঠি তাকে লিখলে, শুরু করলে Whereas দিয়ে, শেষ করলে Your obedient servant মধুসূদন ঘোষাল সই করে। মাঝখানটাতে ছিল I shall have the painful necessity ইত্যাদি। এ-রকম ভয়-দেখানো চিঠিতে চাটুজ্যে-বংশের উপর উলটো ফল ফলে, বিশেষত ক্ষতির আশঙ্কা থাকলে। বিপ্রদাস চিঠিটা দেখালে কালুকে। তার মুখ লাল হয়ে উঠল। সে বললে, "এ-রকম চিঠিতে আমারই মতো সামান্য লোকের দেহে একেবারে বাদশাহি মাত্রায় রক্ত গরম হয়ে ওঠে। অদৃশ্য কোতোয়াল বেটাকে হাঁক দিয়ে ডেকে বলতে ইচ্ছে করে, শির লেও উসকো।"

দিনের বেলা নানাপ্রকার লেখাপড়ার কাজ ছিল, সে সমস্ত শেষ করে সন্ধ্যাবেলা বিপ্রদাস কুমুকে ডেকে পাঠালে। কুমু আজ সারাদিন দাদার কাছে আসেই নি। নিজেকে লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াচ্ছে।

বিপ্রদাস বিছানা ছেড়ে চৌকিতে উঠে বসল। রোগীর মতো শুয়ে

থাকলে মনটা দুর্বল থাকে। সামনের দিকে কুমুর জন্যে একটা ছোটো চৌকি ঠিক করে রেখেছে। আলোটা ঘরের কোণে একটু আড়াল করে রাখা। মাথার উপর বড়ো একটা টানা পাখা হুস হুস করে চলছে। বৈশাখ-শেষের আকাশে তখনো গরম জমে আছে, দক্ষিনে হাওয়া এক-একবার অল্প একটু নিশ্বাস ছেড়েই থেমে যাচ্ছে, গাছের পাতাগুলো যেন একান্ত কান-পাতা মনোযোগের মতো নিস্তব্ধ। সমুদ্রের মোহানায় গঙ্গা যেখানে নীল জলকে ফিকে করে দিয়েছে, অন্ধকারটা যেন সেইরকম। দীর্ঘবিলম্বিত গোধূলির শেষ আলোটা তখনো তার কালিমার ভিতরে ভিতরে মিশ্রিত। বাগানের পুকুরটা ছায়ায় অদৃশ্য হয়ে থাকত, কিন্তু খুব একটা জ্বল্‌জ্বলে তারার স্থির প্রতিবিম্ব আকাশের অঙ্গুলি-সংকেতের মতো তাকে নির্দেশ করে দিচ্ছে। গাছতলার নীচে দিয়ে চাকররা ক্ষণে ক্ষণে লণ্ঠন হাতে করে যাতায়াত করছে, আর পেঁচা উঠছে ডেকে।

কুমু বোধ হয় একটু ইতস্তত করে একটু দেরি করেই এল। বিপ্রদাসের কাছে চৌকিতে বসেই বললে, "দাদা, আমার একটুও ভালো লাগছে না। আমার যেন কোথায় যেতে ইচ্ছে করছে।"

বিপ্রদাস বললে, "ভুল বলছিস কুমু, তোর ভালোই লাগবে। আর কিছুদিন পরেই তোর মন উঠবে ভরে।"

"কিন্তু তা হলে—" বলে কুমু থেমে গেল।

"তা জানি—এখন তোর বন্ধন কাটাবে কে ?"

"তবে কি যেতে হবে দাদা ?"

"তোকে নিষেধ করতে পারি এমন অধিকার আর আমার নেই। তোর সন্তানকে তার নিজের ঘরছাড়া করব কোন্ স্পর্ধায় ?"

কুমু অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল, বিপ্রদাসও কিছু বললে না।

অবশেষে খুব মৃদু স্বরে কুমু জিজ্ঞাসা করলে, "তা হলে কবে যেতে হবে ?"

"কালই, আর দেরি সইবে না।"

"দাদা, একটা কথা বোধ হয় বুঝতে পারছ, এবার গেলে ওরা আমাকে আর কখনো তোমার কাছে আসতে দেবে না।"

"তা আমি খুবই জানি।"

"আচ্ছা, তাই হবে। কিন্তু একটা কথা তোমাকে বলে রাখি, কোনো দিন কোনো কারণেই তুমি ওদের বাড়ি যেতে পারবে না। জানি দাদা, তোমাকে দেখবার জন্যে আমার প্রাণ হাঁপিয়ে উঠবে, কিন্তু ওদের ওখানে যেন কখনো তোমাকে না দেখতে হয়। সে আমি সইতে পারব না।"

"না কুমু, সে জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না।"

"ওরা কিন্তু তোমাকে বিপদে ফেলবার চেষ্টা করবে।"

"ওরা যা করতে পারে তা করা শেষ হলেই আমার উপর ওদের ক্ষমতাও শেষ হবে। তখনই আমি হব স্বাধীন। তাকে তুই বিপদ বলছিস কেন ?"

"দাদা, সেইদিন তুমিও আমাকে স্বাধীন করে নিয়ো। ততদিনে ওদের ছেলেকে আমি ওদের হাতে দিয়ে যাব। এমন কিছু আছে যা ছেলের জন্যেও খোওয়ানো যায় না।"

"আচ্ছা, আগে হোক ছেলে, তার পরে বলিস।"

"তুমি বিশ্বাস করছ না, কিন্তু মার কথা মনে আছে তো ? তাঁর তো হয়েছিল ইচ্ছামৃত্যু। সেদিন সংসারে তিনি তাঁর জায়গাটি পাচ্ছিলেন না, তাই তাঁর ছেলেমেয়েদেরকে অনায়াসে ফেলে দিয়ে যেতে পেরেছিলেন। মানুষ যখন মুক্তি চায় তখন কিছুতেই তাকে ঠেকাতে পারে না। আমি তোমারই বোন, দাদা, আমি মুক্তি চাই। একদিন যেদিন বাঁধন কাটব,

মা সেদিন আমাকে আশীর্বাদ করবেন, এই আমি তোমাকে বলে রাখলুম।"

আবার অনেকক্ষণ দুজনে চুপ করে রইল। হঠাৎ হু হু করে বাতাস উঠল, টিপায়ের উপর বিপ্রদাসের পড়বার বইটার পাতাগুলো ফর্ ফর্ করে উলটে যেতে লাগল। বাগান থেকে বেলফুলের গন্ধে ঘর গেল ভরে।

কুমু বললে, "আমাকে ওরা ইচ্ছে করে দুঃখ দিয়েছে তা মনে কোরো না। আমাকে সুখ ওরা দিতে পারে না। আমি এমনি করেই তৈরি। আমিও তো ওদের পারব না সুখী করতে। যারা সহজে ওদের সুখী করতে পারে তাদের জায়গা জুড়ে কেবল একটা-না-একটা মুশকিল বাধবে। তা হলে কেন এ বিড়ম্বনা! সমাজের কাছ থেকে অপরাধের সমস্ত লাঞ্ছনা আমিই একলা মেনে নেব, ওদের গায়ে কোনো কলঙ্ক লাগবে না। কিন্তু একদিন ওদেরকে মুক্তি দেব, আমিও মুক্তি নেব: চলে আসবই, এ তুমি দেখে নিয়ো। মিথ্যে হয়ে মিথ্যের মধ্যে থাকতে পারব না। আমি ওদের বড়োবউ, তার কি কোনো মানে আছে যদি আমি কুমু না হই? দাদা, তুমি ঠাকুর বিশ্বাস কর না, আমি বিশ্বাস করি।· তিন মাস আগে যে-রকম করে করতুম, আজ তার চেয়ে বেশি করেই করি। আজ সমস্ত দিন ধরেই এই কথা ভাবছি যে, চারি দিকে এত এলোমেলো, এত উলটো-পালটা, তবু এই জঞ্জালে একেবারে ঢেকে ফেলে নি জগৎটাকে। এ-সমস্তকে ছাড়িয়ে গিয়েও চন্দ্রসূর্যকে নিয়ে সংসারের কাজ চলছে, সেই যেখানে ছাড়িয়ে গেছে সেইখানে আছে বৈকুণ্ঠ, সেইখানে আছেন আমার ঠাকুর। তোমার কাছে এ-সব কথা বলতে লজ্জা করে—কিন্তু আর তো কখনো বলা হবে না, আজ বলে যাই। নইলে আমার জন্যে মিছিমিছি ভাববে। সমস্ত গিয়েও তবু বাকি থাকে, এই কথাটা বুঝতে পেরেছি; সেই আমার অফুরান, সেই আমার ঠাকুর। এ যদি না বুঝতুম তা হলে

এইখানে তোমার পায়ে মাথা ঠুকে মরতুম, সে-গারদে ঢুকতুম না। দাদা, এ-সংসারে তুমি আমার আছ বলেই তবে এ-কথা বুঝতে পেরেছি।" এই বলেই কুমু চৌকি থেকে নেবে দাদার পায়ের উপর মাথা রেখে পড়ে রইল। রাত বেড়ে চলল, বিপ্রদাস জানলার বাইরে অনিমেষ দৃষ্টি মেলে ভাবতে লাগল।

৫৮

পরদিন ভোরে বিপ্রদাস কুমুকে ডেকে পাঠালে। কুমু এসে দেখে বিপ্রদাস বিছানায় বসে, একটি এসরাজ আছে কোলের উপর, আর-একটি পাশে শোওয়ানো। কুমুকে বললে, "নে যন্ত্রটা, আমরা দুজনে মিলে বাজাই।" তখনো অল্প অল্প অন্ধকার, সমস্ত রাত্রির পরে বাতাস একটু ঠাণ্ডা হয়ে অশথপাতার মধ্যে ঝির্ ঝির্ করছে, কাকগুলো ডাকতে শুরু করেছে। দুজনে ভৈরোঁ রাগিণীতে আলাপ শুরু করলে, গম্ভীর শান্ত সকরুণ; সতীবিরহ যখন অচঞ্চল হয়ে এসেছে, মহাদেবের সেইদিনকার প্রভাতের ধ্যানের মতো। বাজাতে বাজাতে পুষ্পিত কৃষ্ণচূড়ার ডালের ভিতর দিয়ে অরুণ-আভা উজ্জ্বলতর হয়ে উঠল, সূর্য দেখা দিল বাগানের পাঁচিলের উপরে। চাকররা দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়ে থেকে ফিরে গেল। ঘর সাফ করা হল না। রোদ্দুর ঘরের মধ্যে এল, দরোয়ান আস্তে আস্তে এসে খবরের কাগজ টিপায়ের উপর রেখে দিয়ে নিঃশব্দ পদে চলে গেল।

অবশেষে বাজনা বন্ধ করে বিপ্রদাস বললে, "কুমু, তুই মনে করিস আমার কোনো ধর্ম নেই। আমার ধর্মকে কথায় বলতে গেলে ফুরিয়ে যায় তাই বলি নে। গানের সুরে তার রূপ দেখি, তার মধ্যে গভীর দুঃখ গভীর আনন্দ এক হয়ে মিলে গেছে; তাকে নাম দিতে পারি নে। তুই

আজ চলে যাচ্ছিস কুমু, আর হয়তো দেখা হবে না, আজ সকালে তোকে সেই সকল বেসুরের, সকল অমিলের পরপারে এগিয়ে দিতে এলুম শকুন্তলা পড়েছিস—দুষ্মন্তের ঘরে যখন শকুন্তলা যাত্রা করে বেরিয়েছিল, কণ্ব কিছুদূর তাকে পৌঁছিয়ে দিলেন। যে-লোকে তাকে উত্তীর্ণ করতে তিনি বেরিয়েছিলেন, তার মাঝখানে ছিল দুঃখ অপমান। কিন্তু সেইখানেই থামল না, তাও পেরিয়ে শকুন্তলা পৌঁচেছিল অচঞ্চল শান্তিতে। আজ সকালের ভৈরোঁর মধ্যে সেই শান্তির সুর আমার সমস্ত অন্তঃকরণের আশীর্বাদ তোকে সেই নির্মল পরিপূর্ণতার দিকে এগিয়ে দিক; সেই পরিপূর্ণতা তোর অন্তরে তোর বাহিরে, তোর সব দুঃখ তোর সব অপমানকে প্লাবিত করুক।"

কুমু কোনো কথা বললে না। বিপ্রদাসের পায়ে মাথা রেখে প্রণাম করলে। খানিকক্ষণ জানলার বাইরের আলোর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার পরে বললে, "দাদা, তোমার চা-রুটি আমি তৈরি করে নিয়ে আসি গে।"

মধুসূদন আজ দৈবজ্ঞকে ডাকিয়ে শুভযাত্রার লগ্ন ঠিক করে রেখেছিল। সকালে দশটার কিছু পরে। ঠিক সময়ে জরির-কাজ-করা লাল বনাতের ঘেটাটোপওআলা পালকি এল দরজায়, আসাসোটা নিয়ে লোকজন এল, সমারোহ করে কুমুকে নিয়ে গেল মির্জাপুরের প্রাসাদে। আজ সেখানে নহবত বাজছে, আর চলছে ব্রাহ্মণভোজন ব্রাহ্মণবিদায়ের আয়োজন।

মানিক এল বার্লির পেয়ালা হাতে বিপ্রদাসের ঘরে। আজ বিপ্রদাস বিছানায় নেই, জানলার সামনে চৌকি টেনে নিয়ে স্থির বসে আছে। বার্লি যখন এল কোনো খবরই নিলে না। চাকর ফিরে গেল। তখন ক্ষেমাপিসি এলেন পথ্য নিয়ে, বিপ্রদাসের কাঁধে হাত দিয়ে বললেন, "বিপু, বেলা হয়ে গেছে, বাবা।"

বিপ্রদাস চৌকি থেকে ধীরে ধীরে উঠে বিছানায় শুয়ে পড়ল। ক্ষেমা-পিসির ইচ্ছা ছিল কেমন ধুমধাম করে আদর করে ওরা কুমুকে নিয়ে গেল তার বিস্তারিত বর্ণনা করে গল্প করেন। কিন্তু বিপ্রদাসের গভীর নিস্তব্ধতা দেখে কোনো কথাই বলতে পারলেন না, মনে হল বিপ্রদাসের চোখের সামনে একটা অতলস্পর্শ শূন্যতা।

বিপ্রদাস যখন বলে উঠল, "পিসি, কালুকে পাঠিয়ে দাও" তখন এই সামান্য কথাটাও অদৃষ্টের একটা প্রকাণ্ড নিঃশব্দ ছায়ার ভিতর দিয়ে ধ্বনিত হল। পিসির গা ছম্ ছম্ করে উঠল।

কালু যখন এল, বিপ্রদাস তার হাতে একখানা চিঠি দিলে। বিলেতের চিঠি, সুবোধের লেখা। সুবোধ লিখেছে, বার-এর ডিনার শেষ না করেই যদি সে দেশে আসে তা হলে আবার তাকে ফিরে যেতে হবে। তার চেয়ে শেষ ডিনার সেরে মাঘ-ফাল্গুন নাগাত দেশে ফিরে এলে তার সুবিধে হয়, অনর্থক খরচের আশঙ্কাও বেঁচে যায়। তার বিশ্বাস বিষয়কর্মের প্রয়োজন তত দিন সবুর করতে পারে।

আজকের দিনে বিষয়কর্মের সংকট নিয়ে বিপ্রদাসকে পীড়া দিতে কালুর একটুও ইচ্ছে ছিল না। কালু বললে, "দাদা, এখনো তো টাকা তুলে নেবার কোনো কথা ওঠে নি, আর কিছুদিন যদি সাবধানে চলি, কাউকে না ঘাঁটাই, তা হলে শীঘ্র কোনো উৎপাত ঘটবে না। যাই হোক তুমি কোনো ভাবনা কোরো না।"

বিপ্রদাস বললে, "আমার কোনো ভাবনা নেই, কালু। লেশমাত্র না।"

বিপ্রদাসের ভাবনা কালুর ভালো লাগে না— এত অত্যন্ত নির্ভাবনা তার আরও খারাপ লাগে।

বিপ্রদাস খবরের কাগজ তুলে নিয়ে পড়তে লাগল, কালু বুঝলে এ-সম্বন্ধে কোনো আলোচনা করতে বিপ্রদাসের একটুও ইচ্ছা নেই।

যোগাযোগ

অন্যদিন কাজের কথা শেষ হলেই কালু চলে যায়, আজ সে চুপ করে বসে রইল, ইচ্ছা করতে লাগল অন্য কিছু কথা বলে, যা-হয় কোনো একটা সেবায় লেগে যায়। জিজ্ঞাসা করলে, "বাইরের দিকে ওই জানলাটা বন্ধ করে দেব কি? রোদ্দুর আসছে।"

বিপ্রদাস হাত নেড়ে জানালে যে, দরকার নেই।

কালু তবু রইল বসে। দাদার ঘরে আজ কুমু নেই এ-শূন্যতা তার বুকে চেপে রইল। হঠাৎ শুনতে পেলে বিছানার নীচে টম কুকুরটা গুমরে গুমরে কেঁদে উঠল। কুমুকে সে চলে যেতে দেখেছে, কী একটা বুঝেছে, ভালো করে বোঝাতে পারছে না।

৪ 'যোগাযোগ' ১৩৩৬ সালের আষাঢ় মাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

'বিচিত্রা' পত্রে 'যোগাযোগ' ধারাবাহিকভাবে (আশ্বিন ১৩৩৪—চৈত্র ১৩৩৫) প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রথম দুই সংখ্যায় উপন্যাসটি 'তিন পুরুষ' নামে প্রকাশিত হইয়াছিল। তৃতীয় বারে কবি ইহার নাম পরিবর্তন করিয়া 'যোগাযোগ' নামকরণ করেন। এই উপলক্ষ্যে 'বিচিত্রা'য় যে কৈফিয়ত প্রকাশিত হয় তাহা নিম্নে মুদ্রিত হইল।

নামান্তর

'তিন পুরুষ' নাম ধরে আমার যে-গল্পটা বিচিত্রায় বের হচ্ছে তার নাম রক্ষা করতেই হবে এমন কোনো দায় নেই। কাঁচা থাকতে থাকতেই ও-নামটা বদল করব বলে স্থির করেছি। পাঠক-দরবারে তার কারণ নির্দেশ করি।

নবজাত কুমারকুমারীদের নাম দেবার জন্যে আমার কাছে অনুরোধ এসে থাকে, অবকাশমতো সে-অনুরোধ পালন করেও এসেছি। কারণ এতে কোনো দায়িত্ব নেই। ব্যক্তিসম্বন্ধে মানুষের নাম তার বিশেষণ নয়, সম্বোধন মাত্র। লাউয়ের বোঁটা নিয়ে লাউয়ের বিচার কেউ করে না. ওটাতে ধরবার সুবিধে। যার নাম দিয়েছি সুশীল তার শীলতা নিয়ে আমার কোনো জবাবদিহি নেই। সুশীল-ঠিকানায় পত্র পাঠালে শব্দের সঙ্গে প্রয়োগের অসংগতিদোষ নিয়ে ডাকপেয়াদা কাগজে লেখালেখি করে না, ঠিক জায়গায় চিঠি পৌছয়।

ব্যক্তিগত নাম ডাকবার জন্যে, বিষয়গত নাম স্বভাবনির্দেশের জন্যে। মানুষকেও যখন ব্যক্তি বলে দেখি নে, বিষয় বলে দেখি, তখন তার গুণ বা অবস্থা মিলিয়ে তার উপাধি দিই—কাউকে বলি বড়োবউ, কাউকে বলি মাস্টারমশায়।

সাহিত্যে যখন নামকরণের লগ্ন আসে দ্বিধার মধ্যে পড়ি। সাহিত্য-রচনার স্বভাবটা বিষয়গত না ব্যক্তিগত এইটে হল গোড়াকার তর্ক। বিজ্ঞানশাস্ত্রে বিষয়টাই সর্বেসর্বা, সেখানে গুণধর্মের পরিচয়ই একমাত্র পরিচয়। মনস্তত্ত্বঘটিত বইয়ের শিরোনামায় যখনি দেখব 'স্ত্রীর সম্বন্ধে স্বামীর ঈর্ষা,' বুঝব বিষয়টিকে ব্যাখ্যা-দ্বারাই নামটি সার্থক হবে। কিন্তু 'ওথেলো' নাটকের যদি ওই নাম হত পছন্দ করতুম না। কেননা এখানে বিষয়টি প্রধান নয়, নাটকটিই প্রধান। অর্থাৎ আখ্যানবস্তু, রচনারীতি, চরিত্রচিত্র, ভাবা, ছন্দ, ব্যঞ্জনা, নাট্যরস, সবটা মিলিয়ে একটি সমগ্র বস্তু। একেই বলা চলে ব্যক্তিরূপ। বিষয়ের কাছ থেকে সংবাদ পাই, ব্যক্তির কাছ থেকে তার আত্মপ্রকাশজনিত রস পাই। বিষয়কে বিশেষণের দ্বারা মনে বাঁধি, ব্যক্তিকে সম্বোধনের দ্বারা মনে রাখি।

এমন একটা-কিছু অবলম্বন করে গল্প লিখতে বসলুম যাকে বলা যেতে পারে বিষয়। যদি মূর্তি গড়তেম একতাল মাটি নিয়ে বসতে হত। অতএব ওটাকে 'মাটি' শিরোনামায় নির্দেশ করলে বিজ্ঞানে বা তত্ত্বজ্ঞানে বাধত না। বিজ্ঞান যখন কুণ্ডলকে উপেক্ষা ক'রে তার সোনার তত্ত্ব আলোচনা করে তখন তাকে নমস্কার করি। কিন্তু কনের কুণ্ডল নিয়ে বর যখন সেই আলোচনাটাকেই প্রাধান্য দেয় তখন তাকে বলি বর্বর। রসশাস্ত্রে মূর্তিটা মাটির চেয়ে বেশি, গল্পটাও বিষয়ের চেয়ে বড়ো। এইজন্যে বিষয়টাকেই শিরোধার্য করে নিয়ে গল্পের নাম দিতে আমার মন যায় না। বস্তুত রস-সৃষ্টিতে বৈষয়িকতাকে বড়ো জায়গা দেওয়া উচিত হয় না। যারা বৈষয়িক প্রকৃতির পাঠক তাঁদের দাবির জোরে সাহিত্যরাজ্যে হাটের পত্তন হলে দুঃখের বিষয় ঘটে। হাটের মালিক বিষয়বুদ্ধিপ্রধান বিজ্ঞান।

এদিকে সম্পাদক এসে বলেন, সংসারে নাম রূপ দুটোই অত্যাবশ্যক। আমি ভেবে দেখলুম, রূপের আমরা নাম দিই, বস্তুর দিই সংজ্ঞা। সন্দেশ

যেখানে রূপং সেখানে তাকে বলি 'অবাক চাকি', যেখানে বস্তু সেখানে তাকে বলি মিষ্টান্ন। সম্পাদকমশায়ের সংজ্ঞা হচ্ছে 'সম্পাদক', এখানে অর্থ মিলিয়ে আদালতে হলফ করে বলতে পারি শব্দের সঙ্গে বিষয়ের ষোলো আনা মিল আছে। কিন্তু যেখানে তিনি বিষয় নন, রূপ—অর্থাৎ স্বতন্ত্র ও একমাত্র—সেখানে কোনো একটামাত্র সংজ্ঞা দিয়ে তাঁকে বাঁধা অসম্ভব। সেখানে তাঁর আছে নাম। সেই নামের সঙ্গে মিলিয়ে শত্রু মিত্র কেউ তাঁর যাচাই করে না। পিতামাতা যদি তাঁকে 'সম্পাদক' নামই দিতেন তবে নাম সার্থক করবার জন্যে সম্পাদক হবার কোনো দরকারই তাঁর থাকত না।

গল্প জিনিসটাও রূপ; ইংরেজিতে যাকে বলে ক্রিয়েশন। আমি তাই বলি, গল্পের এমন নাম দেওয়া উচিত নয় যেটা সংজ্ঞা, অর্থাৎ যেটাতে রূপের চেয়ে বস্তুটাই নির্দিষ্ট। বিষবৃক্ষ নামটাতে আমি আপত্তি করি। কৃষ্ণকান্তের উইল নামে দোষ নেই। কেননা ও-নামে গল্পের কোনো ব্যাখ্যাই করা হয় নি।

সম্পাদকমশায় যখন গল্পের নামের জন্যে পেয়াদা পাঠালেন তাড়াতাড়ি তখন 'তিন পুরুষ' নামটা দিয়ে তাকে বিদায় করা গেল। তার পরক্ষণেই নামটা কাহিনীর আঁচলের সঙ্গে তার গ্রন্থিবন্ধন করে নিয়ে কানে কানে মুহূর্তে মুহূর্তে বলতে লাগল, যদেতৎ অর্থং মম তদস্তু রূপং তব। আমার সঙ্গে তোমাকে সম্পূর্ণ মিলে চলতে হবে। ছায়েবানুগতাস্বচ্ছা ইত্যাদি। কাহিনী বলে, তার মানে কী হল? নাম বলে, বাক্যে ভাবে আজ থেকে আমাকে সপ্রমাণ করে চলাই তোমার ধর্ম। কাহিনী বলে, রেজিস্টার বইয়ে কর্তার তাড়ায় সম্মতি সই করেছি বটে, কিন্তু আজ আমি হাজার হাজার পাঠকের সামনে দাঁড়িয়ে সেটা বেকবুল যেতে চাই।

কর্তা বলেন, তিন পুরুষের তিন-তোরণ-ওআলা রাস্তা দিয়ে গল্পটা চলে

আসবে এই আমার একটা খেয়ালমাত্র ছিল। এই চলাটা কিছুই প্রমা[ণ] করবার জন্যে নয়, নিছক ভ্রমণ করবার জন্যেই। সুতরাং এই নাম[টা] ত্যাগ করলে আমার গল্পের কোনো স্বত্বের দলিল কাঁচবে না।

অতএব সর্বসমক্ষে আমার গল্প আজ তার নাম খোয়াতে বসেছে। আমরা তিন সত্যের জোর মানি; বিচিত্রার পাতায় নাম সম্বন্ধে দুইবা[র] সত্যপাঠ হয়ে গেছে। তিনবারের বেলায় মুখ চাপা দেওয়া গেল।

আর-একটা নাম ঠাউরেছি। সেটা এতই নির্বিশেষ যে গল্পমাত্রে[ই] নির্বিচারে খাটতে পারে। সরকারি জিনিসমাত্রেরই মতো সে-নামে[র] চমৎকারিতা নেই। নাই-বা রইল। জাপানে দেখেছি, তলোয়ারে[র] ফলকটার উপরে কারিগর যখন তার কারুকলার আনন্দ ঢেলে দে[য়], খাপটাকে তখন নিতান্ত নিরলংকার করে রাখে। গল্প নিজেই নিজে[র] পরিচয় দেবার সাহস রাখে যেন—নামটাকে যেন জোর গলায় আগে আগে নকিবগিরি করতে না পাঠায়।

'তিন পুরুষ' নাম ঘুচিয়ে আমার গল্পের নাম দেওয়া গেল 'যোগাযোগ'।

—বিচিত্রা। অগ্রহায়ণ ১৩[৩৪]

৪ অক্টোবর ১৯২৭
'কিন্তা' জাহাজ। শ্যামের পথ